মমি-এর গল্প

সমারসেট

মম্‌-এর গল্প



সম্পাদনা করেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনুবাদ করেছেন

ক্ষিতীশ রায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শীতাংশু মৈত্র

ফল্গু কর

প্রেমেন্দ্র মিত্র



সিগ্‌নেট প্রেস : কলিকাতা

সমারসেট মম্-এর সহযোগিতায়
প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগ্নেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড কলিকাতা
প্রচ্ছদপট ও ছবি
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
শিবরাম দাস
মুদ্রাকর
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট
প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৯।১এ শ্রীনাথ দাস লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট

*
দাম তিনটাকা



সূচিপত্র



জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে



সমারসেট মম্

সমারসেট মম্ জাতিতে ইংরেজ কিন্তু সাহিত্যিক প্রকৃতিতে ফরাসী বললে—খুব ভুল বোধহয় করা হয় না। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক গোত্রে অন্ততঃ তাঁকে একেবারেই ফেলা যায় না। আর্নল্ড বেনেট, ওয়েল্‌স ও গল্‌সওয়ার্দির সঙ্গে একই যুগের হাওয়ায় তিনি নিশ্বাস নিয়েছেন, তবু ইংরেজের শাঁসালো ভারের চেয়ে ফরাসীর উজ্জ্বল ধারই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বেশি। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ধার; ধার—ঘোরালো অথচ তীব্র শ্লেষের, ধার—কখনো সোনার খাদটুকু ধরিয়ে দিয়ে, কখনো খাদের সোনাটাকে বুঝিয়ে দিয়ে—ঈষৎ বাঁকা হাসির। তবু সে-হাসি শুধু বাঁকা নয়, পরম প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর অপ্রিয় সত্য শোনাতে বাধ্য হওয়ায় কেমন একটু কুণ্ঠিত ও করুণ।

মম্-এর লেখা পড়তে পড়তে পূর্ব-সূরীদের কাউকে যদি মনে পড়ে, তাহলে তারা হলেন মোপাসাঁ, দোদে, ফ্লবেয়র। তাঁর রচনার বুনন তেমনি সূক্ষ্ম, সরল, বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু সম্পূর্ণ নক্সা যেখানে শেষ হয় সেখানকার অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে লাগে। এই কঠিন বাকসংযম, আঙ্গিকের এই বিশুদ্ধ সারল্য ইংরাজি সাহিত্যের ঠিক ধাতস্থ নয়, তাই সমারসেট মমকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পাবার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। পল্লবগ্রাহিতার অপবাদে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে জাতে ঠেলে রাখতে দ্বিধা করেননি। গল্পকারের বিজয়-মালা নিতে তাঁকে প্রথমে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় নাট্যকার রূপে নিজেকে পরিচিত করতে হয়েছে।

'ধার'টুকুর দিক দিয়ে মোপাসাঁর সঙ্গে মিল থাকলেও মমকে সেই সুবিখ্যাত ফরাসী 'সিনিক'এর সাহিত্যিক-বংশধর ভাবলে অত্যন্ত ভুল করা হবে।

সুধার পাত্র ভ্রমে গরল মুখে তুলে যাঁদের সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে যায় ও পৃথিবীর সবকিছুকে যাঁরা তিক্ত অবিশ্বাসের চোখে দেখেন, মম্ তাঁদের দলের নন। জীবনের বিষামৃত দুই-ই স্বীকার করবার মতো মনের উদার সরলতা তাঁর আছে।

অস্ত্র চিকিৎসকের ছুরিকার মতো, তাঁর কলমের ডগায় শ্লেষের নির্মমতাই প্রথমে চোখে পড়ে, তাঁর করুণা ও বেদনা থাকে নেপথ্যে।

জীবনের কোনো অসুস্থতা, অস্বাভাবিকতা, গ্লানি, ক্লেদ, আত্মপ্রবঞ্চনাকে তিনি দুর্বল ভাবালুতায় ক্ষমা করেননি, মিথ্যাকে কখনো রঙিন করে তোলেননি অলীক স্বপ্নের জাল বুনে।

প্রথম জীবনের ডাক্তারি-পড়া তাঁর একদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সার্থক। শুধু দেহের ব্যাধির চিকিৎসায় সন্তুষ্ট থাকবার মতো প্রতিভা অবশ্য তাঁর নয়, কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়েই তিনি জীবনের বিচিত্র লীলা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমস্ত বাহ্যিক ভাব ও আবরণ ভেদ করে ব্যাধি ও বিকৃতির মূলে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছেচে। তাঁর শাণিত শ্লেষ নির্ভুল ভাবে সমস্ত ছলনার আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছে।

কি রাষ্ট্রে সমাজে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের আত্মপ্রতারণার আর অন্ত নেই। লেখায় সেই আত্মবঞ্চনার খোরাক জুগিয়ে আমাদের দুর্বলতার খোশামুদি যাঁরা করেন, সাহিত্যের বাজারে নগদ খ্যাতির মূল্য তাঁদের অত্যন্ত সহজেই মেলে। কিন্তু এই সহজসিদ্ধির পথ মম্-এর নয়। সিনিকের অপবাদ অগ্রাহ্য করে তিনি অবিচলিত ভাবে জীবনের জটিলতার যথার্থ পরিচয় দেবার চেষ্টা করে গেছেন সর্বত্র। আমাদের সমস্ত আত্মবঞ্চনা তাঁর অভ্রান্ত কলমের কাছে যেমন ধরা পড়েছে, আকাশ-

কুসুমকে সত্য করে তোলার চেষ্টায় আমাদের ব্যর্থতার করুণ মহিমাও তেমনি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

মম্-এর জীবনে অভিজ্ঞতার গভীরতা আপাত দৃষ্টিতে যাদের চোখে ধরা পড়ে না, তারাও তাঁর ব্যাপকতায় বিস্মিত না হয়ে পারে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে পৃথিবীর দূরদূরান্তরের সমস্ত দেশের জীবনযাত্রা যেন তাঁর নখদর্পণে। মেক্সিকোর গুয়াতামালা থেকে পলিনেশিয়ার যে কোনো দ্বীপে তাঁর স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি। প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিশাল পটভূমিকাতেই বেশির ভাগ কাহিনী তাঁর রচিত। মানুষের মন ও চরিত্রের দুর্জ্ঞেও জটিলতার সূত্র নিপুণ হাতে খুলতে খুলতে সামান্য দু'চারটি টানে সেই বর্ণাঢ্য পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তবু বাইরের প্রকৃতি নয়, মানুষের মনই তাঁর আসল বিষয়বস্তু। বর্ণের বৈচিত্র্যে, রহস্যের নিবিড়তায়, মানুষের মনের কাছে প্রকৃতিকে হার মানিয়ে লজ্জা দেবার জন্যই যেন তিনি তার সবচেয়ে রঙিন জমকালো রূপ বেছে নিয়েছেন।

মম্-এর গল্পগুলি আশ্চর্য, অপরূপ, অসংখ্য চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী। কতো বিচিত্র মানুষই না সেখানে ভিড় করে আছে। মম্-এর নিপুণ তুলিকার টানে তাদের প্রত্যেকের প্রচ্ছন্ন রহস্য অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ঘাটিত।

লেখার ভেতর দিয়ে লেখককে আবিষ্কার করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে বলতে পারি, মমকে এই সব চরিত্রের নিয়তির নির্মম নির্বিকার বিধাতা শুধু মনে হয় না। মনে হয়, জীবনের চোরাবালিতে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি, স্খলন-পতনের নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত ইতিহাস রচনা করেই নিজেকে খালাশ মনে করতে তিনি পারেননি, শ্লেষের হাসি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ অসহায় মানুষের লাঞ্ছিত সত্তার জন্য মনের নেপথ্যে একটি বিমূঢ়

নয়

নিরুপায় বেদনাই তাঁর আছে। 'বৃষ্টি' গল্পটির গোঁড়া সংকীর্ণ-চিত্ত পাদ্রীসাহেব অক্ষমতর লেখকের কলমে শুধু আমাদের বিদ্বেষ জাগিয়েই বিদায় নিত হয়তো, কিন্তু প্যাগো-প্যাগোর সমুদ্র-সৈকতে তাকে ঘৃণাভরে ফেলে আসতে আমরা পারি না। সমস্ত বাহ্যিক বিদ্রূপ অতিক্রম করে তার অন্ধ শৃঙ্খলিত মনের চরম লাঞ্ছনা ও হতাশায় মম্-এর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আমাদেরও স্পর্শ করে।

সমারসেট মম্ জীবনে নাটক উপন্যাস গল্প লিখেছেন প্রচুর। তাঁর অসংখ্য রচনা থেকে চয়ন করে যে-দশটি গল্প এখানে অনূদিত হয়েছে, তার সব ক'টিই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। পৃথকভাবে কোনোটির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন হলেও, একটি বিশেষ কারণে 'শান্তির ভরা' গল্পটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। বিচক্ষণ সমালোচকদের মতে ইংরাজি সাহিত্যে একদিক দিয়ে এমন কৌতুকময় উদ্ভট ও অপরদিক দিয়ে এমন নিদারুণ বিদ্রূপাত্মক কাহিনী কোনোদিন লেখা হয়নি। বিগতযৌবনা শ্রীহীনা ধর্মান্ধ একটি মহিলা, আর অধঃপাতের অতল পঙ্কে নিমগ্ন এক অপদার্থের জীবন নিয়ে নিয়তির পরিহাসের এ-কাহিনী শুধু মম্-এর তির্যক কল্পনাতেই সম্ভব।

বর্তমান ইংরাজি সাহিত্যে সমারসেট মম্ একটি নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এই গল্পগুলি, অনুবাদের অপরিহার্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলার সাহিত্যরসিকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, এটুকু আশা আমাদের আছে।





বৃষ্টি

১

প্রায় শুতে যাবার সময় হয়েছে। কাল সকালে ঘুম ভাঙতেই ডাঙা দেখা যাবে। ডাক্তার ম্যাকফেল পাইপটা ধরিয়ে জাহাজের রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে দক্ষিণ আকাশ-প্রান্তে 'সাদার্ন ক্রশ্'এর তারাগুলি খোঁজবার চেষ্টা করছিল। দু'বছর তার যুদ্ধক্ষেত্রে কেটেছে। সেখান থেকে যে ক্ষত নিয়ে সে ফিরেছিল, তা থেকে সেরে উঠতে একটু অতিরিক্ত সময়ই তার লেগেছে। তাই অন্তত বছর খানেক শান্তিতে 'এপিয়া'য় কাটাবার সম্ভাবনায় সে সত্যিই খুশি। এই সমুদ্র-যাত্রাটুকুতেই সে যেন অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে। কয়েকজন যাত্রী পরের দিনই 'প্যাগো-প্যাগো'-তে নেমে যাবে, তাই সেদিন সন্ধ্যায় জাহাজে একটু নাচের আয়োজন হয়েছিল। তার কানে পিয়ানোর কর্কশ আওয়াজটা এখনো বাজছে। অবশেষে ডেক্ শান্ত হয়ে এল। কিছু দূরে তার স্ত্রী একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে ডেভিডসনদের সঙ্গে গল্প করছে। সে সেখানে গিয়ে বসল। আলোর নিচে টুপিটা খোলবার পর দেখা গেল তার চুলগুলো বেশ লালচে, মাথার ওপর একটু টাকও পড়েছে। সাধারণত চুল যাদের লাল তাদের মতোই তার চামড়া দাগী ও লালচে। ডাক্তার ম্যাকফেলের বয়স প্রায় চল্লিশ, রোগা শরীর, মুখটা শুকনো, কথায় স্কচ্ টান, স্বরটা নিচু ও শান্ত, একটু পণ্ডিতি মাপা-মাপা কথা বলার ধরন।

জাহাজে একসঙ্গে আসতে আসতে ডেভিডসন ও ম্যাকফেল পরিবার বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘনিষ্ঠতাটা পাশাপাশি থাকার দরুন,

কোনো রুচির মিল থেকে নয়। শুধু এক বিষয়ে দুই পরিবারেই এক মত। জাহাজে ধূমপান করবার ঘরে যারা সারাদিন পোকার কি ব্রিজ খেলে আর মদ খেয়ে কাটায়, তাদের এরা কেউই দেখতে পারে না। ডেভিডসনেরা যে মিসেস ম্যাকফেল আর তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশতে চায় না, এতে মিসেস ম্যাকফেল বেশ একটু গর্বিতই বোধ করে। লাজুক প্রকৃতির হলেও ডাক্তার ম্যাকফেলও নির্বোধ নয়; সম্পূর্ণ সজ্ঞানে না হলেও সেও এতে একটু আত্মপ্রসাদই বোধ করে। শুধু স্বভাবটা তার তার্কিক বলে, রাত্রে নিজেদের কেবিনে সে একটু ফোড়ন না কেটে পারে না। মিসেস ম্যাকফেল বলছিল, "মিসেস ডেভিডসন বলছিলেন যে, আমরা না থাকলে কি করে এতখানি পথ আসতেন, ভেবেই পান না। আমাদের ছাড়া আর কারুর সঙ্গে পরিচয় করবারও তাঁর ইচ্ছে হয়নি বলছিলেন।"

"আমার তো মনে হয় পাদ্রিরা এমন কিছু কেউকেটা নয় যে এত বাদবিচার তাদের সাজে।"

"বাদবিচার নয়। তিনি যা বলেছেন আমি বুঝেছি। জাহাজের আড্ডাঘরে ওই সব অভদ্র যে-সে লোকের সঙ্গে ডেভিডসনদের মেলামেশা করতে কি ভালো লাগতে পারে?"

"ওদের ধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর তো অত বাদবিচার ছিল না।" ডাক্তার ম্যাকফেল একটু হাসি চেপে বললে।

"কতবার তোমায় বলেছি না যে ধর্মের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবে না! তোমার মতো স্বভাব যেন আমার কখনো না হয়। লোকের ভালো দিকটা তুমি দেখতে পার না।"

ডাক্তার স্ত্রীর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে চুপ করে রইল। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু সে বুঝেছে যে

ঘরের শান্তি রাখতে হলে তর্কে শেষ পর্যন্ত হার মানাই ভালো। পোশাক ছেড়ে নীরবে ওপরের বাঙ্কে উঠে সে ঘুমোবার জন্যে শুয়ে শুয়ে বই পড়া শুরু করে দিলে।

পরের দিন সকালে যখন সে ডেক-এ গেল, তখন জাহাজ তীরের কাছ ঘেঁষে চলেছে। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে সেদিকে তাকিয়ে রইল। রূপালী ছোট একফালি তীর থেকে, ঘন গাছপালায় ঢাকা খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। নারকেল গাছগুলো সমুদ্রের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, তারই ভেতর সামোয়াবাসীদের ঘাসের বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। এখানে-সেখানে ঝকঝকে ছোট ছোট শাদা গির্জাগুলি উঁকি দিচ্ছে। মিসেস ডেভিডসন এসে দাঁড়াল। তার পোশাক কালো রঙের, গলার একটি সোনার চেন থেকে একটি ছোট্ট ক্রুশ ঝোলান। ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি, বাদামী বিবর্ণ চুল, তবে চুলের সাজ খুব পরিপাটি। প্রায় অদৃশ্য পাঁশনের পেছনে চোখ দুটি সুস্পষ্ট নীল। তার মুখটা ভেড়ার মতো লম্বা বটে, তবে নির্বোধের চেয়ে তাকে অত্যন্ত সজাগ বলেই মনে হয়। পাখির মতো তার চলাফেরা সব কিছু অত্যন্ত ক্ষিপ্র। সব চেয়ে বিশেষত্ব বুঝি তার কণ্ঠস্বরে। সেই তীক্ষ্ণ কাংস্য-কণ্ঠের সুর নিতান্ত দুঃসহ। তার যান্ত্রিক একঘেয়েমিতে মন তিক্ত হয়ে ওঠে।

মৃদু একটু হেসে ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "এ প্রায় আপনাদের নিজেদের দেশ বলেই বোধহয় মনে হয়।"

"আমাদের দ্বীপগুলো এরকম নয়, সেগুলো নিচু প্রবাল-দ্বীপ। এগুলোর আসলে আগ্নেয়গিরি থেকে জন্ম। আমাদের দ্বীপগুলোয় পৌঁছুতে আরও দশদিন লাগবে।"

ডাক্তার ম্যাকফেল একটু পরিহাস করে বললে, "এ অঞ্চলে সে তো একরকম ওপাড়ার রাস্তায় থাকার সামিল।"

"হ্যাঁ, একটু বাড়িয়ে বলা হলো বটে, তবে আপনি খুব অন্যায় কিছু বলেননি। এই দক্ষিণ সমুদ্রে দূরত্বটা আমরা অন্য চোখে দেখি।"

ডাক্তার ম্যাকফেল সামান্য একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

মিসেস ডেভিডসন বলে চলল, "এখানে যে আমাদের থাকতে হয় না, তাতে আমি সত্যিই সুখী। শুনি, এখানে কাজ করা নাকি বড় শক্ত। জাহাজগুলো এখানে ধরে বলে এখানকার লোকেদের মতিগতি একটু চঞ্চল। নৌ-বিভাগের ঘাঁটি এখানে থাকাটাও বাসিন্দাদের পক্ষে অনিষ্টকর। আমরা যেখানে থাকি সেখানে এসব অসুবিধে নেই। দু' একজন ব্যবসাদার সেখানে থাকে বটে, তবে তাদের বেচাল হতে আমরা দিই না। কখনো-সখনো মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাদের এমন অস্থির করে তুলি যে বাধ্য হয়ে তারা দেশছাড়া হয়।"

নাকে চশমাটি এঁটে মিসেস ডেভিডসন নির্মম দৃষ্টিতে সবুজ দ্বীপটার দিকে চেয়ে রইল।

"মিশনারীদের পক্ষে এখানে কিছু কাজ করার আশা দুরাশা মাত্র! ভগবানের অসীম অনুগ্রহ যে সে দুর্ভাগ্য আমাদের হয়নি।"

সামোয়ার উত্তরে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে ডেভিডসনের এলাকা। দ্বীপগুলি খুব কাছাকাছি নয়। ডেভিডসনকে অনেক সময় নৌকো করে দূর দূরান্তরে যেতে হয়। সে সময় তার স্ত্রীই মিশন পরিচালনা করে.. রকম কড়া হাতে নির্ভুলভাবে সে যে তখন মিশন চালায়, তা ভাবতেই ডাক্তার ম্যাকফেলের একটু হৃৎকম্প হয়। সেখানকার লোকেদের স্বভাব-চরিত্রের নিন্দায় মিসেস ডেভিডসন পঞ্চমুখ, তাদের কথা বলতে গেলে, ঘৃণায় আতঙ্কে সে যেন শিউরে ওঠে। তার শালীনতা বোধ একটু অদ্ভুত। প্রথম আলাপের সময়েই একদিন সে বলেছিল, "জানেন, আমরা যখন প্রথম ওখানে গিয়ে উঠি, তখন ওদের বিয়ের রীতিনীতি এমন ভয়ানক বিশ্রী ছিল যে আমি তা আপনাকে বর্ণনা করে

লতেই পারব না। তবে মিসেস ম্যাকফেলকে আমি সব বলব, আপনি তাঁর কাছেই শুনবেন।"

তারপর পাশাপাশি দুটি ডেক-চেয়ার পেতে মিসেস ডেভিডসন ও মিসেস ম্যাকফেলকে ঘণ্টা দুই তন্ময় হয়ে আলাপ করতে দেখা গেছে। ম্যায়ামের জন্যে তাদের পাশ দিয়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে করতে ডাক্তার দূরের কোনো পাহাড়ি ঝরনার মতো মিসেস ডেভিডসনের অবিশ্রাম উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর শুনেছে। তার স্ত্রীর ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে আছে, মুখটা একটু পাণ্ডুর। তা থেকেও স্ত্রীর অভিজ্ঞতাটা কি রকম ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর হচ্ছে, তা সে কতকটা অনুমান করেছে। রাত্রে যা কিছু শুনেছিল, রুদ্ধশ্বাসে তা স্বামীর কাছে মিসেস ম্যাকফেল বর্ণনা করতে ভোলেনি।

পরের দিন সকালে দেখা হতেই মিসেস ডেভিডসন সোৎসাহে বলেছে, কেমন, কি বলেছিলাম আপনাকে? এমন বিশ্রী কাণ্ড-কারখানার কথা কখনো শুনেছেন? বুঝতেই তো পারছেন আপনি ডাক্তার হলেও কেন আপনার কাছে সব নিজে বলতে পারিনি?" ডাক্তারের মুখে যথোচিত ভাবান্তর হয়েছে কিনা জানবার জন্যে মিসেস ডেভিডসন উৎসুকভাবে তার মুখ লক্ষ্য করে দেখে।

'শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না যে, ওখানে প্রথম যখন যাই তখন আমরা একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি হয়তো বললে বিশ্বাসই করবেন না যে কোনো একটা গ্রামে একটা ভালো মেয়ে খুঁজে বার করা তখন অসম্ভব ছিল।"

মিসেস ডেভিডসনের 'ভালো'র সংজ্ঞা অত্যন্ত কঠিন।

"মিস্টার ডেভিডসন ও আমি দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে প্রথমেই এদের নাচ বন্ধ করে দিতে হবে। ওখানকার লোকেরা তো নাচের নামে পাগল।"

"বয়স যখন কম ছিল, তখন আমারও নাচে অরুচি ছিল না," ডাক্তার ম্যাকফেল মন্তব্য করে।

"কাল রাত্রে আপনি যখন মিসেস ম্যাকফেলকে একপাক নাচবার জন্য অনুরোধ করছিলেন, তখনই আমি তা বুঝেছিলাম। দেখুন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেউ নাচে, তাতে অবশ্য এমন কিছু ক্ষতি হয় না। তবে আপনার স্ত্রী নাচতে রাজী না হওয়ায় সত্যি আমি স্বস্তি বোধ করে ছিলাম। এ রকম অবস্থায় আমাদের একটু সামলে থাকাই ভালো।"

"কি-রকম অবস্থায়?"

পাঁশনের ভেতর দিয়ে মিসেস ডেভিডসন ডাক্তারের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল মাত্র। এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে আবার বলে চলল, "অবশ্য আমাদের ভেতর ব্যাপারটা ঠিক ওদের মতো নয়। যদিও মিস্টার ডেভিডসনের সঙ্গে আমি একমত। তিনি বলেন স্ত্রীকে আরেক জনের হাত ধরে নাচতে দেখেও কোনো স্বামী কি করে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা তিনি ভেবে পান না। আমার কথা যদি বলেন, বিয়ের পর থেকে আমি কোনোদিন নাচিনি। তবে এখানকার লোকের নাচ একেবারে আলাদা জিনিস। সে নাচ এমনিতেই বেহায়া, তার ওপর সত্যিই তা দুর্নীতি ছড়ায়। যাই হোক ভগবানের কৃপায় আমরা সে নাচ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের অঞ্চলে গত আট বছর কেউ কোথাও যে নাচেনি এটুকু আমি জোর করে বলতে পারি।"

জাহাজ বন্দরের মুখে এসে পড়েছে। মিসেস ম্যাকফেল তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে। একটা বাঁক নিয়ে জাহাজটা ধীরে ধীরে বন্দরে ঢুকছে। বন্দরটি বেশ বড়। একটা গোটা যানোয়ারী জাহাজের বাহিনী সেখানে ধরান যায়। বন্দরের চারধারে খাড়া উঁচু সবুজ পাহাড়গুলো উঠেছে। ঠিক প্রবেশ-পথটির কাছে দ্বীপের গভর্নরের বাগানওয়ালা বাড়ি।

সমুদ্রের হাওয়ার সেখানে মানা নেই। একটা নিশান-মাস্তুল থেকে আমেরিকার পতাকা ঝুলছে। দু'তিনটি পরিপাটি বাংলো, একটা টেনিস কোর্ট পার হয়ে তারা জেটিতে গিয়ে পৌঁছলো। একটি পালতোলা ছোট জাহাজ শ'দুয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মিসেস ডেভিডসন সেইটি দেখিয়ে জানালে, তাতে করেই তাদের 'এপিয়া' যেতে হবে। জেটিতে যেমন ভীড় তেমনি গোলমাল। দ্বীপের নানা জায়গা থেকে উৎসুক জনতা জেটিতে এসে জড় হয়েছে। কেউ এসেছে নিছক কৌতূহলে, কেউ বা জিনিসপত্র বেচতে। বড় বড় কলার কাঁদি, আনারস থেকে, 'টাপা' কাপড়, ঝিনুক বা হাঙরের দাঁতের গলার হার, 'কাভা' পাত্র, লড়াইয়ে-ডিঙির নমুনা পর্যন্ত অনেক কিছুই তারা এনেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্কিন নাবিকেরা তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মালপত্র যখন নামানো হচ্ছে তখন ম্যাকফেল ও ডেভিডসন পরিবার এই জনতাকে লক্ষ্য করে দেখছিল। বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েদেরই গায়ে একরকম চর্মরোগ। অনেকের হাতে পায়ে গোদ। এ-রোগের সঙ্গে ডাক্তারের এই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। পুরুষ মেয়ে সকলেরই পরনে 'লাভা-লাভা'।

"পোশাকটা ভারি অসভ্য," মিসেস ডেভিডসন বললে, "মিস্টার ডেভিডসন তো বলেন আইনের জোরে এ-পোশাক বন্ধ করা উচিত। শুধু একটা লাল সুতির কাপড়ের টুকরো যারা কোমরে জড়ায়, তাদের কখনো নীতির বালাই থাকে?"

ডাক্তার কপাল থেকে ঘাম মুছে বললে, "এখানকার আবহাওয়ার পক্ষে পোশাকটা বোধহয় সুবিধের।"

দ্বীপের ভেতরে আসার পর এই সকালবেলাতেই গরম সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে। পাহাড়-ঘেরা 'প্যাগো-প্যাগো'তে এক ঝলক হাওয়া নেই। মিসেস ডেভিডসন তীক্ষ্নস্বরে তখন বলে চলেছে, "আমাদের দ্বীপ-

গুলোতে লাভা-লাভা আমরা প্রায় উঠিয়ে দিয়েছি। দু'একজন বুড়ো ছাড়া কেউ আর তা পরে না। মেয়েরা সবাই পা পর্যন্ত ঢাকা গাউন পরে, পুরুষরা প্যান্ট আর জামা। সেখানে প্রথম যাবার পরই মিস্টার ডেভিডসন, তাঁর একটি বিবরণীতে লিখেছিলেন, দশ বছরের বড় ছেলেরা যদি প্যান্ট না পরে তাহলে এদেশের লোকেদের কোনোদিন ভালো করে খৃষ্টান করা যাবেনা।"

মিসেস ডেভিডসন ইতিমধ্যেই বার কয়েক আকাশের দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেছে। বন্দরের মুখে একটা কালো মেঘ এসে জমেছে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছে।

"আমাদের কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত," সে বললে। তারা করোগেটে ঢাকা একটা বড় ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। মিস্টার ডেভিডসন কিছুক্ষণ বাদে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। জাহাজে ম্যাকফেলদের সঙ্গে সে ভদ্র-ব্যবহারই করেছে বটে, তবে তার স্ত্রীর মতো সে মিশুক নয়। বেশির ভাগ সময় তার পড়াশোনাতেই কেটেছে। সে একটু চুপচাপ, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশার যেটুকু চেষ্টা করে, সেটুকু যে খৃষ্টধর্মের দায়ে তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না। স্বভাবতই সে একটু মনমরা ধরনের, কথাবার্তা বলতে বিশেষ ভালোবাসে না। তার চেহারাটি বড় অদ্ভুত। লম্বা রোগা, হাতপাগুলো কেমন একটু আলগা, ভাঙ্গা গাল আর তার ওপর গালের উঁচু হাড়গুলোর জন্যে, বেশ কুৎসিতই দেখায়। শুধু তার পুরু ঠোঁটগুলোর ভেতর এমন একটা স্থূল কামনার ইঙ্গিত আছে, যা দেখলে অবাক হতে হয়। চুল তার লম্বা, চোখগুলো অত্যন্ত বসা ও কেমন একটু করুণ। লম্বা লম্বা আঙুল ও হাতের গড়নটি ভালো। তাকে দেখলে মনে হয় শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে। কিন্তু সবচেয়ে যাতে আশ্চর্য হতে হয় তা হচ্ছে তার ভেতরে

একটা চাপা আগুনের আভাস। তার মতো লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভবই নয়।

মিস্টার ডেভিডসন খারাপ খবর এনেছে। 'কানাকা' অর্থাৎ এদেশের লোকের মধ্যে হাম একটা সাংঘাতিক রোগ। যে-জাহাজে তাদের এপিয়া' যাওয়ার কথা. তারই মাঝি-মাল্লাদের একজনের হঠাৎ এ-রোগ হয়েছে। 'প্যাগো-প্যাগো'তে এখন এ-রোগ সংক্রামক রূপে দেখা দিয়েছে। রুগ্ন লোকটিকে তীরে নামিয়ে হাসপাতালে রাখলেও 'এপিয়া' থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে যে, এ-রোগ মাঝি-মাল্লাদের আর কারুর ভেতর সংক্রামিত যে হয়নি, তা নির্ভুল ভাবে না জানা পর্যন্ত জাহাজটাকে 'এপিয়া'র বন্দরে যেন ঢোকান না হয়।

"মনে হচ্ছে অন্তত আরও দিন-দশেক আমাদের এখানে থাকতে হবে।"

"কিন্তু 'এপিয়া'য় আমাকে ওদের যে অত্যন্ত দরকার—" ডাক্তার ম্যাকফেল বললে।

"উপায় তো নেই। যদি আর কারুর এ-রোগ দেখা না দেয় তাহলে জাহাজ ছাড়বার অনুমতি মিলবে। কিন্তু তিন মাস এদেশী লোকেদের যাতায়াত একেবারে বন্ধ।"

মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "এখানে কোনো হোটেল আছে?"

ডেভিডসন একটু হেসে বললে, "না, নেই।"

"তাহলে আমরা কি করব?"

"আমি গভর্নরের সঙ্গে কথা বলেছি। একজন ব্যাপারী এখানে ঘর ভাড়া দেয়। আমি বলি কি, বৃষ্টি থামলেই চলুন, কি ব্যবস্থা করা যায় দেখে আসি। আরাম, আয়েস আশা করবেন না। মাথার ওপর একটা ছাদ আর শোবার একটা বিছানা পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করব।"

কিন্তু বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই। অবশেষে ছাতা ও বর্ষাতি নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। শহর বলতে কিছু নেই, শুধু কয়েকটা সরকারী

আপিস-বাড়ি, দু'একটা দোকান আর তার পেছনে নারকেল ও কলাগাছের বাগানের মধ্যে কানাকাদের কয়েকটা বাড়ি। যে-বাড়িটা তারা খুঁজছিল, জেটি থেকে সেটা পাঁচ-মিনিটের রাস্তা মাত্র।

চওড়া বারান্দা-সমেত দোতলা একটি করোগেট-টিনে ছাওয়া বাড়ি। বাড়ির মালিক 'হর্ন' নামে এক দো-আঁশলা ফিরিঙ্গি। তার বউ জাতে কানাকা। একপাল ছেলেমেয়ে। নিচেরতলায় তার একটি কাপড়চোপড় আর টিনে ভর্তি বিদেশী জিনিসের দোকান। হর্ন যে ঘরগুলি দেখাল, তাতে আসবাবপত্র নেই বললেই হয়। ম্যাকফেলদের ঘরটিতে একটা পুরানো খাট, একটা ছেঁড়া মশারি, একটা নড়বড়ে চেয়ার ও একটা হাত-মুখ ধোবার গামলা ছাড়া আর কিছুই নেই। সব দেখে শুনে তো তাদের চক্ষুস্থির! বাইরে বৃষ্টি পড়ার আর বিরাম নেই।

মিসেস ম্যাকফেল বললে, "যা নেহাত না হলে নয়, তা ছাড়া মোটঘাট কিছু আমি আর খুলছি না।"

মিসেস ম্যাকফেল একটা ট্রাঙ্ক খুলছে, এমন সময় মিসেস ডেভিডসন ঘরে এসে ঢুকল। তার স্ফূর্তি উৎসাহের কামাই নেই। এসব অসুবিধে যেন তার গায়েই লাগে না।

"আমার কথা যদি শোনেন, তাহলে ছুঁচ-সুতো নিয়ে এখনি মশারিটা মেরামত করবার ব্যবস্থা করুন, নইলে রাত্রে আর ঘুমোতে হবে না।"

ডাক্তার ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "খুব বেশি উপদ্রব বুঝি?"

"এই তো মশার মরশুম। এপিয়ায় গভর্নরের বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে, মেয়েদের—কি বলে, নিম্নাঙ্গ ঢাকা দেবার জন্যে একটা করে বালিশের ওয়াড় দেওয়া হয়।"

"বৃষ্টিটা একটু থামলে বাঁচি," মিসেস ম্যাকফেল বললে, "রোদ উঠলে তবু গোছগাছ করবার একটু উৎসাহ পাওয়া যায়।"

"তাহলে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে প্যাগো-

প্যাগোর মতো এত বৃষ্টি খুব কম জায়গাতেই হয়। ঐযে পাহাড়-ঘেরা বন্দর, ওতেই জল টেনে আনে। তাছাড়া বছরের এই সময়টাতে বৃষ্টি হবেই।"

ডাক্তার ও তার স্ত্রী দুজনে ঘরের দুদিকে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে চেয়ে মিসেস ডেভিডসনের মনে হয়, এদের ব্যিলি-ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। এ-রকম আনাড়ি লোক সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তবে তাদের চালিয়ে নেবার জন্যেও তার হাত নিশপিশ করে। কোনো কিছুর ভার নেওয়াটা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

"দেখি আমায় একটা ছুঁচ-সুতো দিন তো আমি মশারিটা মেরামত করে ফেলছি, ততক্ষণ আপনি মোটঘাট খুলুন। একটায় দুপুরের খাওয়া। ডাক্তার ম্যাকফেল, আপনি বরং জেটিতে গিয়ে আপনাদের ভারি মালপত্রগুলো শুকনো জায়গায় রেখেছে কিনা খোঁজ করুন। এদেশী লোকেদের একটুও বিশ্বাস নেই। তারা ডাহা বৃষ্টির মধ্যে অনায়াসে সব কিছু রেখে দিতে পারে।"

ডাক্তার বর্ষাতিটা আবার গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। বাইরের দরজার কাছে হর্ন, যে জাহাজে তারা এসেছে, তার কোয়ার্টার-মাস্টার ও সেকেণ্ড ক্লাশের একজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। যাত্রীটিকে ডাক্তার জাহাজে অনেকবার দেখেছে। কোয়ার্টার-মাস্টার একরত্তি মানুষ, শুকনো চিমসে চেহারা, অত্যন্ত নোংরা। ডাক্তারকে অভিবাদন করে সে বললে, "হামটা হঠাৎ এমন দেখা দিয়ে বড় মুশকিলই বাধিয়েছে। কি বলেন ডাক্তার? আপনি তো ইতিমধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন দেখছি।"

ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাটা ডাক্তারের কাছে একটু বেশিই মনে হল। তবে সে ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক, সহজে কারুর দোষ ধরে না।

"হ্যাঁ, ওপরে একটা ঘর আমরা পেয়েছি।"

"মিস টমসন আপনাদের সঙ্গেই এপিয়া যাবেন। সেই জন্যে ওঁকে এখানে

এনেছি।" কোয়ার্টার-মাস্টার তার পাশের মেয়েটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। মেয়েটির বয়স বোধহয় সাতাশ, একটু গোলগাল মোটা ধরনের, একরকম সুশ্রীই বলা যায়। পরনে একটা শাদা পোশাক, মাথায় একটা বড় শাদা টুপি। গ্রেসকিডের লম্বা শাদা বুট জোড়ার ওপরে শাদা মোজায় ঢাকা তার মোটা পাগুলো দেখা যাচ্ছে। ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে মধুরভাবে হেসে ঈষৎ ধরা গলায় বললে, "খাঁচার মতো একটা ছোট্ট ঘর, তারই জন্যে আমার কাছে দিন পিছু দেড় ডলার বাগিয়ে নিতে চায়, দেখছেন?"

কোয়ার্টার-মাস্টার বলে উঠল, "আমি বলছি জো, ও আমার চেনা। এক ডলারের বেশি ও দিতে পারবে না। তোমায় তাই নিতে হবে।"

হর্ন একটু মৃদু হেসে বললে, "তা যদি বল মিস্টার সোয়ান, তাহলে কি করতে পারি দেখি। আমার স্ত্রীকে তো জানাই, তারপর যদি সম্ভব হয় ভাড়া কমিয়েই দেব।"

"ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না," মিস টমসন বললে, "যা ঠিক করবার এখুনি ঠিক কর। দিন পিছু এক ডলার করে পাবে, তার ওপর আর কানাকড়িও নয়।"

ডাক্তার ম্যাকফেল মেয়েটির দরকষাকষির ধরনে একটু হাসল। সে নিজে দরদস্তুর করার হাঙ্গাম বাঁচাতে ঠকতেও প্রস্তুত। যে যা চায় তাতেই রাজী হওয়া তার স্বভাব।

হর্ন একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা, মিস্টার সোয়ানের খাতিরে ওই এক ডলারই নেব।"

"তাই তো বলি, পথে এস। মিস্টার সোয়ান, ওই ব্যাগটা ঘরে নিয়ে চলুন তো। ওর ভেতর আসল ভালো 'রাই' আছে। আসুন ডাক্তার, আপনিও আসুন। একপাত্র করে সকলের হয়ে যাক।"

ডাক্তার আপত্তি জানিয়ে বললে, "ধন্যবাদ, আমার এখন খাওয়া চলবে

না। জেটিতে আমার মালপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি।"

বৃষ্টির মধ্যেই ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। বন্দরের মুখ থেকে দমকে দমকে বৃষ্টির ধারা ছুটে আসছে, ওপারের তীর একেবারে ঝাপসা। রাস্তায় দু'তিনজন কানাকার সঙ্গে তার দেখা হল। লাভা-লাভা ছাড়া তাদের পরনে আর কিছু নেই, মাথায় প্রকাণ্ড ছাতা। তাদের ধীরে-সুস্থে হাঁটার ধরনটি সুন্দর। হেসে অজানা ভাষায় কেউ কেউ তাকে সম্ভাষণও করলে। সে যখন ফিরে এল তখন হর্নের বসবার ঘরে তাদের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়েছে। ঘরটায় কেমন একটা ভাপসা গন্ধ, একটু হতশ্রী চেহারা। ঘরের চারধারে গদি-দেওয়া কয়েকটা চেয়ার সাজান। ছাদের মাঝখান থেকে হলদে তেলা কাগজে মোড়া একটা গিল্টি করা ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। শুধু ডেভিডসন ছাড়া আর সবাই সেখানে উপস্থিত।

মিসেস ডেভিডসন বললেন, "উনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেইখানেই বোধহয় তাঁকে ধরে রেখেছে।"

ছোট একটি কানাকা মেয়ে তাদের এক ডিস 'হ্যামবার্গার স্টেক্' এনে দিলে। তার খানিক বাদে হর্ন নিজে তাদের খাওয়ার তদারক করতে এল। ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "আমাদের একজন ভাড়াটে প্রতিবেশীও হয়েছে, না মিস্টার হর্ন?"

হর্ন জবাব দিলে, "হ্যাঁ, একটা ঘর নিয়েছে মাত্র। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তার নিজের।" মহিলাদের দিকে চেয়ে একটু সঙ্কুচিত বিনীতভাবে সে আবার বললে, "আপনাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, তাই তাকে নিচের তলায় রেখেছি।"

মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "আমাদের জাহাজে ছিল এমন কেউ নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনে ছিল। এপিয়ায় একটা ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছে। সেখানেই যাচ্ছিল।"

"ও।"

হর্ন চলে যাবার পর ম্যাকফেল বললে, "নিজের ঘরে বসে একা একা খেতে মেয়েটির খুব ভালো লাগবে মনে হয় না।"

মিসেস ডেভিডসন বললে, "সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী যদি হয়, তাহলে তার ঘরে বসে খাওয়াই ভালো। মেয়েটি কে তা আমি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি না।"

"কোয়ার্টার-মাস্টার যখন তাকে নিয়ে আসে তখন আমি সেখানে ছিলাম। ওর নাম টমসন।"

"কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে যে মেয়েটি কাল রাত্রে নাচছিল সেই নাকি?" মিসেস ডেভিডসন জিগগেস করলে।

মিসেস ম্যাকফেল বললে, "সে-ই হবে। তখনই আমি ভাবছিলাম মেয়েটা কে। আমার কাছে তো একটু বেহায়াই ঠেকল।"

মিসেস ডেভিডসন বললে, "হ্যাঁ, ভব্য মোটেই নয়।"

এরপর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হল। খুব সকালে আজ সকলকে উঠতে হয়েছে, তাই খাওয়া শেষ হবার পর ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমোতে গেল। ঘুম থেকে যখন উঠল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু ধূসর আকাশ থেকে মেঘগুলো যেন ঝুলে আছে মনে হয়। বন্দরের তীর ধরে মার্কিনরা যে রাস্তাটা তৈরি করেছে, সেটা দিয়ে তারা খানিকটা বেড়িয়ে এল। ডেভিডসন খানিক আগেই ফিরে এসেছে। একটু বিরক্তির সঙ্গে সে বললে, "আমাদের হয়তো দিন পনেরো এখানে আটকে থাকতে হবে। গভর্নরকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি একেবারে অটল।"

মিসেস ডেভিডসন স্বামীর দিকে একবার উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ে বললে, "কাজে ফিরে যাবার জন্যে উনি ছটফট করছেন।"

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ডেভিডসন বললে, "এক বছর

আমরা বাইরে আছি। মিশনটা দেশী লোকের হাতেই আছে। আমার ভয় হয় তারা সব কিছুতেই ঢিলে দিয়েছে। লোক তারা ভালোই, সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের জাতের অনেক খৃষ্টানের তুলনায় ঈশ্বরে ভক্তিশ্রদ্ধা তাদের অনেক বেশি। তাদের বিরুদ্ধে কিছুই আমার বলবার নেই। তবে উৎসাহ তাদের বড় কম। একবার বড় জোর দু'বার তারা যুঝবার জন্যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সারাক্ষণ যুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। যত বিশ্বাসী-ই হোক দেশী মিশনারীর হাতে মিশন ছেড়ে দিলে, কিছুদিনের মধ্যে সেখানে গলদ ঢুকবেই।"

মিস্টার ডেভিডসন খানিক চুপ করল। ফ্যাকাশে মুখে তার জলন্ত দুই চোখ, তার লম্বা রোগা চেহারা, সব কিছু মিলে তার মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। তার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, তার উৎসাহ-দীপ্ত ভাব-ভঙ্গীতে, তার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ একেবারে ঠিক করাই আছে। কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ না করে যা করবার আমি করব। গাছে যদি ঘুণ ধরে থাকে তাহলে তা কেটে ফেলে আগুনেই দিতে হবে।"

বিকেলে ডেভিডসন আবার তার দ্বীপের কাজের কথা তুললে। প্রচুর চা জলখাবার খেয়ে তারা তখন বসবার ঘরে জড়ো হয়েছে। এইটেই তাদের দিনের শেষ খাওয়া। মেয়েরা কাজ করছে, ডাক্তার তার পাইপ ধরিয়েছে। ডেভিডসন বললে, "আমরা যখন সেখানে যাই তখন সেখানকার লোকদের পাপ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। যত রকম অন্যায় সব করেও তারা বুঝতেই পারত না যে, দোষ কিছু করেছে। পাপ কাকে বলে, তাদের বোঝানটাই ছিল আমার কাজের মধ্যে সব চেয়ে শক্ত।"

ডাক্তার ও তার স্ত্রী ইতিমধ্যে জেনেছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে ডেভিডসন পাঁচ বছর 'সলোমনস্' দ্বীপ-পুঞ্জে কাজ করেছে।

মিসেস ডেভিডসনও চীনদেশে মিশনারী ছিল। একটা মিশনারী সম্মিলনে যোগ দেবার জন্যে 'বষ্টনে' গিয়ে দু'জনের পরিচয় হয়। বিয়ের পর দু'জনে এই দ্বীপে কাজ পায়, তারপর থেকে সেখানেই আছে।

ডেভিডসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এটুকু অন্তত স্পষ্ট বোঝা গেছে যে. ডেভিডসনের মনের জোর অসামান্য। মিশনারীও বটে এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারী করাও তার কাজ। তাই দ্বীপগুলির যে কোনো একটিতে যে কোনো সময়েই তার ডাক পড়তে পারে। বর্ষায় দুরন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি-ধরা নৌকোও নিরাপদ নয়। অথচ কখনো কখনো সাধারণ ডিঙিতেই তাকে দূর দুরান্তরে যেতে হয়। বিপদ তখন সত্যিই খুব বেশি। অসুখ বা দুর্ঘটনার কথা শুনলে সে কখনো দ্বিধা করে না। কতবার সমস্ত রাত প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ফুটো নৌকোর জল ছেঁচেই তার কেটেছে। কতবার মিসেস ডেভিডসন তার আশাই ছেড়ে দিয়েছে।

মিসেস ডেভিডসন বললে, "আমি নিজেই কখনো কখনো ওঁকে যেতে বারণ করি। অন্তত দুর্যোগ কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলি। কিন্তু উনি কখনো শোনেন না। ভারি জেদি লোক, একবার গোঁ ধরে বসলে কার সাধ্যি টলায়।"

ডেভিডসন বললে, "ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবার সাহস আমার যদি নিজেরই না থাকে, তাহলে অন্যকে সে উপদেশ কেমন করে দেব। না, কোনো ভয় আমার নেই। এখানকার লোকেরাও জানে যে বিপদে পড়ে আমায় ডাকলে আমি যাবই— মানুষের সাধ্য যদি হয়। আর ভগবানের কাজে আমি যখন যাই, তখন তিনি কি আমায় দেখবেন না? তাঁরই হুকুমে বাতাস বয়, তাঁরই কথায় সমুদ্র উদ্দাম হয়ে ওঠে।"

ডাক্তার ম্যাকফেল একটু ভীরুগোছের লোক। যুদ্ধে কাজ করবার সময় পরিখার উপর দিয়ে যখন সশব্দে গোলা ছুটে যেত, তখন সে অত্যন্ত স্ত বোধ না করে পারেনি। যুদ্ধস্থলের কাছাকাছি কোনো হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করবার সময় হাত যাতে না কাঁপে তারই প্রাণপণ চেষ্টায় তার কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে চশমা ঝাপসা করে দিত। ডেভিডসনের দিকে চেয়ে, তাই সে একটু শিউরেই উঠল।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "কখনো ভয় পাইনি একথা যদি বলতে পারতাম!"

ডেভিডসন বললে, "বলুন, ভগবানে বিশ্বাস করি যদি বলতে পারতাম।"

সেদিন সন্ধ্যাতেও ঘুরে ফিরে ডেভিডসন আবার তাঁর দ্বীপের কথাই তুললে। প্রথম প্রথম স্বামী-স্ত্রীর তাদের কি ভাবে সেখানে কেটেছে তারই কথা বলতে শুরু করলে—"এক একদিন দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আমরা কান্না আর চাপতে পারিনি। নীরবে দুজনের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। অক্লান্তভাবে দিন রাত্রি আমরা খেটে গেছি, তবু মনে হয়েছে কোনো ফলই যেন হচ্ছে না। আমার স্ত্রী না থাকলে কি যে আমি করতাম বলতে পারি না। যখন হতাশ হয়ে আমি ভেঙ্গে পড়েছি সে-ই আমাকে উৎসাহ দিয়ে খাড়া করে রেখেছে।" মাথা নিচু করে কাজ করতে করতে মিসেস ডেভিডসনের হাত দুটো যেন একটু কেঁপে উঠল মনে হল, তার শীর্ণ গাল দুটিতে একটু যেন লজ্জার লালিমা। কথা বলবার ক্ষমতা তার এখন নেই।

"আমরা একেবারে একলা। আমাদের সাহায্য করবার কেউ নেই। স্বজাতি থেকে হাজার মাইল দূরে আমরা অন্ধকারে নির্বাসিত। আমি নিরাশ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, নিজের কাজ ছেড়ে ও বাইবেল থেকে কিছু না কিছু আমায় শোনাত, আর শিশুর চোখে যেমন

ঘুম নেমে আসে, তেমনি আমার মন শান্ত হয়ে আসত ধীরে ধীরে। শেষকালে বই মুড়ে রেখে ও বলত, 'ওরা যেমনই হোক, ওদের আমরা উদ্ধার করবই।' আমার ভেতর এই কথায় ঐশ্বরিক শক্তি যেন ফিরে আসত। আমি জবাব দিতাম, 'হ্যাঁ, ভগবান যদি সহায় হন উদ্ধার ওদের আমি করবই, হ্যাঁ, করবই।' "

ডেভিডসন টেবিলের কাছে এসে এমন ভাবে দাঁড়াল যেন সেটা বক্তৃতা দেবার জায়গা।

"বুঝতে পারছেন, তারা এমন স্বভাব-পাপী যে, নিজেদের দোষ তাদের বোঝান প্রায় অসম্ভব; তাদের কাছে যা স্বাভাবিক আচরণ সেইগুলির ভেতর থেকেই কোনগুলি পাপ তা তাদের বোঝাতে হয়েছে। শুধু ব্যাভিচার, মিথ্যে কথা বলা ও চুরি করা নয়, গির্জায় না আসা, নাচে যোগ দেওয়া ও খালি পা রাখাও যে পাপ তা তাদের জানাতে হয়েছে! মেয়েদের পক্ষে বুক খুলে রাখা আর পুরুষদের পাজামা না পরা আমি পাপ বলে বিধান দিয়েছি।"

"কি করে?" ডাক্তার ম্যাকফেল সবিস্ময়ে জিগগেস করলে।

"আমি জরিমানার ব্যবস্থা করি। কোন কাজ যে পাপ তা ঠিক মতো বোঝাবার একমাত্র উপায় হল, সে কাজ করার জন্যে শাস্তি দেওয়া তারা গির্জায় না এলে আমি তাদের জরিমানা করেছি। বেহায়ার মতো পোশাক পরলে বা নাচলেও এই শাস্তি দিতে ছাড়িনি। কাজ করে হোক, টাকা দিয়ে হোক সব রকম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাদের বাধ্য করেছি এবং অবশেষে তারা টিট্ হয়েছে।"

"কিন্তু এ-রকম ভাবে দাম দিতে তারা কোনো আপত্তি করেনি?"

"কি করে করবে?"

ডেভিডসনের স্ত্রী বললে, "ওঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে বুকের পাটা চাই।"

ডাক্তার ম্যাকফেল চিন্তিতভাবে ডেভিডসনের দিকে তাকাল। এ-সব কথা শুনে সত্যিই সে স্তম্ভিত, তবু মনের কথাটা প্রকাশ করতে তার দ্বিধা হল। ডেভিডসন বললে, "দরকার হলে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে আমি তাদের গির্জার সদস্য-তালিকা থেকে নাম খারিজ করে দিতে পারি, এটাও মনে রাখবেন।"

"তারা সেটা খুব গায়ে মাখে নাকি?"

ডেভিডসন মৃদু হেসে হাত দুটো একটু ঘসলে। "ঝুনো নারকেল-শাঁস আর তাহলে তাদের বিক্রি করতে হবে না। মাছ ধরতে গেলে, মাছের ভাগ পাবে না। এক রকম বলতে গেলে উপবাসই তাদের করতে হবে। হ্যাঁ; গায়ে তারা একটু মাখে বইকি!"

মিসেস ডেভিডসন উৎসাহ দিয়ে বললে, "ওঁকে ফ্রেড ওলিসানের কথা বলনা।"

ডাক্তার ম্যাকফেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ডেভিডসন বলতে শুরু করলে, "ফ্রেড ওলিসান এক সওদাগর। ডেনমার্ক থেকে এসে এই সমস্ত দ্বীপে সে অনেক বছর কাটিয়েছে। ব্যবসায়ী হিসেবে তার অবস্থা খুব ভালোই ছিল। আমরা আসাতে তাই সে বিশেষ খুশি হয়নি। এতদিন নিজের খেয়াল মতোই সে চলেছে। দ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে ঝুনো নারকেল-শাঁস কিনে টাকার বদলে সে তাদের মদ আর জিনিস-পত্র দিত; তাও দিত, যা তার খুশি। এদেশেরই একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল, কিন্তু চরিত্র তার তাতে একদম শোধরায়নি। মদ তো হরদমই খেত। আমি তাকে ভালো হবার জন্যে অনেক সুযোগ দিই, কিন্তু তা গ্রাহ্য না করে সে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করত।"

শেষ কথাটা বলবার সময় ডেভিডসনের গলা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে এল। দু'একমিনিট চুপ করে থেকে সে আবার বজ্র গম্ভীর স্বরে বললে, "দু'বছরে সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। পঁচিশ বছর ধরে যা সে

জমিয়েছিল কিছুই তখন তার আর নেই। আমি তাকে ভেঙে একেবারে গুঁড়ো করে দিই। শেষকালে ভিখিরীর মতো এসে তাকে আমার কাছেই সিডনি ফিরে যাবার জাহাজ-ভাড়া চাইতে হয়।"

ডেভিডসনের স্ত্রী বললে, "ওঁর সঙ্গে যখন সে দেখা করতে আসে, তখন যদি তাকে দেখতেন! এককালে সে বেশ মোটাসোটা জোয়ান ছিল, গলার আওয়াজটাও ছিল বাজখাই। কিন্তু তখন সে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে—একেবারে বুড়ো।"

আত্ম-নিমগ্ন দৃষ্টিতে ডেভিডসন বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। বৃষ্টি আবার পড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ নিচে থেকে একটা শব্দ শুনে ডেভিডসন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। নিচে গ্রামোফোনে উচ্চ কর্কশ স্বরে একটা বাজনার রেকর্ড বাজছে।

ডেভিডসন জিগগেস করলে, "ওটা কি?"

মিসেস ডেভিডসন নাকে পাঁশ্‌নে এঁটে বললে, "সেকেণ্ড ক্লাসের একজন যাত্রী হোটেলে একটা ঘর নিয়েছে। সে-ই বাজাচ্ছে বোধহয়।"

খানিক বাদে বাজনার শব্দের সঙ্গে নিচে থেকে নাচের আওয়াজও পাওয়া গেল। রেকর্ড থেমে যাবার পর বোতলের ছিপি খোলার শব্দ ও তারই সঙ্গে স্ফূর্তি ভরে আলাপ-আলোচনার গোলমালও শোনা গেল।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "আমার মনে হয় মেয়েটি তার জাহাজের বন্ধুদের বিদায় দেবার জন্যে কোনোরকম আয়োজন করেছে। জাহাজ তো বারোটায় ছাড়বে, না?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে, ডেভিডসন নিজের ঘড়ির দিয়ে চেয়ে স্ত্রীকে জিগগেস করলে, "কি, তোমার কাজ শেষ হয়েছে?"

মিসেস ডেভিডসন হাতের কাজ বন্ধ করে সব গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, হয়েছে।"

ডাক্তার ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "শুতে যাবার এখুনি সময় হয়েছে কি ? বড্ড সকাল-সকাল হচ্ছে না ?"

মিসেস ডেভিডসন বললে, "আমাদের অনেক পড়াশুনা করতে হয়। যেখানেই থাকিনা কেন, ঘুমোবার আগে আমরা বাইবেলের একটি করে অধ্যায় রোজ পড়ি। শুধু পড়িনা, টিকা ভাষ্য মিলিয়ে দেখে বেশ ভালো ভাবে তার আলোচনা করি। মনের যে এতে কতখানি উন্নতি হয়, কি বলব !"

পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে ডেভিডসন ও তার স্ত্রী চলে গেল। দু' একমিনিট চুপ করে থেকে ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "তাশগুলো বার করি, কেমন ?"

মিসেস ম্যাকফেল দ্বিধাভরে স্বামীর দিকে তাকাল। ডেভিডসনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ডেভিডসনরা যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে ভেবে, স্বামীকে তাশ খেলতে বারণ করতেও অথচ মন সরছে না। ডাক্তার ম্যাকফেল তাশ নিয়ে এসে 'পেশেন্স' খেলতে বসল। নিচে থেকে তখনো স্ফূর্তির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

পরের দিনটা বেশ পরিষ্কার। একপক্ষ কাল নিষ্কর্মা হয়ে প্যাগো-প্যাগোতে যখন থাকতেই হবে, তখন সময়টা যতখানি সম্ভব ভালোভাবে যাতে কাটানো যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত। ডাক্তার ম্যাকফেল সস্ত্রীক একবার জেটিতে বেড়াতে গেল, গভর্নরের বাড়িতে গিয়েও একদিন কার্ড রেখে এল। রাস্তা দিয়ে আসবার সময় মিস টমসনের সঙ্গে দেখা। ডাক্তার ম্যাকফেল টুপি খুলে অভিবাদন জানাল। মিস টমসনও হাসিমুখে চেঁচিয়ে বললে, "গুড মর্নিং ডাক্তার।" আগের দিনের মতোই তার পরনে

একটা শাদা পোশাক, অত্যন্ত উঁচু হিলের জুতো জোড়াও শাদা। তার ওপর সুপুষ্ট পায়ের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। এ জায়গায় এ রকম পোশাক কেমন একটু বিসদৃশই লাগে।

মিসেস ম্যাকফেল মন্তব্য না করে পারলে না, "পোশাকটা খুব ভব্য আমি বলতে পারলাম না। মেয়েটাকে আমার বড় সস্তা মনে হয়।"

তারা যখন বাড়ি ফিরে গেল তখন মিস টমসন বাড়ির বারান্দায় বসে বাড়িওয়ালার একটি ছেলের সঙ্গে খেলা করছে। ছেলেটির রঙ দেশী লোকেদের মতোই ময়লা।

ডাক্তার ম্যাকফেল স্ত্রীর কানে কানে বললে, "ওর সঙ্গে একটা কথা বল। বেচারা একেবারে একলা, ওকে একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।"

মিসেস ম্যাকফেলের একটু সঙ্কোচ হল। কিন্তু স্বামীর কথা সে ঠেলতে পারে না। একটু বোকার মতো সে বললে, "আমরা এক বাড়িরই বাসিন্দা, দেখছি।"

"হ্যাঁ, অধর্মের ভোগ আর কাকে বলে! এমন একটা হতচ্ছাড়া শহরে নইলে আটকে থাকতে হয়? আবার বলে কিনা মাথা গোঁজবার একটা ঘর পেয়েছি এই আমার ভাগ্যি। এদেশী কারুর বাড়িতে তা বলে আমি থাকতে পারতাম না। পোড়া জায়গায় একটা হোটেলও যে কেন করে না, বুঝি না বাপু!"

আরও দু'চারটে কথা হবার পর মিসেস ম্যাকফেল নেহাত মৌখিক আলাপ করবার আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললে, "আচ্ছা, এবার তাহলে ওপরে যাই।"

বিকেলে যখন তারা চা খেতে বসেছে, তখন ডেভিডসন এসে বললে, "নিচের স্ত্রীলোকটার ঘরে দুটো জাহাজের নাবিক বসে আছে দেখে এলাম। কি করে ওদের সঙ্গে আলাপ হল, তাই ভাবছি।"

মিসেস ডেভিডসন বললে, "ওর বিশেষ বাদবিচার আছে বলে মনে হয় না।"

কাজ নেই, কর্ম নেই, সমস্ত দিন অলস ভাবে কাটিয়ে তারা তখন বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ডাক্তার ম্যাকফেল্ বললে, "চোদ্দ দিন যদি এই ভাবে কাটাতে হয়, তাহলে শেষের দিকে আমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে পাচ্ছি না।"

ডেভিডসন বললে, "সমস্ত দিন নানা কাজে ভাগ করে দেওয়াই এখন উচিত। আমি তো ঠিক করেছি দিনের কয়েকটা ঘণ্টা পড়াশোনার জন্যে রাখব। রোদ বৃষ্টি যাই হোক কয়েকঘণ্টা ব্যায়াম করব, বাকি কিছু রাখব আমোদ-আহ্লাদের জন্যে। বর্ষাকালে এদেশে অবশ্য ব্যায়ামের জন্যে বৃষ্টি মানলে চলে না।"

ডাক্তার ম্যাকফেল একটু ভয়ে-ভয়েই ডেভিডসনের দিকে তাকাল। এ ধরনের কথাবার্তায় সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। নিচে হঠাৎ গ্রামোফোন বেজে উঠল। ডেভিডসন প্রথম শব্দটা শুনেই চমকে উঠেছিল, কিন্তু কিছুই সে বলল না। নিচে থেকে পুরুষদের গলাও এখন শোনা যাচ্ছে। সবাই মিলে তারা পরিচিত একটা গান ধরেছে। মিস টমসনও তার কর্কশ চড়া গলায় তাতে যোগ দিয়েছে। চেঁচামেচি, উচ্চ হাসি সবই যথেষ্ট পরিমাণে শোনা যাচ্ছে। কথাবার্তা বলবার চেষ্টার মাঝে মাঝে তারা নিচের ব্যাপারে কান না দিয়ে পারছিল না। গেলাশের ঠুনঠুন, চেয়ার টানার আওয়াজ ইত্যাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে আরও বহুলোকের সেখানে সমাগম হয়েছে। রীতিমতো একটা দল নিয়ে মিস টমসন স্ফূর্তি করছে।

ডাক্তার ম্যাকফেল ও ডেভিডসনের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে জিরি আলোচনা চলছিল। তারই মাঝখানে মিসেস ম্যাকফেল বলে বুঝতে "কোথা থেকে যে এদের যোগাড় করে কে জানে।"

বোঝা গেল যে মিসেস ম্যাকফেলের মন ঠিক এখানকার আলাপ আলোচনায় নেই। ডেভিডসন বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও মনে মনে যে অন্য কিছু ভাবছে তা তার চোখ মুখের ভাব থেকে বোঝা যায়। ডাক্তার তখন ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। ডেভিডসন হঠাৎ একটা অস্ফুট চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল।

"ব্যাপার কি, অ্যালফ্রেড ?" মিসেস ডেভিডসন জিগগেস করলে।

"আর কোনো ভুল নেই! আমি আগে ভাবতেই পারিনি। ও ইয়েলী থেকে এসেছে।"

"হতেই পারে না।"

"হনলুলু থেকে ও জাহাজে চড়ে। এ তো একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। তারপর এইখানে তার ব্যবসা চালাচ্ছে—এইখানে!" শেষ শব্দটা ডেভিডসন তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করলে।

"ইয়েলী কি ?" মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে।

ডেভিডসন তার দিকে তাকিয়ে বললে, "ইয়েলী জানেন না? হনলুলুর নরক, বারবনিতাদের পল্লী। আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক।"

ইয়েলী শহরের একেবারে প্রান্তে। বন্দর থেকে অলিগলি দিয়ে গিয়ে একটা ভাঙ্গা নড়বড়ে পোল পেরিয়ে গেলে একটা অত্যন্ত নির্জন এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা সামনে পড়ে। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই হঠাৎ আলোর দেখা পাওয়া যায়। রাস্তার দু'ধারে মোটর রাখবার জায়গা। সস্তা রঙচঙে খাবার-দাবার ও স্ফূর্তি করবার রেস্তোরাঁ, দু'চার পা অন্তরেই অজস্র পাওয়া যায়। প্রত্যেকটিই সস্তা পিয়ানোর আওয়াজে বিকোন। এছাড়া পথের ধারে নাপিতরা ঘর সাজিয়ে বসে আছে। নিচের ক্লাস দোকানেরও অভাব নেই; বাতাসে কেমন একটা চাঞ্চল্য, এলাম। কিসের ফুর্তির প্রত্যাশা। ডাইনে ও বাঁয়ে সরু সরু বহু গলি চলে

গেছে। তার যে-কোনো একটা দিয়ে গেলেই আসল পাড়ায় পৌছান যায়। সবুজ রঙ-করা সারি সারি ছোট ছোট বাংলো পথের ধারে সাজান। বাংলোগুলি এমন সুশৃঙ্খল, ভব্যভাবে সাজান বলেই যেন আরও কুৎসিত আরও জঘন্য মনে হয়। কামনার বেসাতিকে এমন সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা দেবার চেষ্টা বুঝি আর কখনো হয়নি। রাস্তায় আলো নেই বললেই হয়। বাংলোগুলির খোলা জানালা থেকে আলো এসে না পড়লে একেবারে অন্ধকারই থাকত। রাস্তার পথিকদের মতো প্রতি বাংলোর বাতায়নে যে সব স্ত্রীলোকেরা বসে আছে, তারা নানা জাতের। মার্কিন, চীনে, জাপানী, ফিলিপিনো কিছুই বাদ নেই। পথিকেরা অধিকাংশই নিঃশব্দে, কি যেন একটা বেদনার ভার নিয়ে চলাফেরা করছে। কামনা সত্যিই করুণ।

ডেভিডসন উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর ছিল না। বহু বছর ধরে মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল, শেষকালে খবরের কাগজগুলোও সে আন্দোলনে যোগ দিলে, কিন্তু তবুও পুলিশ কিছু করতে চায় না। তাদের যুক্তি তো জানেন। তারা বলে যে পাপ লুপ্ত হবার নয়, সুতরাং বিশেষ একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ করে, তাকে শাসনে রাখাই মন্দের ভালো; আসল কথা হল তারা ঘুষ খায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ জায়গা তুলে দিতে তাদের বাধ্য করা হয়।"

"হ্যাঁ, হনলুলুতে জাহাজে যে সব কাগজপত্র এসেছিল, তাতে একথা পড়েছিলাম বটে।" ডাক্তার ম্যাকফেল বললে।

ডেভিডসন আবার বললে, "ঠিক যেদিন আমরা হনলুলুতে পৌছই, সেদিনই ইয়েলীর সমস্ত বাসিন্দাকে বাড়ি-ছাড়া করে আদালতে হাজির করা হয়। স্ত্রীলোকটির আসল পরিচয় আমি গোড়াতেই কেন বুঝতে পারিনি ভাবছি।"

মিসেস ম্যাকফেল বললে, "হ্যাঁ, এখন আমারও মনে পড়ছে। জাহাজ ছাড়বার মাত্র কয়েক মিনিট আগে মেয়েটি এসে ওঠে। তখনই তার চালচলন দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম।"

ডেভিডসন উত্তেজিত ভাবে বললে, 'কোন সাহসে সে এখানে এসে ওঠে!"

ডেভিডসন দরজার দিকে অগ্রসর হতে ডাক্তার ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "আপনি করবেন কি?"

"কি করব বুঝতে পারছেন না? আমি এখানে ওকে থাকতে দেব না। এ বাড়ি একটা—একটা—" মেয়েদের সম্মান বাঁচিয়ে বর্ণনা করা যায় এমন একটা কথা খুঁজে না পেয়ে সে খানিকটা চুপ করে রইল। দারুণ উত্তেজনায় তার বিবর্ণ মুখে চোখ দুটো তখন জ্বলছে।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "ওখানে তিন-চারজন লোক আছে বলে মনে হচ্ছে। এখন ওখানে যাওয়াটা কি ঠিক সুবুদ্ধির কাজ হবে?"

ডাক্তারের দিকে অত্যন্ত অবজ্ঞার একটা দৃষ্টি হেনে ডেভিডসন বেরিয়ে গেল।

ডেভিডসনের স্ত্রী বললে, "ওঁকে আপনি চেনেন না, নইলে বুঝতেন, কর্তব্যের ডাক যেখান থেকে আসে, সেখানে উনি নিজের বিপদের কথা গ্রাহ্যই করেন না।"

হাত দুটো জড়ো করে নিচে কি ঘটবে তারই অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে সে বসে রইল। অন্য সবাইও তখন তারই মতো কান পেতে আছে। তারা শুনতে পেল ডেভিডসন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সশব্দে নেমে গিয়ে, নিচের দরজা খুললে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ গান থেমে গেল, কিন্তু গ্রামোফোনটায় কর্কশ স্বরে বেহায়া গানটা বেজেই চলল। ডেভিডসনের গলা তারা শুনতে পেল আর সেই সঙ্গে কি একটা ভারি জিনিস পড়বার শব্দ। গ্রামোফোনটা থেমে যেতে বোঝা গেল সেইটাই সে মেঝেতে

ফেলে দিয়েছে। কথাগুলো বুঝতে পারা না গেলেও ডেভিডসনের গলা আবার শোনা গেল। তার পরেই মিস টমসনের চড়া তীক্ষ্ণ গলা, এবং সেই সঙ্গে একটা দারুণ হট্টগোল—যেন কয়েকজন এক সঙ্গে মিলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। মিসেস ডেভিডসন চমকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে হাত দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরল। ডাক্তার ম্যাকফেল দ্বিধাভরে তার দিক থেকে, নিজের স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল। নিচে যাবার ইচ্ছে তার নেই, তবে তার কাছে এই রকম একটা কিছু দুঃসাহস তারা আশা করছে কি না, তা সে ঠিক বুঝতে পারলে না। নিচে থেকে একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির শব্দ যেন আসছে, শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হলো ডেভিডসনকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়া হল। এক মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ। তার পরেই শোনা গেল ডেভিডসন সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে যাচ্ছে।

"আমার এখন একটু ওঁর কাছে যেতে হবে," বলে মিসেস ডেভিডসন বেরিয়ে গেল।

মিসেস ম্যাকফেল পেছন থেকে বললে, "আমাদের যদি দরকার হয় তো ডাকবেন।" তারপর মিসেস ডেভিডসন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর স্বামীর দিকে ফিরে বললে, "আশা করি কোনোরকম জখম হননি।"

ডাক্তার ম্যাকফেল শুধু বললে, "উনি নিজের চরকায় তেল দিলেই তো পারতেন।"

দু-এক মিনিট তারা চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ দুজনেই চমকে উঠল। নিচে গ্রামোফোনটা আবার যেন তাচ্ছিল্যভরেই বেজে উঠেছে। উচ্চৈস্বরে কর্কশ গলায় সেখানে একটা অশ্লীল গান বিদ্রূপের সঙ্গে তারা গাইছে।

পরের দিন মিসেস ডেভিডসনকে যেন অত্যন্ত বিবর্ণ ক্লান্ত মনে হল। মাথাটা তার ধরে আছে, বললে। একদিনে যেন সে আরও বুড়ো

শুকনো হয়ে গেছে। মিসেস ম্যাকফেল তার কাছ থেকেই জানতে পারল যে আগের রাত্রি ডেভিডসন সম্পূর্ণ জেগে কাটিয়েছে। সারা রাতের অস্থিরতার পর সকাল পাঁচটায় উঠে সে বেরিয়ে যায়। বেরুবার সময় এক গ্লাশ-বিয়ার তার গায়ের ওপর কে ছুঁড়ে দেয়। তার সমস্ত জামা কাপড়ে দাগ লেগে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। মিস টমসনের কথা আলোচনার সময় মিসেস ডেভিডসনের চোখে যেন একটা আগুন জ্বলছে মনে হল।

"মিস্টার ডেভিডসনকে ঘাঁটান মানে যে কি, একদিন ও হাড়ে হাড়ে বুঝবে। মিস্টার ডেভিডসনের মন অত্যন্ত উঁচু, বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা পায়নি এমন কেউ নেই। কিন্তু পাপ তিনি কখনো ক্ষমা করেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর রাগ যখন জ্বলে ওঠে তখন তিনি সত্যিই ভীষণ।"

মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "কেন, কি তিনি করবেন?"

"তা জানি না, কিন্তু দুনিয়ার সব কিছু দিলেও ওর অবস্থায় পড়তে আমি এখন রাজী নই।"

মিসেস ম্যাকফেল একটু শিউরে উঠল। মিসেস ডেভিডসনের সদম্ভ আস্ফালনের পেছনে সত্যিই যেন একটা ভয়াবহ কিছু আছে। তারা দুজনে একসঙ্গেই সেদিন সকালে বাইরে বেরুবে ঠিক ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মিস টমসনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল ছেঁড়া-খোঁড়া একটা ড্রেসিং-গাউন পরে সে কি যেন একটা রান্না করছে।

তাদের দেখে সে ডেকে বললে, "গুড মর্নিং! মিস্টার ডেভিডসন আজ সকালে একটু ভালো আছেন কি?"

তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পেছন থেকে মিস টমসন বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠাতে মিসেস ডেভিডসন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ফিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললে,

"খবরদার আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমায় অপমান করলে এখান থেকে দূর করে দেবার ব্যবস্থা করব।"

"আ গেল যা! মিস্টার ডেভিডসনকে আমার ঘরে আসতে আমি সেধেছিলাম নাকি?"

মিসেস ম্যাকফেল তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বললে, "ওর কথার জবাব দেবেন না।"

বেশ খানিকদূর হেঁটে গিয়ে মিসেস ডেভিডসন বলে উঠল, "একেবারে বেহায়া, একেবারে।" রাগে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে মনে হল।

ফেরবার পথে আবার মিস টমসনের সঙ্গে তাদের দেখা। পরিপাটি করে সাজগোজ করে সে জেটির দিকেই যাচ্ছে। তাদের দেখে সে অত্যন্ত খুশি মনেই যেন ডাক দিলে। তাকে যেন দেখেও দেখেনি এমনি ভাবে গম্ভীর মুখে তাদের চলে যেতে দেখে দুজন মার্কিন নাবিক দাঁত বার করে হেসে উঠল।

তারা বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই আবার বৃষ্টি নেমে এল। মিসেস ডেভিডসন তিক্তস্বরে বললে, "এই বৃষ্টিতে ভিজে ঐ বাহারে পোশাকের এবার দফা-রফা।"

তাদের খাওয়া প্রায় যখন অর্ধেক শেষ হয়েছে, তখন ডেভিডসন ফিরে এল। বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলেও পোশাক ছাড়বার কোনো চেষ্টা তার দেখা গেল না। মাত্র দু'এক গ্রাস মুখে তুলে বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে নীরব বিষণ্ণ মুখে সে বসে রইল। মিসেস ডেভিডসন সেদিন মিস টমসনের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলার পরও তার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সে যে শুনেছে, শুধু তার ভ্রূকুটি থেকেই বোঝা গেল।

মিসেস ডেভিডসন বললে, "তুমি কি বল, মিস্টার হর্নকে ওকে এখান

থেকে বার করে দিতে বলা উচিত নয়? আমাদের এভাবে অপমান করতে তো দিতে পারি না।"

"কিন্তু ওর এখান থেকে যাবার কোনো জায়গা কোথাও আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।" ডাক্তার ম্যাকফেল বললে।

"কেন?" মিসেস ডেভিডসন বললে, "ও গিয়ে দেশী কোনো লোকের বাড়িতে থাকতে পারে।"

"এরকম বৃষ্টিতে থাকবার পক্ষে তাদের কুঁড়েঘর খুব সুখের জায়গা বলে তো মনে হয় না।"

"আমি নিজে সেরকম কুঁড়েতে বছরের পর বছর কাটিয়েছি।" ডেভিডসন বললে।

খাবার শেষে মিষ্টি বলতে রোজই কিছু কলার বড়া তাদের জন্যে বরাদ্দ। দেশী যে ছোট মেয়েটি সেগুলো নিয়ে এসেছিল, ডেভিডসন তার দিকে ফিরে বললে, "মিস টমসনকে জিগগেস করে এস তো তার সঙ্গে এখন আমার দেখা করার সুবিধে হবে কিনা?" মেয়েটি সলজ্জভাবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

ডেভিডসনের স্ত্রী জিগগেস করলে, "ওর সঙ্গে কি জন্যে দেখা করতে চাও অ্যালফ্রেড?"

"ওর সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্য। ওকে সব রকম সুযোগ দিয়ে তার পর যা করবার আমি করব।"

"ও যে কি, তা তুমি জাননা। তোমায় ও অপমান করবে।"

"করুক অপমান, আমার গায়ে থুথু দিক, তবু ওর মধ্যে যে অবিনশ্বর আত্মা আছে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবই।"

মিসেস ডেভিডসনের কানে এখনো সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার বিদ্রূপের হাসি যেন বাজছে। সে বললে, "কিন্তু ও যে একেবারে রসাতলে তলিয়ে গেছে।"

"এমন কোন রসাতলে তলিয়ে গেছে, ভগবানের করুণা যেখানে পৌঁছয় না?" ডেভিডসনের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল, তার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল। "তা হতে পারে না। পাপের পঙ্কে পাপী নরকেরও তলায় ডুবে যেতে পারে, তবু যিশুর ভালোবাসা তার কাছে গিয়ে পৌঁছবেই।"

মেয়েটি খানিক বাদে খবর নিয়ে এল। "মিস টমসন সেলাম দিয়ে বলেছে, কাজের সময়ে ছাড়া যখন খুশি মিস্টার ডেভিডসন এসে দেখা করলে সে খুশি হবে।"

নিঃশব্দে সবাই একথা শুনলে। ডাক্তার ম্যাকফেলের মুখে একটু যে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল তাড়াতাড়ি সেটা সে. সামলে নিলে। মিস টমসনের স্পর্ধায় মজা পেলে, তার স্ত্রী যে খুশি হবেনা তা সে জানে!

নীরবে খাওয়া শেষ করে মেয়েরা তাদের কাজ নিয়ে বসল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকে মিসেস ম্যাকফেল অসংখ্য কম্ফর্টার এ-পর্যন্ত বুনেছে। সেই রকম আর একটি কম্ফর্টার এখন আবার সে বুনছে। ডাক্তার তার পাইপ ধরাল, কিন্তু ডেভিডসন তার চেয়ার থেকে না উঠে অন্যমনস্ক-ভাবে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে কোনো কথা না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা শুনতে পেল সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। মিস টমসনের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর স্পর্ধিত অবজ্ঞার স্বরে তার "ভেতরে আসুন" বলাও শোনা গেল। প্রায় এক ঘণ্টা ডেভিডসন মিস টমসনের সঙ্গে কাটাল।

ডাক্তার ম্যাকফেল বসে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল। এবার সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠছে। ইংল্যাণ্ডের মতো মাটির ওপর এখানে ধীরে ধীরে কোমল ভাবে বৃষ্টি পড়ে না। এ বৃষ্টি নিষ্ঠুর, কেমন যেন ভয়ানক। এর ভেতরে প্রকৃতির আদিম শক্তির কী যেন একটা হিংস্রতা আছে

বলে মনে হয়। ঝরে পড়ছে না, এ বৃষ্টি যেন আকাশ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে বন্যার মতো। করোগেটের টিনের ছাদগুলোর ওপর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত একঘেয়ে আওয়াজে মাথা যেন খারাপ হয়ে আসে। বৃষ্টির একটা নিজস্ব উগ্রতা যেন আছে। এক এক সময় মনে হয় না থামলে বুঝি চীৎকার করে না উঠে পারা যাবে না। তার পরেই হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়, মনে হয় শরীরের সমস্ত হাড়গুলো যেন নরম হয়ে এসেছে। এ-দুর্দশার এ-হতাশার যেন শেষ নেই।

ডেভিডসন ফিরে আসার পর সবাই উৎসুকভাবে তার দিকে তাকাল। "আমি তাকে সমস্ত সুযোগ দিয়েছি, অনেক করে বলেছি অনুতাপ করতে। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত খারাপ।" ডেভিডসান একটু থামল। ডাক্তার ম্যাকফেল দেখলে তার দৃষ্টি গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, বিবর্ণ মুখ আরও কঠিন, আরও নির্মম।

"যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, তাঁর মন্দির থেকে যে-চাবুক দিয়ে প্রভু যিশু সুদখোর আর মহাজনদের তাড়িয়েছিলেন, সেই চাবুক এবার আমি ধরব।" ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে ডেভিডসন ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে ফিরতে লাগল।

"পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যদি সে পালিয়ে যায় তবু আমি তাকে খুঁজে বার করব।" হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে ঘরের বাইরে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে গেল শুনতে পাওয়া গেল।

"উনি করতে যাচ্ছেন কি?" মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে।

মিসেস ডেভিডসন চোখ থেকে চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বললে, "জানি না। প্রভুর কাজ যখন উনি করেন, তখন ওঁকে আমি কিছু জিগগেস করি না।" সঙ্গে সঙ্গে তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"কি ব্যাপার কি?"

"নিজেকে উনি একেবারে ক্ষয় করে ফেলবেন। নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখতে উনি কখনো শেখেননি।"

তাদের ফিরিঙ্গি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ডাক্তার ম্যাকফেল, ডেভিডসন কি করেছে না করেছে জানতে পারল। ডাক্তার তার দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হর্ন নিজেই চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে আলাপ করলে।

"মিস টমসনকে ঘরভাড়া দেওয়ার জন্যে পাদ্রিসাহেব তো আমার ওপর ক্ষেপে গেছেন। কিন্তু তাকে যখন ঘরভাড়া দিই, তখন সে কে, কি বৃত্তান্ত আমি কিছুই জানতাম না। কেউ ঘর চাইতে এলে, ভাড়া দেবার যোগ্যতা তার আছে কিনা সেইটুকুই আমি খোঁজ করি। মিস টমসন তো এক-হপ্তার ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিয়েছে।"

ডাক্তার ম্যাকফেল নিজেকে ঠিক ধরা দিতে না চেয়ে বললে, "যাই বলি না কেন, বাড়ি তো আপনার। আপনি যে আমাদের থাকতে দিয়েছেন সেই জন্যেই আমরা বাধিত।"

হর্ন একটু সন্দিগ্ধভাবে ডাক্তারের দিকে তাকালে। পাদ্রিসাহেবের দলে ডাক্তার যে কতখানি আছে তা হর্ন এখনো ঠিক করতে পারেনি। একটু ইতস্তত করে সে বললে, "ব্যাপার কি জানেন, পাদ্রিদের সব এক জোট। কোনো ব্যবসাদারের পেছনে যদি লাগে তাহলে তার দোকান-পাট আগে থাকতে তুলে সরে পড়াই মঙ্গল।"

"ডেভিডসন কি মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেবার কথা কিছু আপনাকে বলেছেন?"

"না। বলেছেন, ভালো ভাবে যদি সে চলে, তাহলে তাকে বার করে দিতে আমায় তিনি বলতে পারেন না। আমার ওপরও অবিচার করবেন না তিনি বললেন। শুধু আমাকে কথা দিতে হয়েছে যে ওর ঘরে আর লোকজন কেউ আসবে না। এই মাত্র আমি গিয়ে ওকে বলে এসেছি।"

"শুনে কি বললে ?"

"কি আর বলবে। প্রায় প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুললে।" হর্নের মুখ দেখেই বোঝা গেল মিস টমসনের কাছে তাকে বেশ নাকাল হতে হয়েছে।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে; "যাই হোক, আমার তো বিশ্বাস ও এখান থেকে চলে যাবে। একেবারে একলা থাকতে হলে ও যে এখানে থাকতে চাইবে তা তো মনে হয় না।"

"এখানকার দেশী কোনো লোকের বাড়িতে ছাড়া, ওর যাবার কোনো জায়গা যে নেই! আর পাদ্রিদের আক্রোশ যখন ওর ওপর পড়েছে, তখন কোনো দেশী লোকও ওকে এখন আর নিতে সাহস করবে না।"

ডাক্তার ম্যাকফেল বৃষ্টির দিকে চেয়ে, "বৃষ্টি থামবার জন্যে অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই মনে হচ্ছে," বলে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে বসে ডেভিডসন তার কলেজে পড়বার সময়ের কথা বলছিল। তার অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ছুটির সময় নানা খুচরো কাজকর্ম করে সে কোনোরকমে তার পড়াশোনা চালাবার পয়সা সংগ্রহ করত।

নিচে সব চুপচাপ। মিস টমসন তার ছোট ঘরে একলা বসে আছে। কিন্তু হঠাৎ গ্রামোফোনটা বেজে উঠল। একা থাকতে না পেরে জেদ করেই সে সেটা বাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গান গাইবার আজ কেউ নেই। গ্রামোফোনের আওয়াজটাও তাই যেন কেমন করুণ, যেন সঙ্গী পাবার জন্যে একটা মিনতি। ডেভিডসন একেবারে গ্রাহ্যই করলে না। সে একটা সুদীর্ঘ বিবরণ দিচ্ছিল, কোনো রকম ভাবান্তর না দেখিয়ে সে গল্প বলেই চলল।

গ্রামোফোনটা বেজেই চলেছে। মিস টমসন রেকর্ডের পর রেকর্ড চাপিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন তার অসহ্য। এক ফোঁটা বাতাস কোথাও নেই, গরমে যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। ম্যাকফেলদের সেদিন

রাত্রে ঘুমই এল না। পাশাপাশি শুয়ে মশারির বাইরে মশাদের তীক্ষ্ণগুঞ্জন তারা শুনতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় মিসেস ম্যাকফেল চুপি চুপি বললে, "ও আবার কি?" তারা ডেভিডসনের গলা শুনতে পেল। সশব্দে একঘেয়ে সুরে সে মিস টমসনের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করছে।

দু'তিন দিন এইভাবে চলে গেল।' আজকাল পথে দেখা হলে মিস টমসন বিদ্রূপভরে অন্তরঙ্গতা দেখাবার চেষ্টা করে না, এমন কি হাসেও না; বরং ভ্রূকুটি করে যেন তাদের দেখেইনি এমনি ভাবে নাক উঁচু করে চলে যায়। ম্যাকফেল তাদের বাড়িওয়ালার কাছে জানতে পারলে যে, মিস টমসন অন্য জায়গায় বাড়ি নেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পায়নি। সন্ধ্যার সময় সে গ্রামোফোনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বাজিয়ে যায়, কিন্তু তাতে আর যেন প্রাণ নেই। ফূর্তির ভানটা নেহাতই ধরা পড়ে যায়, নাচের বাজনার সুরটায় বুকভাঙা, হতাশ কান্নার রেশ ফুটে ওঠে। রবিবার দিন গ্রামোফোন বেজে উঠতেই ডেভিডসন বাজনা বন্ধ করবার জন্যে হর্নকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলে। মিস টমসন গ্রামোফোন থামিয়ে দিলে। করোগেটের ছাদের ওপর বৃষ্টির শব্দ ছাড়া সমস্ত বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ।

পরের দিন হর্ন ম্যাকফেলকে বললে, "মিস টমসন বেশ একটু ভাবনায় পড়েছে মনে হয়। পাদ্রিসাহেব যে কি করবেন সে বুঝতে পারছে না, তাইতে আরও ভড়কে গেছে।"

সেদিন সকালে ম্যাকফেল চকিতে একবার তাকে দেখেছিল। তার মনে হয়েছে মিস টমসনের সেই উদ্ধত ভাব আর নেই। সেখানে বেশ একটা ভয়ের ছায়া পড়েছে।

হর্ন আড়চোখে একবার ম্যাকফেলের দিকে চেয়ে বললে, "মিস্টার ডেভিডসন কি করবেন তা বোধহয় আপনি জানেন না।"

"না জানি না।"

হর্ন যে তাকে একথা জিগগেস করবে এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ নিজেরই তার কেমন মনে হয়েছে যে, ডেভিডসনের গতিবিধির ভেতর কি একটা রহস্য যেন আছে। ডেভিডসন যেন অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকটির চারধারে একটা জাল বুনে তুলছে, ঠিক সময় হলেই সে-জাল সে টেনে বন্ধ করে দেবে।

হর্ন আবার বললে, "পাদ্রিসাহেব আমাকে বলতে বলেছিলেন যে, মিস টমসন যখন ইচ্ছে ডেকে পাঠালে তিনি দেখা করতে প্রস্তুত।"

"আপনি বলেছিলেন সে-কথা ? শুনে মিস টমসন কি বললে ?"

"কিছুই বলেনি। আমি ও-কথাটা বলেই চলে এসেছি—দাঁড়াইনি। পাছে আবার কাঁদতে শুরু করে এই ছিল আমার ভয়।"

"এমন ভাবে একা থাকতে থাকতে ও নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। আর এই বৃষ্টি—এতে যে-কোনো লোকের মেজাজ বিগড়ে যায়," ডাক্তার বিরক্তির সঙ্গে বললে, "এ হতভাগা জায়গায় বৃষ্টি কি কখনো থামে না।"

"বর্ষাকালে বৃষ্টিটা বেশ প্রচুরই হয়। বছরে প্রায় তিনশো ইঞ্চি। সমুদ্রের খাঁড়ির গড়নটার দরুনই বোধ হয় এরকম হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত বৃষ্টিই যেন তাতে টেনে আনে।"

ডাক্তার বললে, "জাহান্নামে যাক সমুদ্রের খাঁড়ি।" তার মেজাজটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে।

বৃষ্টি থেমে যখন সূর্য ওঠে, তখন যেন এখানে আরও অসহ্য বোধহয়। দম বন্ধ করা চাপা ভাপসা একটা গরম। কেমন যেন একটা অনুভূতি হয় যে, চারদিকে সব কিছু হিংস্র দুরন্তভাবে বেড়ে উঠছে। এদেশের লোকেরা এমনিতে শিশুর মতো হাসি-খুশি, কিন্তু এসময় রঙ-করা চুল আর গা-ময় উল্কি নিয়ে তাদের কেমন ভয়ঙ্কর মনে হয়। খালি পায়ে যখন তাদের কেউ পিছু পিছু রাস্তায় হেঁটে যায়, তখন সত্যিই গা-টা কেমন ছম-ছম

করে। মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে নিঃশব্দে পেছনে এসে এক পলকের মধ্যে পিঠে বুঝি ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। সেই ফাঁক ফাঁক চোখের দৃষ্টিতে কি যে প্রচ্ছন্ন আছে, কেউ বলতে পারে না। তাদের দেখলে কতকটা অতীতকালের মন্দির-গাত্রে আঁকা, আদিম মিশরবাসীর কথা মনে পড়ে। অসীম প্রাচীনত্বের একটা বিভীষিকা তাদের মধ্যে যেন আছে।

ডেভিডসন খুব ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করে। সে যে কি করছে, ম্যাকফেলরা ঠিক জানে না। হর্নের কাছে শুধু জানা গেছে যে ডেভিডসন রোজ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে। একদিন গভর্নরের কথা সে নিজে থেকেই তুললে, "বাইরে থেকে মনে হয় গভর্নরের খুব মনের জোর আছে, কিন্তু আসলে কোনো মেরুদণ্ডই নেই।"

ডাক্তার একটু পরিহাস করে বললে, "তার মানে আপনি যা চান, তা ঠিক তিনি করতে রাজী নন, কেমন?"

ডেভিডসন না হেসে বললে, "যা উচিত, তাই তাঁকে দিয়ে আমি করাতে চাই।"

"কিন্তু কোনটা যে উচিত, তা নিয়ে মতভেদ তো থাকতে পারে?"

"কারুর পায়ে এমন পচা ঘা যদি হয়, যাতে সে মারা পড়তে পারে, তাহলে সে পা কাটতে কেউ গড়িমসি করলে আপনি তাকে সমর্থন করবেন কি?"

ডাক্তার বললে, "ওরকম পচা ঘা সত্যিকার চাক্ষুষ জিনিস।"

"আর পাপ?" ডেভিডসন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল। এ কথার আর কোনো জবাব যেন হতে পারে না।

ডেভিডসন কি যে করেছে, শিগগিরই জানা গেল। দুপুরের খাওয়ার পর সাধারণত মেয়েরা ও ডাক্তার কিছুক্ষণ একটু বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে। ডেভিডসনই শুধু এ ধরনের আলস্যের ওপর খড়্গহস্ত। সেদিন

খাওয়া শেষ হবার পর তখনো তারা বিশ্রাম করতে যায়নি, এমন সময় ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। মিস টমসন ভেতরে এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ডেভিডসনের কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "এই নচ্ছার ছুঁচো! গভর্নরের কাছে আমার নামে কি লাগান হয়েছে?" রাগে তার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

এক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর ডেভিডসন একটা চেয়ার টেনে বললে, "একটু বসবে না? আমি তোমার সঙ্গে আর একবার আলাপ করতেই চাইছিলাম।"

"পাজি, বদমাস, বেজন্মা," মিস টমসন অভদ্র, অশ্রাব্য ভাষায় যা নয় তাই বলে, অজস্র গালমন্দ দিয়ে গেল।

তার আস্ফালন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডেভিডসন গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, "আমায় যে গালাগালই দাও না কেন, আমার গায় তা লাগবে না। কিন্তু এখানে মহিলারা আছেন এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতে বলি।"

এত রাগের ভেতরও মিস টমসনের চোখ দিয়ে এখন জল বেরিয়ে আসছিল। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, তার মুখ এমনি আরক্ত।

"কি, হয়েছে কি?" জিগগেস করলে ডাক্তার ম্যাকফেল।

"একজন এসে এই মাত্তর বলে গেল যে, পরের জাহাজেই আমাকে বিদেয় হতে হবে।"

ডেভিডসনের মুখে কোনো ভাবান্তর না হলেও চোখে যেন একটু ঝিলিক দেখা গেল। সে বললে, "অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে গভর্নর তোমায় এখানে থাকতে দেবেন, তুমি আশা কর?"

মিস টমসন চীৎকার করে উঠল, "এ তোর কাজ। আমাকে আর ন্যাকা বোঝাতে হবে না। এ—তুই-ই করেছিস!"

"তোমাকে মিথ্যে বলতে আমি চাই না। আমিই গভর্নরকে বুঝিয়েছি যে,

নিজের দায়িত্ব পালন করতে হলে, এ ছাড়া আর কিছু তাঁর করবার নেই।"

"আমার ওপর এ জুলুম না করলেই কি হতো না? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।"

"তা করলে বিন্দুমাত্র রাগ আমি করতাম না, এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতে পার।"

"এই অখদ্দে শহরে থাকবার যেন আমার কত গরজ! আমি তেমন গাঁইয়া, না জংলী?"

ডেভিডসন জবাব দিলে, "তাহলে তোমার নালিশ করবার কি কারণ আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না।"

প্রচণ্ড রাগে অস্ফুট একটা চীৎকার করে টমসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সবাই আবার চুপচাপ। ডেভিডসন অবশেষে বললে, "শেষ পর্যন্ত গভর্নরের যে টনক নড়েছে এটা সুখের কথা। মানুষটা দুর্বল, গড়িমসি করছিলেন। আমায় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মাত্র দু' হপ্তার জন্যে তো এখানে আছে, তাতে কি আর এমন ক্ষতি হবে। তারপর এপিয়ায় যদি চলে যায়, তাহলে তো তাঁর কোনো দায়ই নেই, কারণ এপিয়া হল বৃটিশ এলাকা।"

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে ডেভিডসন আবার বললে, "দায়িত্ব যাদের ওপর আছে তারা কি ভাবে যে দায় এড়াতে চায় তা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। তাদের কথা শুনলে মনে হয়, চোখের আড়াল হলেই, পাপের যেন আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ওই স্ত্রীলোকটির অস্তিত্বই একটা কলঙ্ক, আর-কোনো দ্বীপে তাকে চালান করে দিলে সে কলঙ্ক ঘোচে না। শেষকালে তাই আমায় সাফ কথা বলতে হয়েছে।"

ডেভিডসনের মুখটা এখন অত্যন্ত হিংস্র দেখাচ্ছে। তার ভ্রূকুটি কুটিল মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

ডাক্তার ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "সাফ কথা মানে ?"

"ওয়াশিংটনেও আমাদের মিশনের খুঁটির জোর একেবারে নেই এমন নয়। আমি গভর্নরকে বুঝিয়ে দিলাম যে, তিনি যে ভাবে কাজ চালাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো নালিশ সেখানে পৌঁছলে তাঁর বিশেষ সুবিধে হবে না।"

খানিক চুপ করে থেকে ডাক্তার জিগগেস করলে, "ওকে কবে যেতে হবে ?"

"সিডনি থেকে আগামী মঙ্গলবার সানফ্রানসিস্‌কো যাবার জাহাজ আসছে। সেই জাহাজেই তাকে যেতে হবে।"

তখনো তার পাঁচদিন বাকি। ডাক্তার ম্যাকফেল আজকাল সময় কাটাবার জন্যে প্রতিদিন সকালে, ওখানকার হাসপাতালে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসে। ডেভিডসনের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরের দিনই হাসপাতাল থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ওঠবার সময়, বাড়িওয়ালা হর্ন তাকে থামিয়ে বললে, "মাপ করবেন, ডাক্তার ম্যাকফেল। মিস টমসনের অসুখ করেছে। আপনি একবার দেখবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই।"

হর্ন তাকে মিস টমসনের ঘরে নিয়ে গেল। সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মেয়েটি চুপ করে অলসভাবে বসে আছে। পরনে তার সেই শাদা পোশাকটা, মাথায় ফুল দেওয়া সেই বড় টুপি। পাউডার দেওয়া সত্ত্বেও তার মুখের চামড়া অসুস্থ ও ফ্যাকাশে। চোখ দুটো কেমন ফোলা।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "আপনি অসুস্থ শুনে আমি দুঃখিত।"

"না, ব্যামো-ট্যামো আমার সত্যি কিছু হয়নি। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ওকথা বলেছি। ফ্রিসকো যাবার জাহাজে আমায় তো সরে পড়তে হচ্ছে।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মিস টমসনের চোখে একটা সচকিত দৃষ্টি ডাক্তার ম্যাকফেল অনুভব করলে। হাত দুটো সে নিজের অজ্ঞাতেই যেন

মুঠো করছে আর খুলছে। ডাক্তার বললে, "তাই তো আমি শুনেছি।"
মিস টমসন একবার ঢোক গিলে বললে, "এখন ফ্রিস্কো গেলে আমার খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কাল বিকেলে গেছলাম গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু নাগালই পেলাম না। সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম। সে তো বললে, ও-জাহাজে আমায় যেতেই হবে, এর আর কোনো চারা নেই। গভর্নরের সঙ্গে আমার দেখা না করলেই নয়। তাই আজ সকালে বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেরিয়ে আসতেই ধরলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কি কইতে চায়! কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে বললে যে, সিডনি যাবার পরের জাহাজ যতদিন না আসে, ততদিন আমি এখানে থাকতে পারি, শুধু ডেভিডসন যদি রাজী হন।"

কথা শেষ করে সে ডাক্তারের দিকে কাতরভাবে তাকালে। ডাক্তার বললে, "আমি যে কি করতে পারি, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।"
"আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি একটু কষ্ট করে আমার হয়ে ওঁকে বলেন। ভগবানের দোহাই, শুধু আমায় যদি এখানে থাকতে দেয় তাহলে আমি টুঁ শব্দটি আর করব না। তিনি যদি চান তো বাড়ির বাইরে পর্যন্ত যাব না। দু'হপ্তা বইতো আর নয়!"
"আচ্ছা, আমি তাঁকে বলব।"
হর্ন কিন্তু মাথা নেড়ে বললে, "তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। তোমাকে মঙ্গলবারের মধ্যে বিদেয় করে দেবেনই। সুতরাং এখন থেকে মন ঠিক করে ফেললেই পার।"
মেয়েটি আবার ডাক্তারকে মিনতি করে বললে, "ওঁকে বলবেন, সিডনিতে আমি কাজ যোগাড় করে নিতে পারব, সত্যিকারের ভালো কাজ'। এটুকু আমার জন্যে তবু কি তিনি করবেন না?"
"আমি যতদূর পারি চেষ্টা করে দেখব।"

"আর দোহাই আপনার, কি হল না হল আমায় একটু জানিয়ে দেবেন। একটা কিছু কিনারা না হওয়া পর্যন্ত, কিছুতে আমার মন বসছে না।"

কাজটা খুব খুশি হয়ে করবার মতো নয়। নিজের স্বভাব অনুযায়ী বোধহয় ডাক্তার সোজাসুজি একথা পাড়তে পারলে না; মিস টমসনের কথা স্ত্রীকে বলে, সে তাকেই, মিসেস ডেভিডসনের কাছে একথা তুলতে বললে। তার নিজের কাছে ডেভিডসনের ব্যবহার একটু জবরদস্তই মনে হয়েছে। সত্যিই মেয়েটিকে আর দিন চোদ্দ প্যাগো-প্যাগোতে থাকতে দিলে, কি এমন ক্ষতি হয়?

তার দৌত্যের ফলটা এমন দাঁড়াবে, সে অবশ্য ভাবতে পারেনি। ডেভিডসন সোজা এসে তাকে বললে, "আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম যে, টমসন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছে।"

লাজুক লোকেদের হঠাৎ বাইরে টেনে আনলে যেমন বিক্ষোভ হয়, ডেভিডসনের এই সামনাসামনি আক্রমণে ডাক্তার তেমনি একটু উষ্ণ হয়েই উঠল, "মেয়েটি সানফ্রানসিস্‌কোর বদলে সিডনি গেলে কি ক্ষতি হয় আমি তো বুঝতে পারি না। আর এখানে যতদিন আছে ততদিন ভালো ভাবে থাকবার যদি কথা দেয়, তাহলে ওর ওপর জুলুম করাও তো কোনোমতে যায় না।"

ডেভিডসন তার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিগগেস করলে, "সানফ্রানসিস্‌কো যেতে ওর আপত্তি কেন?"

ডাক্তার বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে, "তা আমি খোঁজ করিনি। নিজের চরকায় তেল দেওয়াই আমি অনেক ভালো মনে করি।" কথাটা একটু বেফাঁস হয়ে গেল, সে নিজেই বুঝতে পারলে।

ডেভিডসন জবাব দিলে, "প্রথম যে-জাহাজ এখান থেকে যাবে, তাতেই ওকে চালান করবার আদেশ গভর্নর দিয়েছেন। তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন এবং আমিও তাতে বাধা দেব না। এখানে থাকলে সমূহ বিপদ।"

"আমার মনে হয় আপনি ওর ওপর অত্যন্ত অন্যায় যথেচ্ছাচার করছেন।"

মহিলা দুজন বেশ একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই ডাক্তারের দিকে তাকাল। কিন্তু ঝগড়া হওয়ার আশঙ্কা তাঁদের অমূলক। ডেভিডসন হেসে বললে, "আপনি আমার সম্বন্ধে একথা ভাবেন বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমায় বিশ্বাস করুন ওই হতভাগিনীর জন্যে সত্যিই বুক আমার ফেটে যায়। তবু আমি শুধু আমার কর্তব্য করবার চেষ্টা করছি।"

ডাক্তার কোনো উত্তর দিলে না, অপ্রসন্ন মুখে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। এই একবার বুঝি বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে। সমুদ্রের খাঁড়ির ওপারে দেশী গ্রামের কয়েকটা কুটির গাছপালার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার বললে, "বৃষ্টি থেমেছে, এই সুযোগে আমি একটু বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।"

ডেভিডসন করুণভাবে হেসে বললে, "আপনার কথা রাখতে পারছি না বলে, আমার ওপর মনে মনে কোনো রাগ পুষে রাখবেন না। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমার সম্বন্ধে আপনার খারাপ কিছু ধারণা হলে, সত্যিই আমি দুঃখ পাব।"

ডাক্তার জবাব দিলে, "নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা এত বেশি ভালো যে, আমার ধারণা আপনি অম্লান বদনে সহ্য করতে পারবেন।"

ডেভিডসন ঈষৎ হেসে বললে, "এবার আমায় একহাত নিয়েছেন।"

অকারণে ডেভিডসনের প্রতি অভদ্র হওয়ার দরুন নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে, ডাক্তার ম্যাকফেল যখন নিচে নেমে গেল, তখন মিস টমসন তার দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

'তাঁকে কিছু বলেছেন নাকি?' সে জিগগেস করলে।

'হ্যাঁ, আমি দুঃখিত, তিনি কিছুই করবেন না।' ডাক্তার ম্যাকফেল টমসনের মুখের দিকে চাইতেই পারছিল না। কিন্তু হঠাৎ মিস টমসনকে ফুঁপিয়ে

উঠতে শুনে তার দিকে এবার ফিরে তাকাল। মিস টমসনের মুখ ভয়ে
শাদা হয়ে গেছে। ডাক্তার ম্যাকফেল কি রকম বিহ্বল হয়ে গেল। তারপর
তার মাথায় একটা মতলব এল। বললে, "এখনো আশা ছাড়বেন না
আপনার প্রতি ওদের ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি
আমি গভর্নরের সঙ্গে এই নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"এখন?"

ডাক্তার মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ। মিস টমসনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে
উঠল, বললে, "সত্যি আপনার বড় দয়া। আপনি আমার হয়ে বললে
তিনি নিশ্চয়ই আমায় থাকতে দেবেন। এখানে যতদিন থাকব, দেখবেন
আমার এতটুকু বেচাল পাবেন না।"

গভর্নরের কাছে টমসনের হয়ে কিছু বলবে বলে কখন যে ডাক্তার ঠিক
করেছে, সে নিজেই ভালো করে জানে না। মেয়েটির কি হয় না হয় সে
বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, শুধু ডেভিডসনই তাকে ঘাঁটিয়ে তুলেছে
তুষের আগুনের মতো, তার রাগ আবার সহজে নেভে না।

গভর্নরকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। লোকটি সুপুরুষ। নৌ-বিভাগের
আগে কাজ করতেন। শাদা ড্রিলের ধোপদস্ত একটা ইউনিফর্ম গায়ে।

ম্যাকফেল বললে, "আমরা যে বাড়িতে আছি সেখানকারই একজন
স্ত্রীলোকের বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তার নাম
টমসন।"

গভর্নর হেসে বললেন, "তার সম্বন্ধে শুনতে আর বোধহয় আমার কিছু
বাকি নেই ডাক্তার ম্যাকফেল। আমি তাকে পরের মঙ্গলবার এখান
থেকে চলে যাবার হুকুম দিয়েছি। এর বেশি আর আমি কিছু করতে
পারিনা।"

"আমি বলছিলাম কি, আপনার হুকুমটা একটু বদলে, তাকে আর
কিছুদিন যদি এখানে থাকতে দেন, যাতে সানফ্রানসিসকো থেকে যে

জাহাজ আসছে তাতে করে সে সিডনি যেতে পারে। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি সে ভালো হয়ে থাকবে।"

গভর্নরের মুখের হাসি না মিলিয়ে গেলেও, তাঁর চোখের দৃষ্টি একটু কঠিন হয়ে এল।

'আপনার কথা রাখতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম ডাক্তার ম্যাকফেল। কিন্তু হুকুম যা দিয়েছি তা রদ হবার নয়।"

ডাক্তার যতদূর সম্ভব যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গভর্নরের মুখের হাসিও এবার মিলিয়ে গেল। অপ্রসন্ন মুখে, দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে গভর্নর সব শুনে গেলেন! কিন্তু ম্যাকফেলের বুঝতে বাকি রইল না যে, সে বৃথাই বকে যাচ্ছে।

অবশেষে গভর্নর বললেন, "কারুর কোনো অসুবিধে করতে আমি চাই না। কিন্তু মঙ্গলবারে ওকে জাহাজে চড়তেই হবে। এ-বিষয়ে আর কিছু করবার নেই।"

'কিন্তু ক'দিন বাদে গেলে ক্ষতিটা কি হতো?"

'মাপ করুন ডাক্তার ম্যাকফেল, আমার সরকারী কাজকর্মের কৈফিয়ৎ, আসল কর্তৃপক্ষের কাছে ছাড়া কারুর কাছে দেওয়ার আমি প্রয়োজন বোধ করি না।"

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভর্নরের দিকে চেয়ে দেখলে। ডেভিডসন গভর্নরকে যা বলে শাসিয়েছিল তার সেই ইঙ্গিতটুকুও ডাক্তারের মনে পড়ল। গভর্নরের ভাবগতিক দেখে বেশ বোঝা গেল, তিনি যথেষ্ট বিব্রত হয়েছেন।

ডাক্তার একটু রাগের সঙ্গেই বললে, "ডেভিডসনের সব কিছুতেই মাতব্বরি অসহ্য।"

'আপনার কাছে বলতে আপত্তি নেই ডাক্তার," গভর্নর বললেন, 'ডেভিডসনের ওপর বিশেষ প্রসন্ন হতে আমি পারিনি, কিন্তু এটুকু আমি

বলতে বাধ্য যে তিনি যা করেছেন তা তাঁর অধিকারের বাইরে নয়। এখানে মিস টমসনের মতো একজন স্ত্রীলোকের থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বিশেষ করে যখন নৌ-বিভাগের এতগুলি লোককে দেশী-বাসিন্দাদের ভেতর থাকতে হয়।" কথা শেষ করে গভর্নর উঠে পড়লেন। বাধ্য হয়ে ডাক্তার ম্যাকফেলকেও উঠতে হল।

গভর্নর বললেন, "কিছু মনে করবেন না আমার একটা কাজ আছে। মিসেস ম্যাকফেলকে আমার নমস্কার দেবেন।"

অত্যন্ত মন-মরা হয়ে ডাক্তার গভর্নরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। মিস টমসন যে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে সে জানে। কিছু যে সে করতে পারেনি, সামনাসামনি সেকথা বলতে পারবে না বলে ডাক্তার পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে একরকম চোরের মতোই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল।

খাওয়ার সময় ডাক্তারকে নেহাত চুপচাপ থাকতে দেখা গেল, কিরকম একটা অস্বস্তি যেন তার মনে রয়েছে। কিন্তু ডেভিডসনের যথেষ্ট উৎসাহ ও স্ফূর্তি দেখা গেল। যে-ভাবে বেশ একটা বিজয় গর্বের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে তার দিকে তাকাচ্ছিল, তাতে হঠাৎ ডাক্তারের মনে হল ডেভিডসন বোধহয় গভর্নরের সঙ্গে তার দেখা করতে গিয়ে বিফল হওয়ার কথা জানে। কিন্তু সেকথা জানবেই বা কি করে? লোকটার কি যেন একটা অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়। খাওয়া শেষ হবার পর বারান্দায় হর্নকে দেখে, তার সঙ্গে যেন সাধারণ আলাপ করবার অছিলায় ডাক্তার বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় যেতে হর্ন চুপি চুপি বললে, "ও জিগগেস করছিল আপনার গভর্নরের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা।"

"হ্যাঁ, হয়েছে, তিনি কিছুই করবেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আর কিছু আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"আমি জানতাম তিনি কিছু করবেন না। পাদ্রিদের বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহসই ওদের নেই।"

"কি কথা হচ্ছে আপনাদের?" বলে হেসে ডেভিডসন তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

হর্ন অম্লান বদনে জবাব দিলে, "আমি বলছিলাম যে, আপনাদের অন্তত আর এক হপ্তার আগে এপিয়ায় যাবার সম্ভাবনা নেই।"

ডেভিডসন তাদের ছেড়ে চলে যাবার পর তারা আবার বসবার ঘরে ফিরে গেল।

দু'বেলাই খাবার পর ডেভিডসন আমোদ ও বিশ্রামের জন্যে এক ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তার বিশ্রাম শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে দরজায় মৃদু আওয়াজ শোনা গেল।

মিসেস ডেভিডসন তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "ভেতরে আসুন।"

তবু দরজা কেউ খুলল না। মিসেস ডেভিডসন নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খোলবার পর দেখা গেল চৌকাঠের কাছে মিস টমসন দাঁড়িয়ে। তার চেহারার পরিবর্তন দেখলে বিশ্বাস হয় না। রাস্তায় যে তাদের টিটকিরি দিয়েছিল, সেই দজ্জাল বেহায়া স্ত্রীলোক আর সে নয়। উদ্বেগে আতঙ্কে সে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। যে চুল তার সাধারণত অত্যন্ত পরিপাটি ভাবে বাঁধা থাকে তা এখন এলোমেলো অগোছালভাবে ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে আছে। সাধারণ একটা স্কার্ট ও ব্লাউজ সে পরেছে, তাও ধোপদস্ত নয়, লাট হয়ে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে ভেতরে ঢুকতে সাহস করছে না। গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

মিসেস ডেভিডসন কর্কশ-স্বরে জিগগেস করলে, "কি চাও?"

ধরা গলায় সে বললে, "মিস্টার ডেভিডসনের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

ডেভিডসন উঠে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সাদর সম্ভাষণের সঙ্গে বললে, "এসো, ভেতরে এসো। কি করতে পারি তোমার?"

টমসন ভেতরে ঢুকে বললে, "বলছিলাম, সেদিন যা বলেছি আর যা-কিছু করেছি, তার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। সেদিন জিভটা বোধহয় বড় আলগা ছিল। তার জন্যে মাপ চাইছি।"

"ও, সে কিছু নয়। অমন দুচারটে কড়া কথা সহ্য করবার মতো পিঠ আমার যথেষ্ট মজবুত।"

অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে ভিখিরীর মতো ভঙ্গীতে ডেভিডসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে বললে, "আমায় একেবারে ঘায়েল করে দিয়েছেন। আমি ডুবতে বসেছি। বলুন, জোর করে আর আমায় 'ফ্রিস্কো' পাঠাবেন না।"

ডেভিডসনের মুখের প্রসন্নতা এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তার স্বর কঠিন হয়ে উঠল, "কেন তুমি সেখানে ফিরে যেতে চাও না?"

ভয়ে কাঁচু-মাচু হয়ে সে বললে, "মানে, আমার আপনার জন সেখানে আছে কিনা? আমার এ অবস্থা আর তাদের দেখাতে চাই না। আর আপনি যেখানে বলেন আমি যাব।"

"কেন তুমি সানফ্রানসিস্কোয় ফিরে যেতে চাও না? ঠিক করে বল।"

"বললাম তো আপনাকে।"

ডেভিডসন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মর্মস্থল ভেদ করে ফেলতে চাইছে মনে হল। হঠাৎ নিজেই যেন চমকে উঠে সে বললে, "জেলখানা।"

মিস টমসন চীৎকার করে উঠল, তার পর মাটিতে বসে পড়ে তার পা জড়িয়ে ধরে বললে, "দোহাই আপনার, সেখানে আমায় ফেরত পাঠাবেন না। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি ভালো হব এসব ছেড়ে দেব।"

এলোমেলো ভাবে সে আরও অনেক কিছুই কাতর ভাবে বলতে লাগল। তার রঙ-করা গাল বেয়ে অঝোরে তখন চোখের জল ঝরে পড়ছে। ডেভিডসন নিচু হয়ে তার মুখটা তুলে ধরে নিজের দিকে চাইতে বাধ্য করে বললে, "কেমন, তাই ঠিক তো ? জেলখানা।"

হাঁপাতে হাঁপাতে মিস টমসন বললে, "ধরা' পড়বার আগেই আমি সরে পড়েছিলাম। তাদের খপ্পরে আর যদি পড়ি, তাহলে পুরো তিনটি বছর ঠেলে দেবে।"

ভডসন তাকে ছেড়ে দিলে। সে মেঝের উপর আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল।

এবার ডাক্তার ম্যাকফেল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ব্যাপারটা কিন্তু এখন অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-কথা জানবার পর আর ওকে সেখানে যেতে আপনি বাধ্য করতে পারেন না। নতুন করে জীবন ও যখন গড়তে চায়, ওকে আর একবার সুযোগ দিন।"

"আমি ওকে ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ দেব। অনুতাপ যদি ওর হয়ে থাকে, তাহলে নিজের শাস্তি ও মাথা পেতে নিক।"

কথাগুলোর মানে উল্‌টো বুঝে মিস টমসন আশায় উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে মুখ তুলে তাকাল। "আপনি আমায় ছেড়ে দেবেন ?"

"না, মঙ্গলবারে তোমায় সানফ্রানসিস্‌কোর জাহাজে উঠতে হবে।"

চাপা ধরা গলায় আর্তনাদ করতে করতে মিস টমসন মেঝের উপর উন্মত্তের মতো মাথা ঠুকতে লাগল। তার গলার স্বর একেবারে অমানুষিক। ডাক্তার ম্যাকফেল কাছে ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরে বললে, "একি, করছেন কি ? যান ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। দেখি কি করতে পারি।"

তাকে দাঁড় করিয়ে তুলে, প্রায় টানতে টানতে ডাক্তার ম্যাকফেল একরকম বয়েই নিচে নিয়ে গেল। মিস্টার ডেভিডসন ও তার স্ত্রী

কোনোরকম সাহায্য না করায় ডাক্তার তাদের উপর তখন অত্যন্ত বিরক্ত। হর্ন নিচে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার সাহায্যে ডাক্তার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সে তখন গুমরে গুমরে কাঁদছে। ডাক্তার তাকে একটা ইন্‌জেকশন দিলে।

উপরে যখন উঠে গেল, তখন ডাক্তার বেশ ক্লান্ত। ঘরের সবাই তখনো ঠিক একভাবে বসে আছে। তারা একবারও নড়েছে বা কথা বলেছে কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "আমি ওকে শুইয়ে দিয়ে এলাম।"

"আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের পতিতা ভগিনীর জন্যে সবাই মিলে আসুন আমরা প্রার্থনা করি।" ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত, যেন বহুদূর থেকে সে কথা বলছে।

খাবার টেবিল তখনো পরিষ্কার করা হয়নি। তাক থেকে বাইবেলটা পেড়ে নিয়ে, টি-পটটা টেবিলের উপর থেকে সরিয়ে সেইখানেই ডেভিডসন বসে পড়ল। তারপর গম্ভীর জোরালো গলায় বাইবেলের যেখানে অবৈধ মিলনের অপরাধে অপরাধিনী নারীর সঙ্গে, যীশুখৃষ্টের সাক্ষাতের কথা আছে, সেই অধ্যায় পড়তে লাগল।

"এবারে আসুন নতজানু হয়ে বসে আমাদের প্রিয় ভগিনী স্যাডি টমসনের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করি।" নিজে নতজানু হয়ে ডেভিডসন আকুল উচ্ছ্বাসে সুদীর্ঘ এক প্রার্থনা শুরু করলে। সে প্রার্থনার মর্ম পাপে নিমগ্ন স্যাডি টমসনের জন্য ভগবানের করুণা ভিক্ষা করা। চোখ বন্ধ করে মিসেস ডেভিডসন ও মিসেস ম্যাকফেলও হাঁটু গেড়ে তখন বসেছে। আচম্‌কা এ-রকম অনুরুদ্ধ হয়ে ডাক্তার ম্যাকফেলকেও আং ও সলজ্জভাবে বসতে হল। ডেভিডসনের প্রার্থনায় ভাষার একটা উদ্দাম আবেগ ফুটে উঠছে। তার মনে দারুণ একটা আন্দোলন যে চলছে, তার দুই গাল-বেয়ে-পড়া চোখের জলের ধারা থেকেই তা বোঝা

যায়। বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, পড়ছে তো পড়ছেই, আকাশের বিদ্বেষ যেন মানুষের মতোই হিংস্র।

অনেকক্ষণ বাদে প্রার্থনা থামিয়ে ডেভিডসন বললে, "এবারে আমরা প্রভু যীশুর প্রার্থনা আবৃত্তি করব।"

আবৃত্তি শেষ হলে, ডেভিডসনের সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল। মিসেস ডেভিডসনের মুখ ফ্যাকাশে দেখালেও কোনো ক্লান্তির চিহ্ন সেখানে নেই। সত্যই সে-মুখে সান্ত্বনা ও শান্তির চিহ্ন পরিস্ফুট। কিন্তু ম্যাকফেলরা হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলে। কোনো দিকে চাইতে পর্যন্ত যেন পারছে না।

এখন কিরকম আছে দেখে আসি," বলে ম্যাকফেল নিচে নেমে গেল। দরজায় ধাক্কা দিতে হর্নই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে। স্যাডি টমসন একটা দোলনা-চেয়ারে বসে নীরবে কাঁদছে।

'এখানে কেন?" ম্যাকফেল বলে উঠল, "আপনাকে না শুয়ে থাকতে বলেছিলাম!"

"শুতে আমি পারছি না। মিস্টার ডেভিডসনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

'তাতে কি লাভ হবে বলুন, তাঁর মন কিছুতেই গলবে না।"

"তিনি তো বলেছেন, আমি ডেকে পাঠালে তিনি আসবেন।"

ম্যাকফেল হর্নকে ইশারা করে বললে, "যান তাঁকে নিয়ে আসুন।"

হর্ন ডেভিডসনকে ডেকে আনবার পর, টমসন তার দিকে চেয়ে বললে, "আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কিছু মনে করবেন না।"

"তুমি আমাকে এখানে ডেকে পাঠাবে, সেই জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম ভগবান আমার প্রার্থনা শুনবেন।"

একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর টমসন চোখ

ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "অনেক পাপ আমি করেছি, তাই অনুতাপ করতে চাই।"

"ভগবানের অসীম করুণা, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন।" উচ্ছ্বসিত ভাবে কথাগুলো বলে ডেভিডসন, ম্যাকফেল ও হর্নকে বললে, "এর সঙ্গে আমি একটু একলা থাকব। মিসেস ডেভিডসনকে বলবেন, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে করেতে হর্ন বলে উঠল, "আশ্চর্য! কি কাণ্ড!"

সে-রাত্রে ডাক্তার ম্যাকফেলের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আর কিছুতেই যেন আসতে চায় না। ডেভিডসন সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এল, তখন ঘড়িতে সে দেখলে প্রায় দুটো বাজে। তারপরেও তাদের দুই ঘরের মাঝে কাঠের দেয়ালের ভিতর দিয়ে সে শুনতে পেল ডেভিডসন সশব্দে প্রার্থনা করছে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

পরের দিন সকালে ডেভিডসনকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তাকে আরও ক্লান্ত আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু তার চোখে কি এক অমানুষিক দীপ্তি! উদ্দাম উল্লাস যেন সে চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে উঠছে। ডাক্তার ম্যাকফেলকে সে বললে, "আপনি গিয়ে একবার স্যাডিকে দেখে আসবেন। তার শরীর ভালো হয়েছে এ আশা আমি কর পারি না, কিন্তু তার আত্মা একেবারে রূপান্তরিত।"

ডাক্তারের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, বললে, "আপনি কাল ওর কাছে অনেক রাত পর্যন্ত ছিলেন।"

"হ্যাঁ, আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না।"

ডাক্তার একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে, "আপনাকে তো বেজায় খুশি মনে হচ্ছে।"

ডেভিডসন উৎসাহদীপ্ত চোখে বললে, "ভগবানের কত বড় অনুগ্রহের পরিচয় যে আমি পেয়েছি, তা বলতে পারি না। কাল এক পথহারা আত্মাকে যীশুর প্রেমালিঙ্গনে ফিরিয়ে আনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

স্যাডি টমসন দোলনা-চেয়ারেই তখন বসে আছে। সমস্ত ঘর অগোছাল, বিছানাটা পর্যন্ত পাতা হয়নি। পোশাক না বদলে, চুলগুলো মাথায় ঝুঁটি করে বেঁধে, একটা ময়লা ড্রেসিং গাউন সে পরে আছে। অবিশ্রান্ত কান্নায় মুখটা ফোলা-ফোলা ও কোঁচকান। ভিজে তোয়ালে দিয়ে একবার মোছা সত্ত্বেও তার শ্রী ফেরেনি। ডাক্তার ভিতরে ঢুকতে তার দিকে ক্লান্ত চোখ তুলে তাকিয়ে সে বললে, "মিস্টার ডেভিডসন কোথায়?" আতঙ্কে সে সত্যই ভেঙ্গে পড়েছে।

ম্যাকফেল তিক্তস্বরে জবাব দিলে, "আপনি ডেকে পাঠালে তিনি এখুনি আসবেন। আমি এসেছিলাম শুধু আপনি কি রকম আছেন তাই দেখতে।"

"ও, আমি তোফা আছি। আপনার কোনো ভাবনা নেই।"

"কিছু কি খেয়েছেন?"

"হর্ন একটু কফি এনে দিয়েছিল।" দরজার দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে তাকিয়ে টমসন বললে, "তিনি কি তাড়াতাড়ি আসবেন মনে হয়? তিনি কাছে থাকলে যেন আমার অত খারাপ লাগে না।"

"আপনি মঙ্গলবারে যাবেন বলেই তাহলে ঠিক?"

"হ্যাঁ, তিনি বলেন আমায় যেতেই হবে। তাঁকে গিয়ে এখুনি একবার আসতে বলুন না। আপনি আর আমার কিছু করতে পারবেন না। এখন তিনি ছাড়া আর কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।"

"বেশ," বলে ডাক্তার ম্যাকফেল বেরিয়ে গেল।

পরের তিনদিন ডেভিডসন স্যাডি টমসনের সঙ্গেই প্রায় সমস্ত সময়

কাটালে। শুধু খাবার সময় ছাড়া অন্য সকলের সঙ্গে তার আর দেখা হয় না। সে যে কিছুই খাচ্ছে না, ডাক্তার ম্যাকফেল তাও লক্ষ্য করলে। মিসেস ডেভিডসন করুণভাবে বললে, "উনি নিজেকে একেবারে ক্ষয় করে ফেলছেন। সাবধান না হলে ঠিক একটা শক্ত অসুখে পড়বেন। কিন্তু নিজের কথা তো উনি কিছুতেই ভাববেন না।"

মিসেস ডেভিডসন নিজেও কেমন যেন শাদা ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মিসেস ম্যাকফেলকে সে বলেছে যে, তার ঘুম হয় না। টমসনের ঘর থেকে ওপরে এসে ডেভিডসন ক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত প্রার্থনা করে। কিন্তু তারপরেও বেশিক্ষণ সে ঘুমোতে পারে না। ঘণ্টাদুয়েক বাদেই পোশাক পরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়ে যায়। আজকাল সে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে।

"আজ সকালেই তিনি বলছিলেন যে কাল তিনি নেব্রাস্কার পাহাড়গুলোর স্বপ্ন দেখেছেন," মিসেস ডেভিডসন বললে।

ডাক্তার ম্যাকফেল বলে উঠল, "ভারি আশ্চর্য তো!"

তার মনে পড়ল আমেরিকার ওপর দিয়ে যাবার সময় ট্রেনের জানালা দিয়ে ওই পাহাড়গুলো সে দেখেছিল। গোল ও মসৃণ, ঠিক বিরাট উই ঢিবির মতো। সমতলভূমি থেকে সেগুলো যেন হঠাৎ সোজা উঠে গেছে। ডাক্তারের মনে পড়ল তখনই সেগুলো তার কাছে নারীর স্তনের মতো মনে হয়েছিল।

ডেভিডসনের অস্থিরতা তার নিজের কাছেই অসহ্য। এক হতভাগিনী নারীর হৃদয়ের গুপ্ত কোণ থেকে পাপের শেষ চিহ্ন সে সমূলে উৎপাটন করে ফেলছে এই তীব্র উল্লাসই তাকে চঞ্চল করে রাখে। স্যাডি টমসনের সঙ্গে সে বই পড়ে, তার সঙ্গেই প্রার্থনা করে।

খেতে বসে একদিন সে বললে, "আশ্চর্য ব্যাপার! একেই সত্যিকার পুনর্জন্ম বলে। তার আত্মা ছিল রাত্রির মতো কালিমাময়, এখন তা নতুন

টাটকা তুষারের মতো শুভ্র পবিত্র হয়ে উঠেছে। আমার সত্যি ভয় হয়। নিজেকে অত্যন্ত ছোট আমি মনে করি। যা-কিছু পাপ সে করেছে, তার জন্যে তার অপরূপ অনুশোচনা দেখে আমার মনে হয়, আমি তার অঞ্চলপ্রান্ত ছোঁবারও যোগ্য নয়।"

ডাক্তার জিগগেস করলে, "তাকে আপনি কোন প্রাণে সানফ্রানসিস্‌কোয় ফেরত পাঠাচ্ছেন? আমেরিকার জেলে তিন বছর মানে কি আপনি জানেন! আমি তো ভেবেছিলাম সে পরিণাম থেকে আপনি ওকে বাঁচাবেন।"

"না, আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা প্রয়োজন। আপনি কি ভাবেন ওর জন্যে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে না? আমার স্ত্রীর মতো, আমার বোনের মতো, আমি ওকে ভালোবাসি। যতদিন সে জেলে থাকবে, ততদিন তার সমস্ত যন্ত্রণা আমিও ভোগ করব!"

ডাক্তার অসহিষ্ণুভাবে বললে, "সব ভুয়ো!"

"আপনি অন্ধ, তাই বুঝতে পারছেন না। ও পাপ করেছে, সুতরাং শাস্তি ভোগ ওর করতেই হবে। কি তাকে সহ্য করতে হবে, আমি ভালো করেই জানি। তাকে অপমান করবে, যন্ত্রণা দেবে, পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেবে না। ভগবানের কাছে আত্মবলি হিসেবে, এই সব শাস্তিই আমি ক গ্রহণ করতে বলি। খুশি মনে এ-সব সে গ্রহণ করুক। যে সুযোগ সে পেয়েছে, তা খুব কম লোকেই পায়। ভগবানের মহত্ব ও করুণার সীমা নেই।" উত্তেজনায় ডেভিডসনের গলা কাঁপছিল। গভীর আবেগের সঙ্গে যে কথাগুলি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল তা সে ভালো করে উচ্চারণ করতেই পারছিল না। "সমস্তদিন আমি তার সঙ্গে প্রার্থনা করি, তার কাছ থেকে চলে এসেও সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি প্রার্থনা করি যে, যীশুর এই অসীম করুণা যেন তার ওপর বর্ষিত হয়। আমি তার হৃদয়ে শান্তি পাবার এমন আকুলতা জাগাতে চাই যে, আমি তাকে

ছেড়ে দিতে চাইলেও সে-সুযোগ সে নেবে না। যিনি একদিন তার জন্যে জীবন দিয়েছিলেন সেই প্রভু যীশুর চরণে কারাবাসের এই কঠিন শাস্তি যেন তার নৈবেদ্য বলে সে মনে করে—এই আমি চাই।"

দিনগুলো ধীরে ধীরে বয়ে যায়। নিচের তলার উৎপীড়িত হতভাগিনী স্ত্রীলোকটিকে কেন্দ্র করে,"বাড়িশুদ্ধ সবার একটা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটে। কোনো হিংস্র পৌত্তলিক পূজার রক্তাক্ত অনুষ্ঠানের জন্যে যেন বলি হিসেবে স্ত্রীলোকটিকে তৈরি করা হচ্ছে। আতঙ্কে সে অভিভূত। ডেভিডসনকে সে চোখের আড়াল করতে পারে না। সে কাছে থাকলেই শুধু সাহস পায়। ক্রীতদাসীর মতো অন্ধ অসহায় নির্ভরতায় সে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। প্রায় সব সময়েই সে কাঁদে,আর বাইবেল পড়ে ও প্রার্থনা করে। কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায়। তারপর তার শাস্তির জন্যেই সে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে, কারণ যে যন্ত্রণা সে পাচ্ছে, সে-শাস্তিতে তা থেকে একটা সত্যকার নিষ্কৃতি যেন দিতে পারে। যে অস্পষ্ট আতঙ্কের মধ্যে সে এখন বাস করছে, তা তার অসহ্য। শুধু পাপের জীবন নয়, তার সঙ্গে সমস্ত গর্ব অহমিকা সে বিসর্জন দিয়েছে। আলুথালু অবিন্যস্ত কেশে ও বেশে ঘরের মধ্যে সে যেমন-তেমন করে কাটায়। চারদিন ধরে সে তার রাত্রের শোবার পোশাক ছাড়েনি, মোজা পর্যন্ত পরেনি। তার সমস্ত ঘর অগোছালো, জঞ্জালে ভর্তি! এদিকে বৃষ্টির আর বিরাম নেই—তার মধ্যে কার যেন একটা নিষ্ঠুর ঐকান্তিকতার পরিচয় আছে। মনে হয় আকাশের সমস্ত জল বুঝি এইবার ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু তবু প্রবলধারায় বৃষ্টি পড়তেই থাকে। করোগেটের ছাদের বিরামহীন শব্দে মাথা যেন খারাপ হয়ে যাবে মনে হয়। সব কিছুই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। দেওয়ালে ও মেঝের ওপর রাখা জুতোগুলোয় ছাতা পড়তে শুরু করেছে। বিনিদ্র দীর্ঘ রাত্রি মশার ক্রুদ্ধ গুঞ্জনে মুখরিত।

ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "একটি দিনের জন্যে বৃষ্টি থামলেও যে বাঁচা যায়।"

সিডনি থেকে সানফ্রানসিস্‌কোর জাহাজ আসবে মঙ্গলবার। সেই দিনটির জন্যে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। এই উদ্বেগ অসহ্য। ডাক্তার ম্যাকফেলের সম্বন্ধে বলা যায় যে এই অভাগী স্ত্রীলোকটিকে বিদায় করে দেবার আগ্রহই প্রবল হয়ে উঠে, করুণা বা বিরক্তি যা-কিছু তার মনে ছিল সব দূর করে দিয়েছে। যা অমোঘ তা মেনে নিতেই হবে। তার মনে হয় জাহাজটা ছাড়লে সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। গভর্নরের আপিসের একজন কেরাণী স্যাডি টমসনের সঙ্গে জাহাজে যাবে। সোমবার বিকালে সে ভদ্রলোক দেখা করতে এসে স্যাডি টমসনকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে পরের-দিন সকাল এগারটায় সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। ডেভিডসন তখন তার কাছেই বসেছিল।

সে বললে, "সব কিছু ঠিক যাতে থাকে আমি তার ভার নিচ্ছি। আমি নিজে ওকে জাহাজে তুলে দিতে যাব।"

মিস টমসন কোনো কথাই বললে না।

রাত্রে আলো নিভিয়ে সাবধানে মশারির তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ডাক্তার ম্যাকফেল বললে, "যাক এবার, ভগবানের দয়ায় সব চুকে গেল। কাল এমন সময় ও আর এখানে থাকবে না।"

মিসেস ম্যাকফেল বললে, "মিসেস ডেভিডসনও খুশি হবেন। তিনি বলছিলেন যে, ডেভিডসন শরীর একবারে পাত করে ফেলছেন। এখন মেয়েটি একেবারে বদলে গেছে?"

"কে?" জিগগেস্ করলে ম্যাকফেল।

"কে আর! স্যাডি টমসন। আমি এতখানি সম্ভব বলেই ভাবিনি। সত্যি এসব দেখলে মন আপনি নত হয়ে আসে।"

ডাক্তার ম্যাকফেল কোনো উত্তর দিলে না। খানিক বাদে ঘুমিয়েও পড়ল। অত্যন্ত ক্লান্ত থাকার দরুন ঘুমটা সেদিন একটু বেশি গাঢ়ই হয়েছিল।

হঠাৎ সকালবেলা পায়ে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে ডাক্তার চমকে জেগে উঠল। হর্ন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ডাক্তারকে কোনোরকম কথা বলতে বারণ করে হর্ন তাকে সঙ্গে যেতে ইশারা করলে। সাধারণত নেহাত খেলো প্যান্ট ছাড়া হর্ন কিছু পরে না, আজকে তার পরনে লুঙ্গির মতো দেশী 'লাভালাভা' ছাড়া আর কিছু নেই, পাও তার খালি। তাকে হঠাৎ রীতিমতো বুনো দেখাচ্ছে। ডাক্তার বিছানা থেকে উঠতে উঠতে দেখতে পেল তার সারা গায়ে উল্কি। হর্নের ইশারায় ডাক্তার বাইরে বারান্দায় যাবার পর সে চুপি চুপি বললে, "শব্দ করবেন না, আপনাকে বিশেষ দরকার, তাড়াতাড়ি জুতো পরে একটা কোট গায়ে চাপিয়ে নিন।"

ডাক্তার ম্যাকফেলের প্রথমেই মনে হল, মিস টমসনের হয়তো কিছু হয়েছে। "ব্যাপার কি? আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে যাব?"

"না, শিগগির চলুন শিগগির।"

ডাক্তার ম্যাকফেল শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে রবার সোল একটা জুতো পরে পাজামার ওপরই একটা ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। দুজনে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখলে বাড়ির বাইরে যাবার দরজাটা খোলা। সেখানে জন দুয়েক দেশী লোক জটলা দাঁড়িয়ে আছে।

"কি, হয়েছে কি?" ডাক্তার জিগগেস করলে।

"আমাদের সঙ্গে আসুন," বলে হর্ন এগিয়ে গেল।

সবার আগে হর্ন, তার পেছনে ডাক্তার এবং তার পরে দেশী লোকেরা দল বেঁধে রাস্তা পার হয়ে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল। ডাক্তার দেখলে

জলের ধারে কি একটা জিনিসের চারধারে একদল দেশী লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে সবাই ডাক্তারের জন্য একটু সরে দাঁড়াল। হর্নের হাতের ঠেলায় এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার যা দেখলে তাতে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। অর্ধেক জলে অর্ধেক ডাঙায় সমুদ্রের বালির ওপর একটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে—মৃতদেহ ডেভিডসনের। বিপদে আত্মহারা হলে চলে না। ডাক্তার তাই নিচু হয়ে বসে মৃতদেহটা উলটে দিল। এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত ডেভিডসনের গলা কাটা। যে ক্ষুরে এ কাজ করা হয়েছে, সেটা তখনো ডান হাতে ধরা আছে।

"একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে," ডাক্তার বললে, "বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন।"

হর্ন বললে, "এদের একজন কাজে যাবার সময় এইখানে এইমাত্র ওঁকে দেখে। দেখেই আমায় গিয়ে খবর দেয়। আত্মহত্যা বলেই কি আপনার মনে হয়?"

"হ্যাঁ, পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

হর্ন দেশী ভাষায় কি যেন বলল। দুজন যুবক তাই শুনে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, "পুলিশ না আসা পর্যন্ত লাশ এইভাবেই রাখতে হবে।"

"আমার বাড়িতে যেন নিয়ে না যায়," হর্ন বললে, "বাড়িতে আমি কিছুতেই এ-লাশ নিয়ে যেতে দেব না।"

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললে, "পুলিশ যা বলে তাই তোমায় করতে হবে। তবে আমার মনে হয় ওরা 'ময়না-ঘরেই' নিয়ে যাবে।"

তারা সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে লাগল। হর্ন তার ট্যাক থেকে একটা সিগারেট বার করে ডাক্তার ম্যাকফেলকে দিলে। সিগারেট খেতে খেতে ডাক্তার ডেভিডসনের মৃতদেহটাই লক্ষ্য করে দেখছিল। সত্যই ব্যাপারটা তার কাছে দুর্বোধ্য।

হর্ন সেই প্রশ্নই করলে, "এ কাজ কেন উনি করলেন বলুন তো ?"
ডাক্তার নিঃশব্দে কাঁধ দুটো একটু নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, কিছুই সে জানে না। খানিক বাদেই একজন নৌসেনার অধীনে একটা স্ট্রেচার নিয়ে কয়েকজন পুলিশ এল। তারপরেই এল দুজন নৌ-বিভাগের কর্মচারী ও একজন ডাক্তার। তারা বেশ গুছিয়েই যা করবার সব করে ফেললে। কর্মচারীদের একজন জিগগেস করলে, "ওঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কি করা যায় ?"
ডাক্তার বললে, "আপনারা যখন এসেছেন, তখন আমি বাড়ি গিয়ে পোশাকটা বদলে নিতে পারি। তারপর ওঁর স্ত্রীর কাছে কথাটা ভাঙবার ব্যবস্থাটা করব। আমার মনে হয়, যে অবস্থায় লাশটা এখন আছে, তা তাঁর না দেখাই ভালো।"
"তা ঠিক বটে," নৌ-বিভাগের ডাক্তার বললে।
ডাক্তার ম্যাকফেল বাড়ি ফিরে যেতেই তার স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে বললে, "মিসেস ডেভিডসন তো স্বামীর জন্যে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছেন। সারা রাত তিনি শুতে আসেননি। রাত দুটোর সময় মিস টমসনের ঘর থেকে তাঁর বেরুবার শব্দ মিসেস ডেভিডসন শুনেছেন, কিন্তু তিনি ওপরে না এসে বেরিয়ে গেছেন। তখন থেকে এখন পর্যন্ত যদি তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন, তাহলে তো তাঁর মারা যাবার কথা।"
ডাক্তার ম্যাকফেল স্ত্রীকে সব কথা বলে, খবরটা কোনো রকমে মিসেস ডেভিডসনকে জানাবার কথা বললে।
ভয়ে বিস্ময়ে খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে মিসেস ম্যাকফেল জিগগেস করলে, "কিন্তু, এ কাজ তিনি করলেন কেন ?"
"জানি না।"
"কিন্তু আমি পারব না, পারব না এ-খবর দিতে।"
"তোমায় দিতেই হবে।"
সশঙ্ক কাতর দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে তার স্ত্রী ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে একমিনিট চুপ করে থেকে ডাক্তার দাড়ি কামাতে গেল। তার স্ত্রীর মিসেস ডেভিডসনের ঘরে যাওয়ার শব্দ সে শুনেছে। দাড়ি কামানো সেরে পোশাক বদলে, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তার স্ত্রী ফিরে এসে বললে, "মিসেস ডেভিডসন তাঁর স্বামীকে দেখতে চান।"

"ওরা তাঁকে লাশ-খানায় নিয়ে গেছে। আমাদেরও ওঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত মনে হয়। খবরটা শুনে কি, করলেন কি?"

"মনে হয় কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। চোখ দিয়ে জল পড়েনি কিন্তু গাছের পাতার মতো কাঁপছেন।"

আমাদের এখুনি তাহলে যাওয়া উচিত।"

দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতেই মিসেস ডেভিডসন বেরিয়ে এল। চোখ তার শুকনো, কিন্তু তাকে অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ডাক্তারের কাছে তার স্থৈর্যটা অস্বাভাবিক ঠেকল। কেউ কোনো কথা না বলে নীরবে রাস্তা দিয়ে রওনা হল।

শুধু লাশ-খানায় পৌছোবার পর মিসেস ডেভিডসন বললে, "আমি তাঁকে একলা গিয়ে দেখতে চাই।"

তারা সরে দাঁড়াল। একজন দেশী লোক দরজা খুলে ধরলে। মিসেস ডেভিডসন ভিতরে যাবার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তারা দুজনে বসে ; অপেক্ষা করতে লাগল। দুচারজন ইউরোপীয়ান এসে চাপা গলায় তাদের সঙ্গে আলাপ করে গেল। ডাক্তার ম্যাকফেল ব্যাপারটা যতটুকু জানে তাদের বললে। অনেকক্ষণ বাদে দরজা আবার খুলল। মিসেস ডেভিডসন বেরিয়ে আসতেই সবাই এবার নীরব হয়ে গেল।

"এবার আমি ফিরে যেতে চাই," বললে মিসেস ডেভিডসন। তার স্বর কঠিন, অকম্পিত। তার চোখের দৃষ্টির অর্থ ডাক্তার ম্যাকফেলের কাছে দুর্বোধ মনে হল। তার বিবর্ণ মুখে অসম্ভব এক কাঠিন্য। কোনো কথা না

বলে ধীরে ধীরে তারা অগ্রসর হল। আর একটা মোড় ঘুরলেই তাদের বাড়ি। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই মিসেস ডেভিডসন যেন আতঙ্কে শিউরে উঠল, তারাও এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে-শব্দ তাদের কানে যাচ্ছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। এতদিন যে গ্রামোফোন নীরব হয়ে ছিল আবার তা উচ্চ কর্কশ স্বরে বাজছে—তাতে বাজছে একটা নাচের সঙ্গীত।

মিসেস ম্যাকফেল আতঙ্ক-জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, "ওটা কি ?"

"চলুন, এগিয়ে চলুন।" বললে মিসেস ডেভিডসন।

বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তারা হলঘরে ঢুকল। মিস টমসন তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এক নাবিকের সঙ্গে গল্প করছে। এ কদিনের ভয়কাতুরে নোংরা চেহারা আর তার নেই। যা কিছু শৌখিন বেশভূষা তার আছে সবই যেন সে পরেছে—সেই শাদা পোশাক, সেই চকচকে উঁচু হিলের জুতো, শাদা মোজা পরা সেই পরিপুষ্ট পায়ের গোছ আবার দেখা যাচ্ছে। চুল তার পরিপাটি করে বাঁধা, তার ওপরে রঙচঙে ফুল-বসানো সেই প্রকাণ্ড টুপি। মুখ তার রঙকরা, ঠোঁট দুটি লাল, ভুরু মিশ কালো করে টানা। মাথা উঁচু করে আজ সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম যেমন দেখা গিয়েছিল এখন তেমনি উদ্ধত, গর্বিত তার ভঙ্গী। তারা ভেতরে আসতেই সে উচ্চৈঃস্বরে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল। তারপর মিসেস ডেভিডসন নিজের অনিচ্ছাতেই একটু থমকে দাঁড়াতে সে ঘৃণাভরে মাটিতে থুতু ফেললে। মিসেস ডেভিডসন সসঙ্কোচে একটু পিছিয়ে গেল। তার গালের দুটো জায়গা লাল হয়ে উঠল। হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

রাগে আগুন হয়ে ডাক্তার ম্যাকফেল টমসনের ঘরে ঢুকে বললে, "এ কি শয়তানি হচ্ছে ? গ্রামোফোন থামাও।"

গ্রামোফোনের কাছে গিয়ে ডাক্তার রেকর্ডটা তুলে ফেলতেই টমসন

তার দিকে ফিরে ঝাঁজালো গলায় বললে, "দেখ ডাক্তার, আমার সঙ্গে এসব আদিখ্যেতা চলবে না। কেন আমার ঘরে ঢুকেছ শুনি?"

'তার মানে?" ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল, "কি তুমি বলতে চাও?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, টমসন তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "চিনি, তোমাদের সব পুরুষকেই চিনি! নোংরা ইতর শূয়োর সব! তোমরা সবাই সমান, সব শূয়োর, শূয়োর।" তার মুখে যে অসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে উঠল তা বর্ণনা করা যায় না।

ডাক্তার চমকে উঠল। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এবার তার বুঝতে আর বাকি নেই।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র





মেহিউ

বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রা নির্ধারিত হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার থেকে। অদৃষ্টের বিধান হিসেবে এ অবস্থা তারা যে কেবল মেনে নেয় এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রে বেশ খুশি হয়েই স্বীকার করে। চটুলগতি মোটরের মতো জনতার পাশ কাটিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা অথবা খোলা রাস্তায় যদৃচ্ছা বেড়ানো—এ দুটোর কোনোটাই তাদের পছন্দ নয়। তারা চলে ধীর মন্থর চালে, সংস্কারের বাঁধা সড়কের উপর দিয়ে ট্রামগাড়ির মতো গড় গড় করে। এদের আমি শ্রদ্ধা করি, সমাজের সেরা লোক এরা ; পিতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে, অনিন্দনীয়। তা ছাড়া ট্যাক্‌স্ তো কাউকে দিতে হবে ! এরা নমস্য কিন্তু এদের নিয়ে মাতামাতি করা চলে না।

এক ধরনের দুঃসাহসী লোক আছে, খুব মুষ্টিমেয় তাদের সংখ্যা, যারা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাদের সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। অদ্ভুত লোক ওরা, নিজের খুশি মতো নিজের জীবন গড়ে-পিটে তৈরি করে নেয়। 'খুশি' অর্থাৎ 'স্বাধীন ইচ্ছা' বলে কোনো পদার্থ—সত্যি হয়তো নেই, হয়তো যা আছে সেটা নিতান্ত মন-গড়া। কিন্তু কল্পনা করতেও তো ভালো লাগে ! জীবনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে হয় ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে খুশি চলে যেতে পারি—পথ খোলা। শেষ পর্যন্ত যে-পথটা বেছে নিই সেটা যে আমার জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল, ইতিহাসের অমোঘ গতি যে আমায় সেই বিশেষ পথে হাত ধরে নিয়ে গেল—সে-কথা বুঝেও বুঝি না।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অদ্ভুতকর্মাদের মধ্যে গোড়াতেই নাম করতে হয় মেহিউএর। ওর মতো লোক খুব কমই মেলে। মেহিউ ছিল ডেট্রোয়ার নাম করা প্রতিষ্ঠাবান উকিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেই চমৎকার পসার জমিয়েছিল, পয়সাও করেছিল বেশ। সবদিক দিয়ে উন্নতির পথ ওর প্রশস্ত। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মানুষ হিসাবেও চমৎকার, সততা ওর স্বভাবগত। অর্থশালী লোক অথবা দেশকর্মী হিসেবে ও অনায়াসে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারত।

এ হেন মেহিউ একদিন সন্ধ্যাবেলা তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু সমভিব্যাহারে বসেছিল তার ক্লাবে। কয়েক গ্লাশের পর সকলেরই মেজাজ অল্পবিস্তর রঙিন। বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল সদ্য ইতালি প্রত্যাগত। সে গল্প করছিল ক্যাপ্রি দ্বীপের। ক্যাপ্রি অতি মনোরম জায়গা, ভূমধ্য সাগরের মধ্যমনি। সেই ক্যাপ্রির সুদৃশ্যতম বাড়ির প্রশংসায় বন্ধুটি পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। নেপল্‌স উপসাগরের উপর পাহাড়, পাহাড়ের উপর বিস্তীর্ণ ছায়াশীতল বাগানের ঠিক মাঝখানে সেই বাড়ি।

মেহিউ বললে, "বেড়ে শোনাচ্ছে তো। আচ্ছা বাড়িটা কেনা যায় ?"

"কেনা আবার যায় না। ইতালিতে সব কেনা যায়।"

"একটা দাম জানিয়ে 'তার' করলে কেমন হয়।"

"ক্ষেপেছ না কি হে, ক্যাপ্রিতে বাড়ি কিনে কি করবে ?"

মেহিউ সংক্ষেপে বললে, "বসবাস করব।"

ক্লাবে বসেই ফর্ম আনিয়ে মেহিউ 'তার' পাঠিয়ে দিল। কয়েকঘন্টা বাদেই জবাব এল। বাড়ির কর্তা বাড়ি বেচতে রাজী হয়ে 'তার' পাঠিয়েছেন।

মেহিউ ভণ্ডামির ধার ধারতো না। বেশ খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করলে যে প্রকৃতিস্থ থাকলে এরকম একটা অদ্ভুত কাজ ও কিছুতেই করতে পারত না। তাই বলে নেশাছুট-অবস্থায় কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ—

সে ওর ধাতস্থ নয়। ঝোঁকের মাথায় কিছু করা বা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা—এসব মেহিউএর স্বভাবের বাইরে। আসলে লোকটা খুব খাঁটি। অন্য লোকের কাছে বেপরোয়া ভাব দেখাতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতো বোকামি ও করত না। সেই যে বলেছিল, 'বসবাস করব', সেই কথামতই ক্যাপ্রিতে বসবাস করা সম্বন্ধে ও মন স্থির করে ফেলল। ধনদৌলতের প্রতি ওর মায়া ছিল না তা ছাড়া ইতালিতে বাস করার মতো টাকা পয়সা ওর যথেষ্ট ছিল। ও ভাবল, 'বেশ হবে। বাজে লোকদের ততোধিক বাজে মামলা-মোকদ্দমা মেটাবার জন্য পণ্ডশ্রম না করে জীবনটা একটা ভালো কাজে লাগানো যাবে।' কী যে করবে সে-কথা তখনও কিছু ঠিক করেনি। আপাতত ওর ইচ্ছে, অভ্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি লাভ করা। ওর বন্ধুরা ওকে মনে করল খামখেয়ালী, কেউ কেউ চেষ্টাও করেছিল ওকে নিরস্ত করতে। ও কারো কথায় কান দিল না। সব ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ করে আসবাবপত্র প্যাক করে, একদিন মেহিউ ক্যাপ্রি পাড়ি দিলে।

শুষ্ক নিরাভরণ পাথরের ওপর ক্যাপ্রি দ্বীপের ভিত্তি, দ্বীপের ওপর সহাস্য সবুজ আঙুরের ক্ষেত, নিচে গাঢ় নীল সমুদ্র—এই দুয়ে মিলে ক্যাপ্রিকে যেন সুষমামণ্ডিত করে রেখেছে। দূর থেকে মনে হয় দ্বীপটি যেন অভ্যর্থনা করছে নতুন পরিচিত বন্ধুর মতো—এ অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বাস নেই, শিষ্টাচার আছে। মেহিউএর মতো লোক, যার সৌন্দর্যবোধ এক-রকম ভোঁতা—সে যে এই মনোরম ক্যাপ্রিতে চিরস্থায়ী বাসপত্তন করবে এটা আমার কাছে চিরকালই অদ্ভুত ঠেকেছে। আনন্দ, মুক্তি অথবা একটানা অবসর এ তিনটের কোনটা ওর কাম্য ছিল জানি না। কি সন্ধান করেছে তাও জানিনা, যা ও পেয়েছে তার সঙ্গে তবু খানিকটা পরিচয় আছে। এই রূপরসগন্ধের ঐশ্বর্যময় জগতে ও নিলে কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত—দেহের জীবনটা উপেক্ষা করে মনের জীবন তৈরি করার কাজে ও উঠে

পড়ে লাগল। সম্রাট টাইবেরিয়াস-এর স্মৃতিবিজড়িত এই ক্যাপ্রি, প্রাচীন ইতালির ইতিহাসে এই দ্বীপটির নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে রয়ে গেছে। ওর জানালার বাইরে তাকালেই মেহিউ দেখতে পায় উন্নতদেহ ভিসুভিয়াস, দিনের বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ের গায়ে বিচিত্র রঙের সমারোহ। প্রাচীন রোমান ও গ্রীকদের কথা মনে করিয়ে দেয়—এইরকম কত শত জায়গা ইতস্তত ছড়ানো। অতীতের ভূত যেন মেহিউ-এর ঘাড়ে চেপে বসল। আগে কখনো বিদেশে বিভুঁয়ে পা দেয়নি। নতুন যা কিছু দেখছে তাই যেন ওর মনকে, ওর কল্পনাকে নাড়া দিচ্ছে। এমনিতেই হাত গুটিয়ে বসে থাকা ওর ধাত নয়। স্থির করল ও ইতিহাস লিখবে। কিছুদিন লাগল বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে। রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শতকের ইতিহাস লেখা ও শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল। খুব কম লোকই ওই শতকের ইতিহাস ভালো করে জানে, তা ছাড়া সে সময়টা রোমে এমন কতগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যার সঙ্গে আধুনিক কালের সমস্যার অনেকখানি মিল আছে।

মেহিউ বই-সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই দস্তুরমতো বড় একটা লাইব্রেরি গড়ে তুললে। আইনজীবি হিসেবে একটা অভ্যাস ওর রপ্ত হয়েছিল, সে হল তাড়াতাড়ি পড়া ও তাড়াতাড়ি পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণ করা। ও কাজ শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন ক্যাপ্রির লেখক ও আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের মতো মেহিউও সন্ধেবেলায় পিয়াৎসার ধারে ছোট্ট একটি সরাবখানায় আড্ডা দেবার জন্য জমায়েত হতো। ক্রমে অধ্যয়নে যত মন বসতে লাগল, ততই ও নিজেকে সরিয়ে নিতে লাগল নিজের মধ্যে। আগে আগে ও সমুদ্রের জলে স্নান করত, দুবেলা বেড়াতে যেত আঙুরের ক্ষেতে। ক্রমেই সময়ের অপব্যয় যাতে না হয় সেজন্য ও স্নান ভ্রমণ দুইই বাদ দিলে। দেত্রোয়ায় থাকতে যতখানি পরিশ্রম করত তার চাইতে অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে লাগল।

সেই দুপুরবেলায় শুরু করে একটানা কাজ চালিয়ে যেত। রাত্রেও বিরাম নেই। ক্যাপ্রি থেকে নেপল্‌স-যাত্রী স্টিমারের ভোঁ বাজত ভোর পাঁচটায়, সেই হতো ওর শুতে যাবার সময়। যত দিন যেতে লাগল ততই যেন ওর কাজটা বিস্তৃততর হতে লাগল—রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শতকের মর্মার্থ টুকু ততই যেন ওর মনে সুস্পষ্টতর হয়ে উঠল। ও মনে মনে একটা বিরাট ইতিহাসের পরিকল্পনায় মশগুল—এ কাজ যদি শেষ করতে পারে তাহলে পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ওর আসন অবধারিত। বছরের পর বছর যায়, মেহিউ যেন ক্রমেই মানবসমাজের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক দাবা খেলা অথবা তার্কিকতায় মোহ ছাড়া আর কিছু ওকে ওর নিভৃত গৃহকোণ থেকে টেনে বার করতে পারে না। যুক্তিতর্কের নেশা ওর অপরিমেয়; প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করায় ও যেন একটা অসীম আনন্দ পায়। এ তো নিছক তর্ক নয়—অন্যের বুদ্ধির সংঘর্ষণে নিজের বুদ্ধিকে শান দেওয়া! এখন ওকে দস্তুরমতো সুশিক্ষিত বলা চলে; কেবল ইতিহাস নয়, দর্শন বিজ্ঞান কোনো বিষয়ই ও বাদ দেয় না। তা ছাড়া ও সত্যিই সুতার্কিক; অখণ্ডনীয় ওর যুক্তি, প্রখর ওর বুদ্ধি শাণিত তলোয়ারের মতো—যে জায়গায় ঘা দেয় সে জায়গাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। তাই বলে ও কেবল শুষ্ক যুক্তিবাদী নয়, বহু অধ্যয়ন করেও ওর মনটা নীরস হয়ে পড়েনি। প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারলে মেহিউ খুশি হতো সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে কারো মনে দুঃখ দিতে ওর মন সরত না।

প্রথম যখন ও ক্যাপ্রিদ্বীপে আসে তখন ও ছিল প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ—একমাথা কালো চুল, গালভরা দাড়ি, দিব্যি শক্ত সমর্থ চেহারা। ধীরে ধীরে গায়ের রঙ হয়ে গেল ফ্যাকাশে—মোমের মতো পাণ্ডুর, চেহারা হয়ে গেল কৃশ-দুর্বল। যুক্তির ওপর যার এতখানি বিশ্বাস, নিছক

জড়বাদে যার এতখানি আস্থা—সেই এখন অত্যন্ত অযৌক্তিক ভাবে নিজের শরীরটাকে পীড়ন করে চলল। দেহটা যেন নিছক যন্ত্র বিশেষ—মনের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। শারীরিক অসুস্থতা বা অবসাদ দুটোর কোনোটাই ওর কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারত না। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে ও নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে চলল। নোট টুকে রাখল হাজার হাজার। সেগুলি সাজিয়ে- গুছিয়ে তৈরি করে নিলে। সমস্ত বিষয়টা তখন ওর নখাগ্রে। এতদিন পর ও কাজে হাত দেবার জন্য যেন তৈরি হয়েছে। লিখতে বসল আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। জড়বাদী যেহিউ যে-দেহকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছে আজ সেই দেহ তার চরম প্রতিশোধ নিলে।

বহুদিনের অধীত ও সংগৃহীত বিদ্যা চিরকালের জন্য অগোচর থেকে গেল। গিবন্ ও মমসেন্এর পাশেই ওর নামের স্থান করে নেবার সাধু সংকল্প চিরতরে ব্যর্থ হল। ওকে স্বল্পসংখ্যক বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেই বা মনে রেখেছে। সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের সংখ্যাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বৃহৎ পৃথিবীর কাছে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই যেহিউ চিরকালের জন্য অখ্যাত অজ্ঞাত থেকে গেল।

আমার দৃষ্টিতে কিন্তু ওর জীবনটা সার্থক হয়েছে, চরিতার্থ হয়েছে। ওর জীবনের ধাঁচটাতে আমি একটা সুগোল পরিপূর্ণতার আভাস দেখি। যা ওর কাম্য ছিল ও ঠিক সেই ধরনের কাজই করেছে, লক্ষ্যবস্তু যখন একেবারে হাতের কাছে ঠিক সেই সময়টাতেই মারা গেছে। লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবার যে দুঃসহ দুঃখ—তা আর ওকে সহ্য করতে হয়নি।

—ক্ষিতীশ রায়



সবজান্তা

পরিচয় হবার আগেই ম্যাক্স কেলাডাকে অপছন্দ করবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলোতে যাত্রীর ভীড় অত্যন্ত বেশি। জায়গা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ; এজেন্টরা যা অনুগ্রহ করে দেয় তাই নিয়ে খুশি থাকা ছাড়া উপায় নেই। একলা একটা কেবিন পাওয়ার আশা করাই যায় না। দুটো বার্থের একটা কেবিন পেয়েই আমি কৃতার্থ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীর নাম শুনেই আমার মন দমে গেল। নামটা শুনেই কেমন মনে হয়, কেবিনের জানলা খোলা যাবে না, রাতের হাওয়া চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ হবে। সানফ্রান্সিস্কো থেকে ইয়োকোহামা যাচ্ছিলাম। পুরো চোদ্দটা দিন কারুর সঙ্গে এক কেবিনে কাটাতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছিল। তবে আমার সঙ্গীর নাম স্মিথ বা ব্রাউন হলে হয়তো এতটা বিচলিত হতাম না।

জাহাজে উঠে দেখলাম মিস্টার কেলাডার মালপত্র আগেই এসে পৌঁছেচে। সেগুলোর চেহারা কেমন ভালো লাগল না ; স্যুটকেশগুলোর গায় বড় বেশি লেবেল, পোশাক পরিচ্ছদের ট্রাঙ্কটা যেন বেশি রকম বড়। প্রসাধনের জিনিসপত্র তিনি ইতিমধ্যে বার করে ফেলেছেন দেখলাম ; লক্ষ্য করলাম যে মঁসিয়ে কোটির তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক। হাত মুখ ধোবার জায়গায় তাঁর গন্ধদ্রব্য, চুল ধোবার লোশন, তাঁর চুলে মাখবার ব্রিলিয়্যানটাইন—সবই দেখলাম। মিস্টার কেলাডার বুরুশগুলো আবলুশ কাঠের, তাতে সোনার জলে তাঁর নাম লেখা কিন্তু সেগুলো আর একটু

পরিষ্কার হলে ভালো হতো। না, মিস্টার কেলাডাকে আমার মোটেই পছন্দ হল না। আমি 'স্মোকিংরুমে' গিয়ে এক প্যাকেট তাশ চেয়ে আনিয়ে পেশেন্স খেলতে বসলাম। সবে খেলতে শুরু করেছি এমন সময় এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে জিগগেস করলেন, আমার নাম অমুক ভাবা তাঁর ভুল হয়েছে কিনা।

"আমি মিস্টার কেলাডা," বলে ঝকঝকে একপাটি দাঁত বার করে হেসে তিনি বসে পড়লেন।

বললাম, "ও হ্যাঁ, আমাদের দুজনের তো একই কেবিন।"

"বরাত ভালো বলতে হবে। কার সঙ্গে যে থাকতে হবে, আগে থাকতে কিছুই জানবার উপায় নেই। আপনি ইংরেজ শুনে আমি ভারি খুশি হয়েছিলাম। বাইরে কোথাও যাবার সময় আমাদের ইংরেজদের পরস্পর জোট বেঁধে থাকা উচিত আমি মনে করি। যা বলছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।"

আমি একটু মিট মিট করে তাকালাম।

"আপনি কি ইংরেজ?" আমি একটু বেফাঁস ভাবে জিগগেস করে ফেললাম।

"অবশ্য। আমাকে মার্কিন বলে নিশ্চয় মনে হয় না, হয় কি? একেবারে খাঁটি ভেজালহীন ইংরেজ।"

কথাটা প্রমাণ করবার জন্যেই মিস্টার কেলাডা পকেট থেকে পাসপোর্টটা বার করে আমার নাকের ওপর একবার নেড়ে দেখালেন।

আমাদের রাজার প্রজাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। মিস্টার কেলাডা মাথায় খাটো গাঁট্টা গোট্টা চেহারার মানুষ। রং ময়লা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার ভাবে কামান। নাকটা মোটা ও বাঁকা, চোখ দুটো বড়, উজ্জ্বল ও ভাসা ভাসা। মাথার কালো লম্বা চুল চকচকে ও কোঁকড়ান। যে-ভাবে তিনি অনায়াসে অজস্র কথা বলে যান তার মধ্যে ইংরাজত্বের কোনো পরিচয়

নেই। তাঁর হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতেও উচ্ছাস একটু বেশি। আমার স্থির বিশ্বাস যে, তাঁর বৃটিশ পাসপোর্ট একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে ধরা পড়ত যে, ইংলণ্ডের চেয়ে আকাশ যেখানে আর একটু বেশি নীল এমন কোনো জায়গায় মিস্টার কেলাডার জন্ম।

"কি নেবেন বলুন?" তিনি আমায় জিগগেস করলেন।

আমি সন্দিগ্ধ ভাবে তাঁর দিকে তাকালাম। মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে নিষেধ আজ্ঞা এখনো বাহাল আছে। ওপর থেকে দেখলে জাহাজটাও মরুর মতো শুষ্ক মনে হয়। তেষ্টা যখন আমার থাকে না, তখন জিঞ্জার-এল না লেমন স্কোয়াস, কোনটা আমার বেশি খারাপ লাগে আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু মিস্টার কেলাডা আমার দিকে চেয়ে গভীর ইঙ্গিতের সঙ্গে একটু হাসলেন।

"হুইস্কি আর সোডা বা ড্রাই মার্টিনি—মুখ থেকে শুধু আপনার কথাটা খসাবার অপেক্ষা।"

দুধারের দু'পকেট থেকে দুটি বোতল বার করে তিনি আমার সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। আমি মার্টিনিটাই পছন্দ করলাম। তিনি স্টুয়ার্ডকে ডেকে দুটো গ্লাশ আর এক পাত্র বরফ চেয়ে পাঠালেন।

বললাম, "বেশ ভালো ককটেল।"

"ভাণ্ডার অফুরন্ত জানবেন। জাহাজে যদি বন্ধুবান্ধব আপনার কেউ থাকেন তাঁদের বলবেন যে এমন একটি দোস্ত আপনার আছে, দুনিয়ার সব মদ যার দখলে।"

মিস্টার কেলাডা আড্ডাবাজ লোক। নিউইয়র্ক আর সানফ্রানসিসকোর গল্প করলেন। নাটক, ছবি, রাজনীতি কোনো কিছুই বাদ দিলেন না তাঁর দেশভক্তিরও পরিচয় পাওয়া গেল। রঙিন বস্ত্র হিসেবে ইউনিয়নজ্যাক বেশ জমকাল, কিন্তু বেরুট বা অ্যালেকজেন্দ্রিয়ার কোনো ভদ্রলোক যখন তা নিয়ে আস্ফালন করেন তখন তার মর্যাদা কিছু ক্ষুণ্ণ হয় এ-কথা

মনে না করে পারি না। মিস্টার কেলাডা খুব গায়ে-পড়া ভাবে মিশুক। কোনো অহমিকা থেকে বলছি না, কিন্তু কোনো অপরিচিত ভদ্রলোক মিস্টার না বলে আমায় সম্বোধন করবে এটা ভদ্রতা বলে মনে করতে পারলাম না। মিস্টার কেলাডা হয়তো আমাকে সহজ বোধ করতে দেওয়ার জন্যেই এসব লৌকিকতার তোয়াক্কা রাখলেন না। মিস্টার কেলাডাকে আমার ভালো লাগেনি। তিনি এসে বসবার পর আমি তাশগুলো সরিয়ে রেখেছিলাম। প্রথমবারের পক্ষে যথেষ্ট আলাপ আমাদের হয়েছে মনে করে এবার তাশগুলো নিয়ে আবার খেলা শুরু করলাম।

"তিনটা চারের ওপর দিন," মিস্টার কেলাডা বললেন।

পেশেন্স খেলবার সময় কারুর এ-রকম মাতব্বরি একদম অসহ্য।

"আসছে আসছে," মিস্টার কেলাডা চেঁচিয়ে উঠলেন, "দশটা গোলামের ওপর।"

অত্যন্ত গরম মেজাজ নিয়ে খেলা শেষ করলাম। তাশ জোড়াটা তৎক্ষণাৎ তিনি হস্তগত করলেন; "তাশের বাজি ভালোবাসেন?"

উত্তরে বললাম, "না, মোটেই না।"

"আচ্ছা শুধু এই একটা বাজি আপনাকে দেখাচ্ছি।"

পর পর তিনটে বাজি তিনি আমায় দেখালেন। তারপর আমি বললাম খাবার ঘরে গিয়ে এখন আমায় টেবিলে একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।

"সে ঠিক আছে। আপনার জায়গার ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি। ভাবলাম এক কেবিনে যখন আমরা আছি, তখন এক টেবিলেই বা বসব না কেন।"

মিস্টার কেলাডাকে আমার একদম ভালো লাগল না।

শুধু যে তাঁর সঙ্গে এক কেবিনে থাকি ও তিন বেলা এক টেবিলে খানা

থাই, তা নয়, ডেকে বেড়াবার সময়ও তাঁর সঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। তাঁকে লজ্জা দেওয়া অসম্ভব। তিনি যে অবাঞ্ছিত এ-কথা তাঁর মনেই হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাকে দেখে তিনি যতটা খুশি তাঁকে দেখে আমিও ঠিক তাই। নিজের বাড়িতে থাকলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও এ-সন্দেহ তাঁর কখনো হতো না যে অতিথি হিসেবে তাঁকে পাবার জন্যে কেউ লালায়িত নয়। লোকের সঙ্গে তিনি বেশ মিশতে পারেন। তিন দিনেই জাহাজের সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল। সব কিছুতেই তিনি আছেন। লটারির ব্যবস্থা করেন, নিলাম ডাকেন, খেলাধুলোয় পুরস্কার দেবার জন্যে টাকা সংগ্রহ করেন, কয়েট ও গল্‌ফ্‌ খেলার আয়োজন করেন, কনসার্ট ও নাচের আসর সাজিয়ে তোলেন। সব সময় সব জায়গাতেই তিনি আছেন। জাহাজে তাঁর চেয়ে অপ্রিয় লোক অন্তত আর কেউ নেই। আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'সবজান্তা'। তাঁর মুখের ওপরই ওই নাম ধরে ডাকতাম, তিনি সেটা প্রশংসা বলে মনে করতেন। সবচেয়ে তাঁকে অসহ্য লাগত খাবার সময়। প্রায় একটি ঘণ্টা তখন তাঁর কবলে আমাদের থাকতে হতো! তিনি উৎসাহী, ফুর্তিবাজ ও তার্কিক। সকলের চেয়ে সব কিছুই তিনি ঢের ভালো জানেন। তাঁর কথায় সায় না দিলে তাঁর অহমিকা ক্ষুণ্ণ হয়। যত তুচ্ছই হোক, তাঁর মত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক তিনি ছাড়েন না। তাঁর নিজের যে ভুল হতে পারে এ সম্ভাবনাই তাঁর মনে উদয় হয় না। তিনি হলেন সবজান্তা।

ডাক্তারের সঙ্গে এক টেবিলেই আমরা বসি। শুধু আমি আর ডাক্তার থাকলে মিস্টার কেলাডা যা খুশি করতে পারতেন, কারণ ডাক্তার নেহাত আলসে প্রকৃতির লোক, আর আমি নির্বিকার ও উদাসীন। কিন্তু আমাদের টেবিলে র‍্যামসে নামে আর এক যে ভদ্রলোক বসতেন, তিনি মিস্টার

কেলাডার মতোই জেদী ও তার্কিক। মিস্টার কেলাডার সবজান্তা ভাব তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁদের বচসা তাই যেমন তিক্ত তেমনি দীর্ঘ হতো।

র‍্যামসে মার্কিন কনস্যুলার সার্ভিসের লোক। কাজ করেন কোবেতে। আমেরিকার মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। বিরাট ভারি চেহারা, গায়ে প্রচুর মেদ, কিন্তু চামড়া ঢিলে নয়। বাজারের কেনা পোশাক তাঁর গায়ে ভালো করে আঁটে না। নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসতে। এখন সস্ত্রীক কোবে ফিরে যাচ্ছেন। স্ত্রী এক বছর দেশে কাটিয়ে এলেন। মিসেস র‍্যামসে দেখতে ছোটখাট সুশ্রী। স্বভাবটি মিষ্টি, সুরসিকাও বটে। কন্‌সলগিরির চাকরিতে মাইনে বড় কম দেয়। মিসেস র‍্যামসের পোশাক পরিচ্ছদে কোনো আড়ম্বর নেই, কিন্তু পোশাক পরবার কায়দাটি তিনি জানেন। একটি বিশেষত্ব তাঁর আছে কিন্তু সেটা উগ্র নয়। তাঁর প্রতি তেমন মনোযোগ হয়তো আমি দিতাম না, কিন্তু এমন একটি গুণ তাঁর ছিল যা মেয়েদের মধ্যে সম্ভবত সাধারণ হলেও আজকাল তাঁদের ব্যবহারে বড় একটা প্রকাশ পায় না। মিসেস র‍্যামসের দিকে চাইলে তাঁর লজ্জাশীলতাটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। কোটের উপর ফুলের মতো এই বস্তুটি তাঁর মুখে শোভা পাচ্ছে।

একদিন ডিনারের সময় ঘটনাক্রমে মুক্তোর ব্যাপার নিয়ে কথা উঠল। চতুর জাপানীরা ঝিনুকের সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে যে সব মুক্তো তৈরি করছে, খবরের কাগজে কিছুদিন ধরে তার সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তার তাই মন্তব্য করলেন যে আসল মুক্তোর দাম তাতে কমে যেতে বাধ্য। সে-সব নকল মুক্তো এখনই বেশ ভালো ভাবে তৈরি হচ্ছে, কিছুদিন বাদে সেগুলো নিখুঁত হয়ে উঠবে। অভ্যাস মতো মিস্টার কেলাডা এই আলোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুক্তো সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে সবই তিনি আমাদের

জানালেন। র‍্যামসে এ-ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু লেভান্টবাসী সবজান্তা ভদ্রলোককে এই সূত্রে একটু খোঁচা দেবার লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে উঠল। মিস্টার কেলাডাকে জোর দিয়ে অজস্র ভাবে কথা বলতে আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু জোর দিয়ে এত কথা তিনি আগে কখনো বলেননি। অবশেষে র‍্যামসের কোনো কথায় চটে গিয়ে টেবিল চাপড়ে তিনি চীৎকার করে বললেন, "আনাড়ির মতো আমি কথা বলছি মনে করবেন না। এই জাপানী মুক্তোর ব্যবসার খবর নেবার জন্যেই আমি জাপানে যাচ্ছি। আমি নিজে এই ব্যবসাই করি। এ-ব্যবসায় যারা আছে তাদের যে কাউকে জিগগেস করলে জানতে পারবেন যে মুক্তো সম্বন্ধে আমার ওপর কথা বলবার কেউ নেই। পৃথিবীর সেরা যত মুক্তো সব আমার জানা। মুক্তো সম্বন্ধে আমি যা জানিনা, তা জানবার যোগ্যই নয়।"

এ একটা খবর বটে। এত বাক্যবাগীশ হলেও মিস্টার কেলাডার পেশা যে কি, তা তিনি এ পর্যন্ত আমাদের বলেননি। আমরা শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে জানতাম যে কোনো একটা ব্যবসার কাজে তিনি জাপান যাচ্ছেন।

সগর্বে টেবিলের সকলের দিকে চেয়ে এবার তিনি বললেন, "যত সরেস নকল মুক্তোই তারা তৈরি করুক না কেন, আমার মতো জহুরী, চোখ অর্ধেক বন্ধ করে তা ধরে ফেলবে।" মিসেস র‍্যামসের গলার মুক্তোর মালাটা দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, "আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি মিসেস র‍্যামসে, আপনার গলার এই মুক্তোর মালাটির দাম কোনো কালে এক কড়াও কমবে না।"

মিসেস র‍্যামসে সলজ্জ ভাবে একটু লাল হয়ে উঠে মালাটি পোশাকের তলায় লুকিয়ে ফেললেন। র‍্যামসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমাদের

সকলকে চোখের একটা ইঙ্গিত করলেন। তাঁর মুখে একটু বাঁকা হাসি।
"মিসেস র‍্যামসের গলার মালাটি বড় ভালো, না?"
"আমি আগেই সেটা লক্ষ্য করেছি," মিস্টার কেলাডা বললেন, "মনে মনে বলেছি এ মুক্তোগুলো খাঁটি।"
"আমি নিজে অবশ্য মালাটা কিনিনি। তবু এটার দাম আপনি কত মনে করেন, জানতে পারলে খুশি হব।"
"ব্যবসাদারী মহলে ওটির দাম হাজার পোনেরো ডলারের কাছাকাছি হবে। তবে ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউএ যদি কেনা হয়ে থাকে, তাহলে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত ওর দাম নিয়েছে শুনলে আমি অবাক হব না।"
র‍্যামসের মুখের হাসি কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, "আপনি শুনে অবাক হবেন যে নিউইয়র্ক ছাড়বার আগের দিন মিসেস র‍্যামসে মুক্তোর মালাটি একটা সাধারণ দোকান থেকে মাত্র আঠারো ডলারে কিনেছেন।"
মিস্টার কেলাডার মুখ লাল হয়ে উঠল, বললেন, "স্রেফ বাজে কথা। মুক্তোগুলো শুধু আসল নয় ওই মাপের এত সরেস একটি মুক্তোর মালা সহজে চোখেই পড়ে না।"
"কিছু বাজি রাখবেন? আমি একশ ডলার বাজি রেখে বলছি মুক্তোগুলো নকল।"
"রইল বাজি।"
মিসেস র‍্যামসে বললেন, "না এলমার, যা একেবারে জানা কথা, তা নিয়ে তোমার বাজি রাখা উচিত নয়।" —তাঁর মুখে হাসির আভাস, তাঁর গলার স্বরে শান্ত প্রতিবাদ।
"কেন, উচিত নয়, কেন? অনায়াসে কিছু টাকা জেতবার এমন সুযোগ পেয়েও যদি ছেড়ে দিই, তাহলে তো আমি নেহাৎ আহাম্মুক!"
মিসেস র‍্যামসে বললেন, "কিন্তু ঠিক যে কি তা প্রমাণ হবে কি করে! একদিকে আমার কথা, আর একদিকে মিস্টার কেলাডার!"

"মালাটা আমায় দেখতে দিন। নকল যদি হয়, এক্ষুনি আমি বলে দেব। একশ ডলার বাজি হারবার ক্ষমতা আমার আছে।" বললেন মিস্টার কেলাডা।

"মালা খুলে ফেল লক্ষ্মীটি," র‍্যামসে বললেন, "ভদ্রলোক যত খুশি দেখুন।"

মিসেস র‍্যামসে একটু ইতস্ততঃ করে মালাটা খোলবার জন্যে হাত তুললেন। তারপর বললেন, "আমি খুলতে পারছি না। অগত্যা মিস্টার কেলাডাকে আমার কথাই বিশ্বাস করতে হবে।"

হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, একটা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার এক্ষুনি ঘটবে ; তবু বলবার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না।

র‍্যামসে লাফিয়ে উঠে বললেন, "আমি খুলে দিচ্ছি।"

মালাটা তিনি মিস্টার কেলাডার হাতে দিলেন। মিস্টার কেলাডা পকেট থেকে একটা আতস-কাঁচ বার করে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সেটা খানিক পরীক্ষা করলেন। বিজয়-গর্বের একটা হাসি তাঁর মসৃণ মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মালাটা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মিসেস র‍্যামসের মুখ তাঁর চোখে পড়ল। সে মুখ কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে, যেন এখুনি তিনি মূর্চ্ছা যাবেন। ভীত বিস্ফারিত চোখে কেলাডার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তিনি যেন কি সকাতর আবেদন জানাচ্ছেন। তার অর্থ এত স্পষ্ট যে তাঁর স্বামীর লক্ষ্যে কেন যে তা পড়ছে না আমি ভেবে পেলাম না।

মুখ খুলেও মিস্টার কেলাডা চুপ করে গেলেন। তাঁর সমস্ত মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। নিজেকে সামলাতে কতখানি চেষ্টা যে তাঁকে করতে হচ্ছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

অবশেষে তিনি বললেন, "আমারই ভুল হয়েছে। নকল হিসেবে খুব নিখুঁত বটে কিন্তু আতস-কাঁচ দিয়ে দেখবামাত্রই এগুলো যে আসল

নয় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। এরকম খেলো জিনিসের দাম আঠার ডলারের বেশি হতে পারে না বলেই মনে করি।"

পকেট-বুক বার করে তা থেকে একটি একশো ডলারের নোট বার করে তিনি নীরবে র‍্যামসেকে দিলেন।

র‍্যামসে সেটা হাতে নিয়ে বললেন, "আশা করি এতে আপনার কিছু শিক্ষা হবে। সবজান্তার মতো সব কিছু নিয়ে কথা বলতে আর যাবেন না।"

লক্ষ্য করলাম মিস্টার কেলাডার হাত কাঁপছে।

গল্পটা যথারীতি সমস্ত জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। তাই নিয়ে মিস্টার কেলাডাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বড় কম সইতে হল না। সবজান্তা জব্দ হয়েছে এ সকলের কাছেই বড় মজার কথা। শুধু মিসেস র‍্যামসে মাথা ধরার দরুন নিজের কেবিনেই বন্ধ হয়ে রইলেন।

পরের দিন সকালে বিছানা থেকে উঠে আমি দাড়ি কামাচ্ছিলাম, মিস্টার কেলাডা তাঁর বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। হঠাৎ খসখস একটা আওয়াজ শুনে দেখলাম কে একটা চিঠি ভিতরে গলিয়ে দিলে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে চারদিকে তাকালাম। কোথাও কেউ নেই। চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখলাম বড় বড় ছাপার মতো হরফে মিস্টার কেলাডার নাম লেখা। চিঠিটা তাঁকেই দিলাম।

"কে চিঠি দিয়েছে?" বলে খামটা খুলেই তিনি বললেন, "ও!"

খামের ভেতর থেকে কোনো চিঠি নয়, একটা একশো ডলারের নোট তিনি বার করলেন। আমার দিকে চেয়ে তাঁর মুখ আবার রাঙা হয়ে উঠল। খামটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "অনুগ্রহ করে এগুলো যদি জানালা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেন।"

কথা মতো কাজ করে তাঁর দিকে ফিরে আমি একটু হাসলাম। তিনি বললেন, "একেবারে খাজা আহাম্মুখ বনতে কেউই চায় না।"

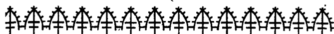
"ওগুলো তাহলে আসল মুক্তো ?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, "আমার যদি অমন সুশ্রী চমৎকার একটি স্ত্রী থাকে তাহলে নিজে কোবেতে থাকবার সময় এক বছর তাকে নিউইয়র্কে কাটাতে আমি দিই না।"

মিস্টার কেলাডাকে তখন আমার খুব খারাপ আর লাগছিল না। পকেট-বুকটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সযত্নে একশ ডলারের নোটটা তিনি তার ভেতরে রেখে দিলেন।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র





চিঠি

বাইরে প্রচণ্ড গরম, সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। জাহাজঘাটার পাশ দিয়ে যে বড় রাস্তাটা চলে গিয়েছে সেখানে গাড়ি ঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। মোটর, লরি, বাস, ট্যাক্সির অবিরাম স্রোত চলেছে। মোটরের হর্নের শব্দে চারদিক মুখরিত। রিক্সওয়ালারা এরই মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর গলদঘর্ম কুলির দল মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে—খবরদার খবরদার, হঠ্ যাইয়ে—হাঁক ছেড়ে রাস্তার লোকদের চকিত করে দিয়ে ছুটে চলে। এরই মধ্যে আবার ফিরিওয়ালারা তারস্বরে নিজ নিজ সামগ্রী হেঁকে বেড়াচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বিচিত্র এক নগরী—দুনিয়ার সব জাতের সঙ্গমস্থল। যত রাজ্যের মানুষ—হরেক জাতের, হরেক বর্ণের—এখানটায় এসে জুটেছে। কালো মিশমিশে তামিল থেকে শুরু করে পীতবর্ণের চীনা, বেগুনি রঙের মালয়বাসী, আর্মানি, ইহুদি, বাঙালী—সব এই ভিড়ের মধ্যে গিজগিজ করছে—যার যার ভাষায় জাত-ভাইদের সঙ্গে হাঁক ছেড়ে কথা বলছে।

বাইরে তো এই গরম আর হট্টগোল কিন্তু মেসার্স রিপ্‌লি জয়েস এণ্ড নেলার-এর আপিসের ভেতরটি চমৎকার ঠাণ্ডা। বাইরের চোখ-ধাঁধানো রোদের ঝাঁঝ থেকে এসে ঢুকলে ভেতরটা রীতিমতো অন্ধকার ঠেকে, তমনি আবার নিস্তব্ধ, বাইরের কলরব ভেতরে এসে পৌঁছয় না। মিস্টার জয়েস তাঁর খাস-কামরায় বসে আছেন, মাথার ওপরে পাখাটি পুরো দমে ঘুরছে। চেয়ারের হাতলে হাত দুটি রেখে চেয়ারের পিঠে ঠেসান দিয়ে

বসেছেন। সুমুখের শেলফে ল' রিপোর্টের মোটা মোটা ভল্যুম সার করে সাজানো, তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটি তাকের ওপরে কয়েকটা কালো রঙ-করা চৌকো টিনের বাক্স তাতে বিভিন্ন মক্কেলদের নথিপত্র আলাদা করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বাক্সের গায়ে মক্কেলের নাম-লেখা লেবেল আঁটা রয়েছে।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হল। মিস্টার জয়েস বললেন, এস।

দরজা খুলে একটি চীনা কেরানী ঘরে ঢুকল। শাদা ট্রাউজার পরা, খুব ফিটফাট পরিচ্ছন্ন পোশাক। বলল, মিস্টার ক্রসবি এসেছেন।

চীনা কেরানীটি চমৎকার ইংরিজি বলে, দিব্যি স্পষ্ট উচ্চারণ। ইংরিজি ভাষার ওপরে ওর দখল দেখে মিস্টার জয়েস মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান। অঙ-চি-সেঙ ক্যান্টনের অধিবাসী, গ্রেজ ইন্ থেকে আইন অধ্যয়ন শেষ করে এসেছে। এখন কিছুদিন রিপ্লি জয়েস এণ্ড নেলার-এর ফার্মে শিক্ষানবিসি করছে, পরে নিজেই ব্যবসা শুরু করবে। লোকটি যেমন পরিশ্রমী তেমনি অমায়িক চমৎকার স্বভাব।

মিস্টার জয়েস বললেন, ওঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

দাঁড়িয়ে উঠে করমর্দন করে আগন্তুককে বসালেন। মিস্টার জয়েস স্বভাবতই স্বল্পভাষী। মিনিটখানেক নিঃশব্দে রবার্ট ক্রসবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্রসবি বিরাটকায় ব্যক্তি, লম্বায় ছ'ফুটেরও বেশি, চওড়াতেও কম যায় না, পেশিবহুল বিশাল মূর্তি। ইনি রবারের বাগানের মালিক। সারাদিন হেঁটে বেড়িয়ে বাগানের কাজ তদারক করতে হয়, তার ওপরে আবার রোজ সন্ধ্যায় টেনিস খেলার অভ্যাস আছে, তাতেই শরীরটি দিব্যি মজবুত রয়েছে। রোদে-পোড়া চেহারা, রোমশ দুই বাহু, আর পায়ে ইয়া মোটা প্রকাণ্ড বুট—মিস্টার জয়েস ভাবছিলেন এঁর হাতের একটি ঘুঁষি খেলে আর কথা নেই—রোগা টিংটিংএ তামিল মজুরের সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ হবে। কিন্তু লোকটির

[মু]খে চোখে কোথাও হিংস্রতার আভাস নেই, চোখের দৃষ্টি সরল, শান্ত। [মু]খে বেশ একটি ভালোমানষির ছাপ, দেখলেই মনে হয় ভেতরে কানো ঘোর-প্যাঁচ নেই। সম্প্রতি কিন্তু ওকে খুব চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে, [মু]খ শুকনো, মুখের প্রতি রেখায় দুর্ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

মিস্টার জয়েস বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে গত দু-এক রাত্তির তোমার ভালো ঘুম হয়নি।

তা হয়নি বটে।

মিস্টার জয়েস আরেকবার ওকে বেশ একটু নজর করে দেখলেন—খাকি হাফপ্যান্ট পরনে, লোমে ঢাকা উরু দুটি দেখা যাচ্ছে। গলা খোলা টেনিস শার্ট গায়ে—গলায় টাই নেই। খাকি রঙের জামাটি রীতিমতো ময়লা, হাতা গুটিয়ে রেখেছে। দেখলে মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে বাগানে ঘোরাফেরা করে সোজা এখানে চলে এসেছে।

মিস্টার জয়েস বললেন, তুমি মিছিমিছি অত ভাবছ কেন বলত? মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

কই ভাবছি না তো।

তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে?

না, বিকেলে দেখা হবার কথা। আচ্ছা, তুমিই বল না ওরা ওঁকে অ্যারেস্ট করলে কোন কথায়!

মিস্টার জয়েস তাঁর স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বললেন, সে ওদের না করে উপায় ছিল না।

বেশ না হয় তাই হল, কিন্তু জামিনে তো খালাস দিতে পারত।

ওর বিরুদ্ধে অভিযোগটা খুব গুরুতর কিনা।

যাই বল, এর কোনো মানে হয় না। লেস্‌লির অবস্থায় পড়লে যে কোনো ভদ্র রমণী ঠিক এই কাজই করত, তবে কিনা বেশির ভাগ মেয়েরই বাধকরি অতখানি সাহস হতো না। ওর মতো মেয়ে সংসারে ক'টি

আছে শুনি? জীবনে যে একটা পোকামাকড়কেও ব্যথা দেয়নি সে কিনা—। আরে ভাই, বেশি আর কি বলব—বারো বচ্ছর হল ওকে বিয়ে করেছি, ওকে আমি জানি না বলতে চাও? পেতাম ঐ লোকটাকে একবার হাতের কাছে, বাছাধনের ঘাড়টি এমনি করে মটুকে দিতাম। অমন লোককে হত্যা করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করতাম না। তুমিও করতে না।

সবাই তো ভাই, তোমার পক্ষেই। হ্যামণ্ডের হয়ে তো কেউ একটা কথাও বলছে না। আর উনি খালাস পাবেনই, এ তো জানা কথা। জজ সাহেব বল, জুরিরা বল—সবাই ওঁকে আগে থেকেই নির্দোষ সাব্যস্ত করে রেখেছেন।

ক্রসবি কিছুমাত্র শান্ত না হয়ে বলল, যাই বল বাপু, এ-সব বড় হাস্যকর ব্যাপার। ওঁকে অ্যারেস্ট করার কোনো মানেই হয় না। বেচারীর ওপর দিয়ে এমনিতেই যা ঝড় গিয়েছে তার ওপরে আবার এই বিচারের অত্যাচার। আমি তো বলব এটা অমানুষিক ব্যবহার। সিঙ্গাপুরে এসে অবধি আমি তো অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বলছে লেস্‌লি ঠিকই করেছে। এদিকে হপ্তার পর হপ্ত যাচ্ছে আর বেচারী হাজতে পচে মরছে।

কি করবে বল, আইনের ব্যাপার তো। আইন কারো ধার ধারে না বিশেষ করে, উনি যখন নিজ মুখে বলছেন লোকটাকে খুন করেছেন অবশ্যি আমি তোমাদের দুজনের জন্যই অত্যন্ত দুঃখিত।

ক্রসবি অসহিষ্ণু হয়ে বলল, আমার কথা না ভাবলেও চলবে।

কিন্তু একটি কথা তো ভাবতে হবে—একটা খুন যখন হয়েছে, সভ সমাজ মাত্রেই তার একটা বিহিত চাই, বিচার-আচার হতে বাধ্য। একটা ক্রিমিকীটকে বধ করা কি খুন হল? ক্ষ্যাপা কুকুরকে লোকে যেমন গুলি করে মারে ওকেও তেমনি লেস্‌লি গুলি করে মেরেছে।

মিস্টার জয়েস আবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, দেখ তোমার পরামর্শদাতা হিসেবে একটি কথা না বলে পারছিনে। আমার মনে একটা খটকা আছে। তোমার স্ত্রী যদি হ্যামণ্ডকে শুধু একবার গুলি করতেন তবে ব্যাপারটা আর একটু সহজ হতো। দুঃখের বিষয় দেখা যাচ্ছে উনি পরপর ছ'বার গুলি করেছেন।

ও যা বলছে তাতে তো ওটা খুব স্বভাবিক বলেই মনে হয়। ও-অবস্থায় সবাই তাই করত।

মিস্টার জয়েস বললেন, হ্যাঁ, ওঁর কথায় খানিকটা যুক্তি আছে বটে। তবু সব দিক ভেবে রাখাই ভালো। অপর পক্ষ কি কি প্রশ্ন তুলতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তো বলতে পারি আমি যদি সরকার পক্ষের হয়ে মামলা চালাতাম তবে ঐ কথার ওপরেই সব চেয়ে বেশি জোর দিতাম।

দূর দূর, রেখে দাও ওসব বাজে কথা।

মিস্টার জয়েস একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্রস্‌বির দিকে তাকালেন। মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। ক্রস্‌বি লোকটা শাদাসিদে ভালো মানুষ গোছের, ঠিক বুদ্ধিমান বলা চলে না।

বলছিনে যে ওটা আইনের মস্ত বড় একটা প্যাঁচ। তবে কিনা কথাটা একবার ভেবে দেখবার মতো। যাক্‌গে আর তো বেশি দেরি নেই। ফ্যাসাদ চুকেবুকে গেলে এক কাজ করো—স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিন কোথাও ঘুরে এসো। সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। অবশ্যি উনি খালাস পেয়ে যাবেন, এতো একরকম জানা কথাই। তবুও এ-ব্যাপারে শরীর মনের ওপরে যা ঝক্কি যাচ্ছে তাতে তোমাদের দুজনেরই কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।

এতক্ষণে ক্রস্‌বির মুখে একটু হাসি দেখা দিল। হাসির আভায় ওর মুখের

চেহারা একেবারে বদলে গেল। ওকে এখন আর মোটেই কদাকার মনে হয় না, হাসির আলোয় ওর স্বচ্ছ সরল মনটিই শুধু চোখে পড়ে।

লেস্‌লির চাইতে আমারই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে বেশি। ও তো একটুও ভড়কায়নি। যা ঝক্কিটা ওকে পোয়াতে হল ভাবলে অবাক হতে হয়। অমন সাহসী মেয়ে ক'টি দেখা যায় বল তো ?

সত্যি ওঁর ধৈর্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ওঁর মধ্যে অতখানি মনের জোর আছে নিজে না দেখলে আমি ভাবতেই পারতুম না।

উকিল হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তাঁকে মিসেস ক্রস্‌বির সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে হয়েছে। যদিচ জেলে থাকবার পক্ষে যতখানি সম্ভব ভালো ব্যবস্থাই করা হয়েছে, তবু জেলখানা তো—তার ওপরে আবার খুনের দায়। এ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে একেবারে ভেঙে পড়া কিছুই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এমন বিপাকে পড়েও মেয়েটি কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। বিস্তর পড়াশুনা করছে, শরীর সুস্থ রাখবার জন্য যতটুকু খেলাধুলোর দরকার তাও করছে। এ-ছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে অবসর সময়ে লেস বুনছে। এটি নাকি ঘরেও তার অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। মিস্টার জয়েস যখনই দেখা করতে গিয়েছেন দেখেছেন দিব্যি ফিটফাট ধোপদুরস্ত পোশাক পরে উক্ত রমণী বসে আছেন, পরিপাটি করে চুলটি বাঁধা, এমন কি হাতের নখে রঙ মাখাতে পর্যন্ত ভোলেনি। ভাবে ভঙ্গীতে এতটুকু অস্থিরতা নেই। জেলখানায় এক-আধটু যা অসুবিধা হচ্ছে তা নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও করে। মামলা সম্বন্ধে যখন কথা হয় অত্যন্ত নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে। মিস্টার জয়েস ভাবছিলেন ওর স্বাভাবিক রুচি বোধের গুণেই বোধকরি এত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকেও ও হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে। মনে মনে তিনি অবাক হয়েছেন কারণ লেস্‌লির মধ্যে যে আবার অতখানি হাস্য-রস-বোধ আছে—এ তাঁর জানা ছিল না।

আজ ক'বছর ধরেই ওর সঙ্গে জানাশোনা। লেস্‌লি যখনই সিঙ্গাপুরে এসেছে তখনই একবার না একবার ওদের সঙ্গে খানা খেয়েছে, দু-একবার ওদের বাড়িতে উইক-এণ্ড্ যাপন করে গিয়েছে। জয়েসের স্ত্রীও একবার ওদের বাগানে গিয়ে দিন পনের কাটিয়ে এসেছিলেন, সেই সময়েই জোফ্রে হ্যামণ্ডকে ওখানে দেখেছেন। দুই পরিবারের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছিল। তারই ফলে উক্ত অঘটন ঘটবামাত্র রবার্ট ক্রস্‌বি ছুটে এসেছে সিঙ্গাপুরে আর মিস্টার জয়েসকে ধরে পড়েছে মামলার তদ্বিরের জন্য।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে লেস্‌লি ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছিল সেই থেকে আজ পর্যন্ত একই কথা বলছে। কোথাও একটুকু গরমিল হয় না। এখন যেমন নির্বিকার ভাবে বলে যায়, ঘটনার ঠিক কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই প্রথম দিনেও তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বলে গিয়েছিল, ভাবে ভঙ্গীতে গলার স্বরে লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি, ছোটোখাটো দু-একটা বিষয় বলতে গিয়ে মুখ চোখ একটু লাল হয়ে উঠেছিল এই যা। ও যে-জাতের মেয়ে তাতে ওর জীবনে যে এমন ধারার ব্যাপার ঘটতে পারে এ-কথা কেউ ভাবতেই পারত না। বয়েস সবে তিরিশ পার হয়েছে, নাতিদীর্ঘ একহারা চেহারা। খুব যে সুন্দরী এমন নয়, তবে মুখে বিশেষ একটি শ্রী আছে। হাত পা অত্যন্ত শীর্ণ, ধবধবে শাদা চামড়ার তলায় নীল রঙের বড় বড় শিরা এমন কি হাড় পর্যন্ত দেখা যায়। মুখে স্বাস্থ্যের আভা নেই, ঠোঁট দুটি পাংশুটে, চোখ নিষ্প্রভ। মাথা ভর্তি হালকা বাদামি রঙের চুল তাতে আবার সামান্য একটু ঢেউ-এর আভাস আছে। যত্নকৃত পারিপাট্যে সেটা রীতিমতো মনোহারী হতে পারত কিন্তু মিসেস ক্রস্‌বিকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন নকল সাজের প্রতি তার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। মেয়েটি স্বল্পভাষী, স্বভাবত মধুর স্বভাব, চালচলনে অনাড়ম্বর। মধুর ব্যবহারে মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। একটু

লাজুক স্বভাবের বলে সবার সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারত না। তার কারণটি অবশ্য সহজেই অনুমেয়। রবারের বাগানে সাধারণত নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করতে হয়। তথাপি ঘরে বাইরে আপন পরিচিতদের মধ্যে ওর ব্যবহার ছিল অনবদ্য। মিসেস জয়েস দিন পনেরো ওর সঙ্গে থেকে এসে তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। স্বামীকে বলছিল ওর মধ্যে কত যে গুণ আছে লোকে তা ভাবতেই পারে না। ভালো করে পরিচয় হলে ওর পড়াশুনার বহর দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তাছাড়া হাসি গল্পে ঠাট্টায় ও মানুষকে একেবারে মাতিয়ে রাখতে পারে।

এমন মেয়ে কখনো মানুষ খুন করতে পারে? মিস্টার জয়েস ক্রস্‌বিকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন। ক্রস্‌বি চলে গেলে একলা ঘরে বসে মামলার নথিপত্র নিয়ে আরেকবার চোখ বুলাতে লাগলেন। নিতান্তই যন্ত্রচালিতের মতো পাতা উল্‌টিয়ে যাচ্ছিলেন কারণ মামলার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিবরণ পূর্বাবধি তাঁর নখাগ্রে। মামলাটা চতুর্দিকে ঘোরতর এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ক্লাবে-ক্লাবে এ-ছাড়া আর কথা নেই, খানার টেবিলে এই আলোচনা। সিঙ্গাপুর থেকে পেনাঙ অবধি রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত রীতিমত আলোড়িত।

মিসেস ক্রস্‌বি ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে কোথাও কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। স্বামী গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে কার্যোপলক্ষে. বাড়িতে উনি একা। একলা মানুষ, রাত্তিরের খাওয়া সেরে ন'টা আন্দাজ বসবার ঘরে এসে বসেছেন সেলাই হাতে করে। বাড়ির ভেতরে তখন দ্বিতীয় প্রাণী নেই, চাকর-বাকরেরা কাজকর্ম সেরে উঠোনের পেছনের দিকে ওদের ঘরে চলে গেছে। হঠাৎ বাগানের খোয়া ছড়ানো রাস্তায় কার পায়ের শব্দ শুনে উনি চমকে উঠলেন। বুটের আওয়াজ—আগন্তুকটি নিশ্চয় কোনো শ্বেতাঙ্গ হবেন, নেটিভ আদমি নয়।

কিন্তু গেটএ কোনো মোটর এসে থামবার শব্দ তো শুনতে পাননি ? এত রাত্তিরে কে আসবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠছে। বারান্দা অতিক্রম করে লোকটি এসে বসবার ঘরের দরজায় দাঁড়াল। প্রথমটায় লোকটিকে চিনতেই পারেননি। একটি ঢাকনা-দেওয়া ল্যাম্পের আলোতে উনি বসেছিলেন। অন্ধকারে লোকটিকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না।.

আসতে পারি ? গলার আওয়াজ শুনেও লোকটাকে চিনতে পারছিলেন না।

কে ? চশমা পরে সেলাইএর কাজ করছিলেন, চশমা খুলে অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেললেন। উত্তর এল, আমি জোফ্রে হ্যামণ্ড।

ওঃ আসুন আসুন। দাঁড়িয়ে উঠে অতিথির সঙ্গে করমর্দন করলেন। বসুন, কিছু একটু পান করুন। মনে মনে খুব অবাক হয়েছে। ভদ্রলোক যদিচ তাদের প্রতিবেশী তথাপি ক্রসবিদের সঙ্গে তার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লেসলির সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। ওখান থেকে মাইল আটেক দূরে আর একটি রবারের বাগানের সে ম্যানেজার। হঠাৎ কি মনে করে অত রাত্তিরে সে দেখা করতে এসেছে ভেবে লেসলি খুব অবাক ; বললে, রবার্ট তো বাড়িতে নেই, সিঙ্গাপুর গিয়েছে।

একটু এ-ও-তা করে ও বলল, তাইতো। বড় দুঃখের কথা। একা একা ভালো লাগছিল না, ভাবলুম একেবার দেখে আসি আপনারা সব কেমন আছেন।

তা কেমন করে এলেন, মোটরের আওয়াজ তো শুনলুম না।

একটু দূরে রাস্তার মাথায় গাড়ি রেখে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো এতক্ষণে শুয়ে পড়েছেন।

শুয়ে পড়াটা কিছু বিচিত্র নয়। রবারের মালিকদের খুব ভোরে উঠে

মজুরদের হাজিরা নিতে হয়। কাজেই আহারের পরে আর বিলম্ব সয় না, তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়াটাই এদের নিয়ম। পরদিন সকাল বেলায় কিন্তু হ্যামণ্ড-এর গাড়ি সত্যি সেই বাংলো থেকে পোয়াটাক মাইল দূরে পাওয়া গিয়েছিল।

হুইস্কি কিংবা সোডা বসবার ঘরে ছিল না। বয় ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে লেস্‌লি নিজেই উঠে গিয়ে পানীয় নিয়ে এল। অতিথি স্বহস্তে ঢেলে নিয়ে সোডা সমেত হুইস্কি পান করে পাইপ ধরাল।

হ্যামণ্ড লোকটা এ-অঞ্চলে সুপরিচিত, বন্ধুবান্ধব পরিচিতের অভাব নেই। বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু খুব অল্প বয়সে এদেশে এসেছে। লড়াই বাধবামাত্র সেনাদলে যোগ দিয়ে চলে গিয়েছিল, ওখানে বেশ নামও করেছিল। হাঁটুতে জখম হয়ে দু'বছর পরে ওকে সেনাদল ছাড়তে হয়। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই ডি. এস্. ও, এম্. সি. ইত্যাদি সামরিক সম্মান লাভ করে আবার মালয় রাজ্যে ফিরে আসে। ওর গুণ অনেক। বিলিয়ার্ড খেলায় ওর জুড়ি মেলা ভার, নাচে চমৎকার, টেনিস খেলায় প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ। হাঁটুতে জখম হয়ে অবধি নাচা ছেড়ে দিয়েছে, টেনিসেও আগের মতো আর চাতুর্য নেই। সব মিলিয়ে লোক সমাজে ওর খুব সমাদর, সবাই পছন্দ করে। দীর্ঘাকৃতি সুদর্শন চেহারা, বড় বড় নীল চোখ, মাথায় কালো কোঁকড়া চুল। বৃদ্ধ বিচক্ষণের দল অবশ্যি বলত ওর একটি মহৎ দোষ আছে—ও বড বেশি মেয়ে ঘেঁষা। এই দুর্ঘটনাটা ঘটবার পরে তারা সবাই সমতালে মাথা দুলিয়ে বলেছে, হুঁ, এমনি কিছু একটা ঘটবে এ তো জানা কথা।

এদিকে হ্যামণ্ড দিব্য গ্যাঁট্ হয়ে বসে গল্প জুড়ে দিল, এমন কিছু নয়—স্থানীয় সব সংবাদ—ঘোড়দৌড়ের খবর, রবারের দর এমনকি বাঘ শিকারের গল্প—একটা বাঘ নাকি ওদের বাগানের কাছাকাছি কোথায় দেখা দিয়েছে। ওদিকে লেস্‌লি বেচারীর শেলাইটা শেষ করবার তাড়া

রয়েছে, মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে পাঠাতে হবে দেশে। কাজেই চশমা জোড়া আবার নাকে লাগিয়ে শেলাইটা তুলে নিল।

হ্যামণ্ড বলল, আহা, ঐ রাক্কুসে হর্নের চশমটা চোখে না পরলেই নয়? সুন্দরী মেয়েরা কেন যে অকারণে নিজেদের কদাকার করে তোলে আমি বুঝতে পারিনে।

কথা শুনে লেস্‌লি বেশ একটু অবাক হল। ঠিক এই ধরনের কথা ও ইতিপূর্বে কখনো বলেনি। ভাবল আমল না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। বললে, ওরে বাবা, আমি আবার সুন্দরী হলাম কবে থেকে। আর তাই যদি বলেন, আমি সুন্দরী কি অসুন্দরী সে বিষয়ে আপনার মতামতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না।

আপনাকে অসুন্দরী কে বলল, আমি তো বলি আপনি পরমা সুন্দরী।

লেস্‌লি বিদ্রূপের সুরে বলল, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু -বিষয়ে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছিনে।

হ্যামণ্ড হো হো করে হেসে উঠল। নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আর একটি চেয়ারে কাছে ঘেঁষে বসল। বললে, কিন্তু আপনার হাত দুখানি যে আশ্চর্য সুন্দর একথা আপনি মানতে বাধ্য। বলেই হাত বাড়াল লেস্‌লির দিকে। লেস্‌লি ঠেলে ওর হাত সরিয়ে দিল।

আঃ, কি সব বাজে বকছেন পাগলের মতো। যান, আগের জায়গায় গিয়ে বসুন, নয়তো বাড়ি চলে যান।

হ্যামণ্ড নড়বার নাম করল না, যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল। বললে, আমি আপনাকে কতখানি ভালোবাসি তা আপনি জানেন না।

না জানি নে, জানতে চাইও না। এ-সব কথা আমি একেবারেই শুনতে রাজী নই।

ওর কথার ভঙ্গীতে লেস্‌লি ক্রমেই অবাক হচ্ছে। গত সাত বছর ধরে ওকে জানে, কোনোদিন তার সম্বন্ধে ওকে কৌতূহল প্রকাশ করতে

দেখেনি। লড়াই থেকে ফিরে আসবার পরে কিছুদিন খুব ঘনঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো বটে, একবার অসুস্থ হয়ে পড়াতে রবার্ট নিজে গিয়ে ওকে গাড়ি করে তাদের বাংলোয় নিয়ে এসেছিল। দিন পনেরো ওদের বাড়িতেই ছিল। দুজনের প্রকৃতি আলাদা, রুচি আলাদা, কাজেই তাদের যৎসামান্য পরিচয় কোনোকালে বন্ধুত্বের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়নি। তারপর গত দু'তিন বছর দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম হয়েছে। কখনো-সখনো ও টেনিস খেলতে আসত, কখনো বা দেখা হতো অপর কোনো প্ল্যান্টারের বাগানে কোনো পার্টি উপলক্ষে। মোটের উপর ইদানিং দেখা হচ্ছিল কালেভদ্রে।

আরেকবার হুইস্কির পাত্র পূর্ণ হল। লেস্‌লি ভাবছিল বাড়ি থেকেই বোধ করি আজ মাত্রাটা চড়িয়ে এসেছে। ভাবভঙ্গীটা মোটেই স্বাভাবিক নয়, ভেতরে ভেতরে ও আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করে বলল, আমার কথা যদি শোনেন তো আর বেশি পান না করাই ভালো।

কথার জবাব না দিয়ে এক চুমুকে সবটুকু পান করে ও পাত্রটি রেখে দিল। তারপরে হঠাৎ বলল, আপনি ভাবছেন বুঝি আমি মদের ঝোঁকে আপনাকে এ-সব কথা বলছি।

নিশ্চয়, তা নয় তো কি?

মোটেই তা নয়। তবে শুনুন। সেই যেদিন প্রথম আপনাকে দেখেছি সেদিন থেকেই আপনাকে ভালোবেসে আসছি। এতদিন মুখ ফুটে বলিনি কিন্তু আজ আর না বলে পারছিনে—তোমাকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

লেস-লাগানো বালিশটি আস্তে সরিয়ে রেখে লেস্‌লি উঠে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে বলল, গুড নাইট্, আমি চললুম!

কিন্তু আমি এখন যাচ্ছিনে।

এবারে লেস্‌লির রীতিমতো ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। রেগে উঠে বলল, আপনি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। আমি রবার্টকে ছাড়া জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি। তা যদি নাও হতো তবু আপনার মতো লোককে আমি কোনো কালে প্রশ্রয় দিতে রাজী নই।

অতশত বুঝিনে। আপাতত রবার্ট তো বাড়ি নেই।

এ-মুহূর্তে যদি বেরিয়ে না যান তো আমি চাকরদের ডাকব, ওরা আপনাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে।

ওরা তোমার ডাক শুনবে না।

লেস্‌লি তখন রাগে কাঁপছে। ভাবল বারান্দা থেকে ডাকলে চাকররা নিশ্চয় শুনবে। সেদিকে এক পা এগুতেই ও তাকে ধরে ফেলল।

ছাড় বলছি! লেস্‌লি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

ছাড়ব না, এতদিনে তোমাকে পেয়েছি।

লেস্‌লি 'বয়' 'বয়' করে চেঁচিয়ে উঠতেই ও হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। চক্ষের পলকে তাকে বুকে চেপে ধরে উন্মত্তের মতো চুমু খেতে লাগল। নিজেকে মুক্ত করবার জন্য লেস্‌লি প্রাণপণে চেষ্টা করছে, ওর জ্বলন্ত ওষ্ঠের স্পর্শ এড়াবার জন্য মুখ একবার এদিকে নিচ্ছে আরেকবার ওদিকে, আর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—উঁ হুঁ, না, না। এর পরে কি যে হয়েছে সে স্পষ্ট করে বলতে পারে না। ততক্ষণে ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেছে। লোকটা কি সব বলছে তার কানেই ঢুকছে না, কথার মানে ভালো করে বুঝতে পারছে না। বোধকরি প্রাণপণে ওর কাছে প্রেম নিবেদন করছিল কিন্তু লেস্‌লির কানে ওসব কথা ঢুকলে তো। বেচারি তখনও ওর উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দী। কি করবে? লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, তার হাত থেকে সে নিজেকে ছাড়াবে কি করে? খানিকক্ষণ লড়াই করেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার ওপরে ও উন্মাদের মতো তার মুখে চোখে

গালে মাথার চুলে চুমু খাচ্ছে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর মুখে লেগে ওর যেন দম আটকে আসছে। আর এমনি জোরে ওকে চেপে ধরেছে, মনে হচ্ছে তাতেই তার দম বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ এক হেঁচকা টানে ওকে উপরে তুলে ফেললে। লেস্‌লি পা ছুঁড়ে, লাথি মেরে যত নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় ততই সে তাকে আরো বুকে চেপে ধরে। এবার সে তাকে কোলে করে নিয়ে এগুচ্ছে। এখন আর কথা বলছে না, কিন্তু মুখে চোখে এক ক্ষুধার্ত দৃষ্টি জেগে উঠেছে। তখন তাকে দেখলে কে বলবে সে সুসভ্য মানুষ, একেবারে আদিম বর্বরের মতো তার চেহারা। তাকে নিয়ে চলেছে শোবার ঘরের দিকে। দ্রুত এগুতে গিয়ে ধাক্কা খেল একটা টেবিলের সঙ্গে। জখমি হাঁটু নিয়ে ওকে এমনিতেই একটু টেনে-টেনে হাঁটতে হতো। লেস্‌লিকে সমেত হোঁচট খেয়ে একেবারে পড়ল হুড়মুড় করে। মুহূর্তে লেস্‌লি নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সোফাটার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। এদিকে লোকটা চক্ষের পলকে উঠে পড়েছে। ঝাঁপিয়ে ওর দিকে আবার এগিয়ে আসছে। ডেস্কের উপরে ছিল একটা রিভলভার। রবার্ট বাড়িতে নেই, শোবার সময় রিভলবারটি কাছে নিয়ে শোবে এই ভেবে আগে থেকেই ওটা বার করে রেখেছিল। ভয়ে এখন সে উন্মাদ প্রায়, ভয়ে ত্রসে কি করছিল সে নিজেই জানে না। রিভলবারের একটা আওয়াজ তার কানে গিয়েছে, এই পর্যন্ত। হ্যামণ্ডকে দেখছে ও টলছে, চেঁচিয়ে কি যেন বলল তার মনে নেই। ঘর থেকে টলতে-টলতে ও বেরিয়ে এল বারান্দায়। কিন্তু লেস্‌লির মাথায় তখন খুন চেপে গেছে, ওর পেছন পেছন সেও ছুটে এসেছে বারান্দায়; অবিশ্যি স্পষ্ট কিছুই এখন তার মনে পড়ছে না, আন্দাজ করে বলছে। যন্ত্র-চালিতের মতো সে কেবল গুলি করেই গিয়েছে যতক্ষণ না গুলি সব নিঃশেষ হয়েছে।

গুলির শব্দ শুনে চাকর-বাকররা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে দেখে হ্যামণ্ডের

রক্তাক্ত দেহ বারান্দায় পড়ে আছে, রিভলবার হাতে পাশে মনিব-গৃহিনী দাঁড়িয়ে। হ্যামণ্ডের দেহে তখন প্রাণ নেই। চাকরগুলো হকচকিয়ে গেছে, ভয়ে জড়সড়। লেস্লি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে রিভলবারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল, বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে। ভেতর থেকে তালা বন্ধ করবার শব্দ শোনা গেল! চাকরের দল ভয়ার্ত চোখে মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে, ফিস্ ফিস্ করে চাপা গলায় একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। মৃতদেহটা একবার ধরে দেখবারও সাহস হচ্ছে না। ওদের মধ্যে যে সর্দার আস্তে আস্তে সে নিজেকে একটু সামলে নিল। অনেকদিন থেকে এ-বাড়িতে কাজ করছে—জাতে চীনা, ঠাণ্ডা মেজাজের ধীর স্থির মানুষটি।

রবার্ট সিঙ্গাপুরে গিয়েছে মোটর সাইকেল করে, গাড়ি গ্যারেজেই রয়েছে। ড্রাইভারকে বলল গাড়ি বার করতে, এক্ষুনি গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অফিসারকে খবর দিতে হবে। রিভলবারটি তুলে নিয়ে পকেটে পুরল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অফিসার উইদার্ন সাহেব থাকেন ওখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এক ছোট্ট সহরে। দেড় ঘণ্টা লাগল ওখানটায় পৌছতে। সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, হাঁক ডাক করে চাকরদের তুলতে হল। উইদার্ন সাহেব ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। ওরা ঘটনার বৃত্তান্ত খুলে বলল, কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য চীনে চাকরটি পকেট থেকে বের করে রিভলবারটি দেখাল। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার কালবিলম্ব না করে পোশাক বদলে নিল, নিজের মোটর বার করে রওনা হল ওদের সঙ্গে নির্জন অন্ধকার পথে। ক্রস্বিদের বাংলোয় যখন গিয়ে পৌচেছে তখন সবে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়াল—হ্যামণ্ডের মৃতদেহ ওখানটায় পড়ে আছে। একবার স্পর্শ করে দেখল—হিম শীতল দেহ।

চাকরকে জিগগেস করল, মেমসাহেব কোথায় ?
চীনে চাকর অঙ্গুলি সংকেতে শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে। উইদার্ন এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। প্রথমটায় কোনো জবাব পাওয়া গেল না। আরেকবার টোকা মেরে উইদার্ন ডাকল—মিসেস ক্রস্‌বি—
কে ?
আমি উইদার্ন।
কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তারপরে আস্তে দরজা খুলে ধীরে ধীরে লেস্‌লি এসে সুমুখে দাঁড়াল। দেখে মনে হল সারারাত সে শোয়নি, এখনও সেই ডিনারের পোশাক পরা। কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
আপনার চাকর গিয়ে আমাকে খবর দিল। তা, কি ব্যাপার বলুন তো।
লোকটা আমার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করেছিল, আমি গুলি করেছি।
এঁ্যা ? বলেন কি ? আচ্ছা আপনি দয়া করে একবার এদিকটায় আসুন দেখি, বলুন তো আমাকে ঠিক কি হয়েছিল। .
এখন নয়, এখন কিছুই বলতে পারব না। আমাকে ভাবতে সময় দিন। বরং আমার স্বামীর কাছে খবর পাঠান।
উইদার্ন ছোকরা কর্মচারী। এরূপ জরুরি ব্যাপারে কি করা উচিত অনুচিত সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বিশেষ করে এ-ধরনের কাজের জিম্মে তার নয়। রবার্ট না আসা পর্যন্ত লেস্‌লির মুখ থেকে একটি কথাও বার করা গেল না। সে এলে পর ও উভয় ব্যক্তির কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। সেই থেকে বহুবার তাকে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবার সে একই কথা বলেছে, কোথাও এক চুল নড়চড় হয়নি।
গুলি করা সম্বন্ধে মিস্টার জয়েসের মনে একটু খটকা লেগে আছে। উকিল হিসেবে ওর মনে বারবার এই প্রশ্ন উঠছে যে.

লেস্‌লি একবার গুলি না করে পরপর ছ'বার গুলি করল কেন? মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে অন্তত চারটি গুলি একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে করা হয়েছে। এমন কি মনে হয় লোকটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে ও যেন রিভলভারের সব গুলি নিঃশেষ করে দিয়েছে। ও নিজেই স্বীকার করছে যে গুলি করবার আগে পর্যন্ত সব কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু ঠিক গুলি করবার ব্যাপারটা ওর কিছুই মনে নেই। ওখানটাতে ওর মন একেবারে ফাঁকা। এতে শুধু ওর উন্মত্ত ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ওর মতো শান্ত লাজুক মেয়ে যে ক্রোধে অতখানি অন্ধ হতে পারে তা বিশ্বাস করাই কঠিন। মিস্টার জয়েস আজ ক'বছর ধরে ওকে দেখে আসছেন, ওঁর মনে হয়েছে লেস্‌লির মধ্যে হৃদয়াবেগের কোনো বালাই নেই। এত বড় দুর্ঘটনাটার পরেও আজ ক'সপ্তাহ সে যে নির্বিকার ভাব দেখিয়েছে তাতে তিনি আরো বিস্মিত হয়েছেন।

মিস্টার জয়েস বসে বসে ভাবছিলেন, তাইতো! অতিশয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মধ্যেও কতখানি হিংস্রতা যে লুকিয়ে থাকতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়।

দরজায় করাঘাত হতেই জয়েস বললে, ভেতরে এস!

প্রবেশ করল সেই চীনা কেরানীটি। ঘরে ঢুকেই বেশ সাবধানে দরজাটি বন্ধ করে দিল। তারপরে মিস্টার জয়েসের টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ গোপনীয় কথার প্রয়োজন ছিল, অনুমতি করেন তো বলি।

এই লোকটির অমন সাজিয়ে-গুজিয়ে কথা বলার ভঙ্গীতে মিস্টার জয়েস প্রায়ই কৌতুক বোধ করে থাকেন। তিনি হেসে ফেললেন, বললেন, না, না, এ আর কষ্ট কি, চি-সেঙ?

আজ্ঞে, কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়—আর বলতেও খুব সংকোচ হচ্ছে।

কিছু না, কিছু না, বলেই ফেল।

মিস্টার জয়েস মুখ তুলে তাঁর কেরানীর চোখের দিকে তাকালেন। মিটমিটে চোখ দুটি বুদ্ধির আভায় জলজ্বল্ করছে। হাল ফ্যাশনের নিখুঁত পোশাক-পরা, পায়ে চকচকে পেটেণ্ট লেদারের জুতো আর রঙিন সিল্কের মোজা। তার কালো রঙের টাই মুক্তোর পিন দিয়ে আঁটা, বাঁ হাতের আঙুলে হীরের আংটি। ধবধবে শাদা কোটের পকেটে সোনার পাতে মোড়া ফাউনটেন পেন আর পেনসিল। এ-ছাড়া হাতে সোনার কব্জি-ঘড়ি, চোখে প্যাশনে। একটু কেশে, একটু ইতস্ততঃ করে লোকটি বলল, আজ্ঞে কথাটা হচ্ছে, ক্রসবিদের মামলা সম্বন্ধে।

আচ্ছা, কি কথা ?

সম্প্রতি একটা ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, তাতে মামলাটার চেহারাই আমূল বদলে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কি শুনি।

আমি শুনলুম মৃত ব্যক্তির কাছে লেখা আসামীর একখানা চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সেটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। গত সাত বছর ধরে ওদের জানা-শোনা, কাজেই মিসেস ক্রসবি মাঝে মাঝে হ্যামণ্ডকে লিখে থাকবেন তাতে আর বিচিত্র কি ?

তাঁর কেরানীটি অতিশয় চতুর ; মিস্টার জয়েস তা খুব ভালো করেই জানেন। শুধু তাঁর মানসিক উদ্বেগ গোপন করবার জন্যই এই কথা ক'টি বললেন।

হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন, সেটা খুবই সম্ভব। মিসেস ক্রসবি মাঝে মাঝে হয়তো ওঁকে চিঠি লিখে থাকবেন—কোনোদিন ডিনারের নিমন্ত্রণে, কোনোদিন বা টেনিসে। প্রথমে চিঠির কথা শুনে আমিও ঠিক ঐ কথাই

ভেবেছিলাম। কিন্তু এই চিঠিখানা বাস্তবিক পক্ষে লেখা হয়েছে ঠিক যেদিন মিস্টার হ্যামণ্ড মারা যান সেই দিন।

মিস্টার জয়েসের চোখের পাতাটিও নড়ল না, বিচলিত হবার এতটুকু লক্ষণ দেখালেন না। অঙ-চি-সেঙ-এর সঙ্গে বরাবর যেমন হাসি-হাসিমুখে কথা বলেন, এখনও তাঁর মুখে সেই ক্ষীণ কৌতুকের হাসি। বললেন, এ-কথা তোমাকে কে বললে?

আমার একটি বন্ধুর কাছে সব কথা আমি শুনেছি।

মিস্টার জয়েস দেখলেন এ-বিষয়ে বেশি চাপাচাপি না করাই ভালো, কি জানি কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোয় যদি।

আপনার বোধকরি মনে আছে মিসেস ক্রসবি তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে ঘটনার দিনের পূর্বে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ওঁদের দুজনের দেখা সাক্ষাৎ কিম্বা কোনো রকমের খবরাখবরই ছিল না।

চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?

আজ্ঞে, না।

চিঠিতে কি লেখা আছে, জানতে পারি?

আমার বন্ধু আমাকে চিঠির একখানি নকল দিয়েছেন। আপনি পড়তে চান তো দেখাতে পারি।

বেশ, দেখি।

অঙ-চি-সেঙ তার ভেতরের পকেট থেকে একটি ভারি মোটা ব্যাগ বার করলে। ব্যাগটি হরেক রকমের কাগজপত্রে ভর্তি, তার মধ্যে সিঙ্গাপুরের ডলার নোট থেকে শুরু করে সিগারেটের কার্ড ইত্যাদি সবই আছে। ক্ষিপ্রহস্তে কাগজপত্র ঘেঁটে ও তার ভেতর থেকে একখানি পাতলা চিঠির কাগজ বের করে মিস্টার জয়েসের সুমুখে ধরল। চিঠিতে এই ক'টি কথা লেখা আছে: র—আজ রাত্তিরে বাড়ি থাকবে না। তোমার সঙ্গে আজ দেখা হওয়া চাই-ই। এগারোটা আন্দাজ তোমাকে আশা করব।

আমি এখন একেবারে মরিয়া—যদি না আস তবে ফলাফলের জন্য আমি দায়ী নই। গাড়িটা বাড়ির দোর অবধি এনো না।—এল্।

এই চিঠি যে মিসেস ক্রস্‌বির লেখা সে তুমি কেমন করে জানলে?

আজ্ঞে, আমাকে যিনি খবর দিয়েছেন তাঁর ওপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আর এর সত্যাসত্য প্রমাণ করা কিছুই কঠিন নয়। মিসেস ক্রস্‌বিকে জিগগেস করলেই আপনি জানতে পারবেন উনি এ-রকম কোনো চিঠি লিখেছেন কিনা।

মিস্টার জয়েস গোড়া থেকেই তাঁর কেরানীর মুখের ভাবটি লক্ষ্য করছিলেন। এখন তাঁর মনে হল ওর মুখে যেন একটু ক্ষীণ বিদ্রূপের আভাস রয়েছে। বললেন, এ অসম্ভব, মিসেস ক্রস্‌বি এমন চিঠি লিখতেই পারেন না।

আজ্ঞে, এই যদি আপনার মত হয় তাহলে তো ব্যাপার চুকেই গেল। আমি আপনার আপিসে কাজ করি, এ-জন্যই আমার বন্ধু ভেবেছিলেন যে চিঠির বিষয়টা সরকারী উকিলকে জানানোর আগে আপনাকে একবার হয়তো বলা উচিত।

মিস্টার জয়েস জিগগেস করলেন, আসল চিঠিটা কার কাছে আছে?—কথার সুরে একটু উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

অঙ-চি-সেঙ বুঝতে পারল এবার ওষুধে ধরেছে। কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ করল না। বলল, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিস্টার হ্যামণ্ডের মৃত্যুর পরে জানা গিয়েছে যে একটি চীনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিখানা এখন তার কাছেই আছে।

এই চীনা স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারটা জেনে অবধি হ্যামণ্ডের বিরুদ্ধে লোকের মন আরও বেশি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এখন শোনা যাচ্ছে একটি চীনা স্ত্রীলোক নাকি গত কয়েক মাস ধরে হ্যামণ্ডের বাড়িতেই বাস করছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল; কেউ কথা বলল না। আর, বলবার কিছু ছিলও না। দু'জনেই দু'জনের মনের কথা বেশ বুঝতে পারছে। মিস্টার জয়েস বললেন, ধন্যবাদ চি-সেঙ। আমি বিষয়টা ভেবে দেখব।

যে আজ্ঞে। তাহলে আমার বন্ধুকে কি এ-বিষয়ে কিছু জানাব?

হ্যাঁ, তুমি ওর সঙ্গে একটু যোগাযোগ রেখ।

আচ্ছা, তাই হবে।

কেরানীটি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিস্টার জয়েস চিঠির নকলখানি হাতে নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। নানান রকমের সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারছে। যত ভাবছেন উদ্বেগ তত বাড়ছে। শেষটা সন্দেহটাকে জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন হয়তো এ-চিঠিটা লিখবার খুব একটা সঙ্গত কারণ আছে। লেস্‌লিকে জিগগেস করলেই কারণটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু শত হলেও ঐ আবার একটা খোঁচা বাড়ল। এটার কিনারা না করলেই নয়। চিঠিটা পকেটে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। টুপিটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

অঙ-চি-সেঙ তখন তার ডেস্কে বসে কি লিখছে। ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কয়েক মিনিটের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি।

আজ্ঞে, মিস্টার জর্জ রীডের বারোটার সময়ে আসবার কথা। উনি জিগগেস করলে, কোথায় গিয়েছেন বলব।

মিস্টার জয়েস একটু হেসে বললেন, বোলো কোথায় গিয়েছেন জানি না। তিনি যে জেলখানার দিকে যাচ্ছেন চি-সেঙের তা বুঝতে বাকি নেই, ওর মুখ দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। দুর্ঘটনা ঘটেছে বেলান্দায়। মামলার বিচারও সেখানকার আদালতেই হবার কথা। কিন্তু ওখানকার জেলে শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীলোকদের রাখবার ভালো বন্দোবস্ত নেই বলে, মিসেস ক্রস্‌বিকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসা হয়েছে।

খবর পাঠিয়ে দিয়ে মিস্টার জয়েস অপেক্ষা করছিলেন। লেস্‌লি ঘরে ঢুকেই, করমর্দনের জন্য তার ক্ষীণ কোমল হাতখানি বাড়িয়ে দিল, মুখে প্রসন্ন হাসি। পরিধানে শাদাসিধে পরিচ্ছন্ন পোশাক, মাথার চুল পরিপাটি করে বাঁধা। খুব মিষ্টি হেসে বলল, আপনি আজকে আসবেন আশা করিনি। এত সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে, মনে হচ্ছে ও যেন নিজের বাড়িতেই আছে। মিস্টার জয়েস ভাবছিলেন এক্ষুনি হয়তো ও 'বয়'কে ডেকে একটা কিছু পানীয় আনবার ফরমায়েস করবে। জিগগেস করলেন, আপনি কেমন আছেন ?

বেশ ভালো আছি। খুব হাল্কাসুরে বলল, বিশ্রাম নেবার পক্ষে এ জায়গাটা চমৎকার।

প্রহরী চলে যেতেই লেস্‌লি বলল, আপনি বসুন। মিস্টার জয়েস একটি চেয়ার টেনে বসলেন কিন্তু কি করে যে কথাটা পাড়বেন ভেবে উঠ পারছেন না। ও এমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আছে, এত বড় সাংঘাতিক কথাটা ওকে কেমন করে বলবেন ! ও দেখতে সুন্দরী নয়, কিন্তু চেহারায় কিছু একটা আছে যা মনকে টানে। ওর মধ্যে একটি সহজ রুচিবোধ আছে যেটা একেবারে জন্মগত, কেবলমাত্র সামাজিক ভদ্রতার আলগা প্রলেপ নয়। ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেমন পরিবারে, কেমন আবহাওয়ায় ও মানুষ হয়েছে। এমন কি ওর অনাড়ম্বর বসন-ভূষণের মধ্যেও বেশ একটি মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবে ভঙ্গীতে কোথাও বিন্দুমাত্র স্থূলতার আভাস নেই।

হাসিমুখে তরল কণ্ঠে বলল, বিকেল বেলায় রবার্ট আসবে দেখা করতে সে-জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। (ওর কথা শুনতে বেশ লাগে, গলার স্বর আর উচ্চারণ ভঙ্গীতে বেশ একটি আভিজাত্য আছে।) আহা, বেচারী কি দুশ্চিন্তাটাই না ভোগ করছে। ভাগ্যিস আর বেশি দিন নেই, শিগগিরই সব চুকে যাবে।

আর পাচটি দিন মাত্র বাকী।

হ্যাঁ, তা জানি। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি মনে মনে বলি, একটি দিন কমলো। হেসে বলল, সেই যেমন ইস্কুলে থাকতে ছুটির আগে দিন গুনতাম—এও তেমনি।

আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিগগেস করছি—দুর্ঘটনার আগে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ হ্যামণ্ডের সঙ্গে আপনার কোনোই যোগাযোগ ছিল না, এই কি আপনি বলতে চান?

হ্যাঁ, সে-কথা তো আগেই বলেছি। ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ম্যাকফ্যারেনদের ওখানে টেনিস-পার্টিতে। তাও গোনাগুন্তি দুটির বেশি কথা হয়নি। আপনি তো জানেনই ওদের ওখানে দুটো টেনিস-কোর্ট—আমরা দু'জন আলাদা কোর্টে খেলছিলাম।

চিঠিপত্রও ওকে লেখেননি?

না, না।

আপনার ঠিক মনে আছে তো?

খুব মনে আছে। একটু হেসে বলল, লিখবার মধ্যে তো লিখতাম হয় ডিনারে নয় টেনিসে আসতে। এ-ছাড়া আর ওকে কী-ই বা লিখব? তাও গত কয়েক মাসের মধ্যে লিখিনি।

আচ্ছা, এক সময়ে তো ওর সঙ্গে আপনাদের বেশ অন্তরঙ্গতাই ছিল। তাহলে মাঝখানটায় এমন কি হল যাতে কোনো কিছুতে আর ওকে ডাকতেন না?

বিশেষ ভঙ্গীতে ঘাড়টি নেড়ে মিসেস ক্রসবি বলল, কদ্দিন আর একজনকে ভালো লাগে? লোকজন পুরানো হয়ে যায়। তাছাড়া কোনো দিক থেকেই আমাদের দুজনের খুব বেশি মিল ছিল না। অবশ্যি ওর সেই অসুখের সময় রবার্ট আর আমি ওর জন্য যথাসাধ্য করেছি। তারপরে গত বছর দুই দেখেছি ও ভয়ানক ব্যস্ত। খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল,

দেখতাম এদিক-ওদিক চারদিক থেকে তার ডাক পড়ছে। আমরা আর মিছিমিছি ওকে নেমন্তন্ন করে বিব্রত করিনি।

ব্যস, তাহলে এই কারণেই ওর সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছিলেন?

মিসেস ক্রস্‌বি কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্তত: করলেন। তাহলে আপনাকে সব কথা বলেই ফেলি। আমরা জানতে পেরেছিলাম সে নাকি বাড়িতে একটি চীনা স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করছে। রবার্ট তাই শুনে বলছিল ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে স্বচক্ষে দেখেছি।

মিস্টার জয়েস গালে হাত দিয়ে একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন, চোখের দৃষ্টি লেস্‌লির মুখে নিবদ্ধ। হঠাৎ মনে হল ঐ কথা ক'টি বলতে গিয়ে লেস্‌লির চোখের তারা ছুটি মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ-শিখার মতো জ্বলে উঠল। মিস্টার জয়েস তাঁর চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। আস্তে আস্তে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আপনাকে একটি কথা বলা দরকার। জোফ্রে হ্যামণ্ডের কাছে আপনার লেখা একখানি চিঠি পাওয়া গেছে।

কথা ক'টি বলে লেস্‌লির মুখের ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, মুখ চোখের রঙ এতটুকু বদলাল না। তবে কথার জবাব দিতে বেশ একটু দেরি হল।

হ্যাঁ, আগে তো এটা ওটা নিয়ে প্রায়ই ছোটখাটো চিঠি ওকে লিখেছি, কখনো বা ও সিঙ্গাপুরে গেলে এক আধটা জিনিসের ফরমায়েস দিয়েছি।

এই চিঠিতে আপনি ওকে আসতে লিখছেন, আরও বলছেন যে রবার্ট বাড়িতে নেই, সিঙ্গাপুরে গেছে।

অসম্ভব! অমন চিঠি আমি কখনও লিখিনি।

তাহলে একবার এটা পড়েই দেখুন। পকেট থেকে বার করে চিঠির কাগজখানা ওর হাতে দিলেন।

লেস্‌লি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে কাগজখানা ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিল। এতো আমার হাতের লেখা নয়।

সে আমি জানি। এটি সেই আসল চিঠির নকল মাত্র।

এবার সে কাগজখানা নিয়ে পড়তে লাগল। মুহূর্তে ওর মুখের চেহারা আশ্চর্য রকম বদলে গেল। ওর বিবর্ণ পাংশুটে মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মুখের রঙ নীল হয়ে গেছে। গালের মাংস সরে গিয়ে হাড় দেখা দিয়েছে। ঠোঁট দুটি ভেতরে ঢুকে গেছে। দাঁত বেরিয়ে গিয়ে মুখের চেহারাটা হয়েছে বীভৎস। মিস্টার জয়েসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে চোখ দুটো এখুনি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। ওকে আর জ্যান্তমানুষ বলে মনে হচ্ছে না। দেখাচ্ছে একটা নরকঙ্কালের মতো। অতিকষ্টে বলল, এর মানে কী? ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। যদি বা কথা বলছে সেটা মানুষের স্বর বলে মনে হয় না।

মিস্টার জয়েস বললেন, এর মানে কি, সে তো আপনিই বলবেন।

আমি এ-চিঠি লিখিনি। হলপ করে বলছি কখনও লিখিনি।

যা বলছেন, বেশ ভেবেচিন্তে বলুন। আসল চিঠিখানা যদি আপনার নিজের হাতে লেখা হয় তাহলে অস্বীকার করে কিছু ফল হবে না।

এতো জাল চিঠিও হতে পারে।

সেটা প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে।

বরং এ-চিঠি যে খাঁটি সেটা প্রমাণ করাই সহজ।

ওর ক্ষীণ দেহটি বার দুই কেঁপে কেঁপে উঠল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। ব্যাগ থেকে একটি রুমাল বার করে বারকয়েক হাতের তেলো মুছল। একবার চিঠির দিকে তাকাচ্ছে একবার মিস্টার জয়েসের দিকে। বললল, চিঠিতে কোনো তারিখ দেখছি না। অমন চিঠি

লিখে থাকলেও সে হয়তো অনেককাল আগের কথা, সে, আমি ভুলে গিয়েছি। সময় পেলে আমি ভেবে দেখতে পারি মনে পড়ে কিনা, কখন লিখেছিলাম, কেন লিখেছিলাম।

চিঠিতে তারিখ নেই সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। চিঠিটা সরকারপক্ষের হাতে এলে উকিল নিশ্চয় চাকরবাকরদের জেরা করবে। ঘটনার দিন হ্যামণ্ডের কাছে কেউ চিঠি নিয়ে গিয়েছিল কিনা, সে কথাটা জেরার ফলে অতি সহজেই বেরিয়ে পড়বে।

মিসেস ক্রস্‌বি এখন রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। মিস্টার জয়েস খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ঘরের মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপরে আস্তে আস্তে বললেন, এখন আর এ-বিষয়ে বেশি আলোচনা করে লাভ হবে না। তবে চিঠিখানা যদি সত্যই সরকার পক্ষের হাতে এসে পড়ে, তাহলে সে-জন্য আপনাকে তৈরী থাকতে হবে।

ওঁর কথার সুরে মনে হল এই তাঁর শেষ কথা। কিন্তু তিনি উঠবার কোনো লক্ষণ দেখালেন না, বসেই রইলেন। লেস্‌লির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। লেস্‌লিও নীরব—পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। অবশেষে তিনিই প্রথমে কথা বললেন, আপনার যদি এ-বিষয়ে আর কিছু বলবার না থাকে তাহলে এখন আমি উঠি। আমাকে আবার আপিসে ফিরে যেতে হবে। লেস্‌লি এবার জিগগেস করল, আচ্ছা, কেউ যদি এ-চিঠি পড়ে তাহলে এ-থেকে তার কি ধারণা হবে?

মিস্টার জয়েস তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, সে মনে করবে আপনি ত হলে মিথ্যা বলেছেন। ইচ্ছে করে সত্য গোপন করেছেন।

কখন মিথ্যা বলেছি?

আপনি আপনার বিবৃতিতে এ-কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অন্তত তিনমাস আগে থেকে হ্যামণ্ডের সঙ্গে আপনার কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না।

দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছে! ঘটনাটা এখনও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঠেকছে। এর ধাক্কা সামলানো তো সহজ কথা নয়, কাজেই ছোটখাটো একটা কথা যদি আমি বলতে ভুলে গিয়ে থাকি তাহলে সেটা এমন কি অপরাধ?

অপরাধ বলে ধরে নেওয়াটা কিছু অন্যায় নয়, কারণ সেদিন হ্যামণ্ডের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা আপনি হুবহু বর্ণনা করেছেন। এখন সবাই অবাক হবে, যে সব চেয়ে জরুরী কথাটাই কিনা, আপনি বলতে ভুলে গেলেন, যে আপনার আমন্ত্রণ পেয়েই সেদিন রাত্রে সে আপনার বাড়িতে এসেছিল।

ঠিক যে ভুলে গিয়েছিলাম তা নয়। ব্যাপারটা ঘটে যাবার পরে ও কথাটা বলতে আমার কেমন ভয় হল। আমি মনে করলুম আমার নিমন্ত্রণে ও এসেছিল এ-কথা স্বীকার করলে আসল ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে না। এখন বুঝতে পারছি বোকার মতো কাজ করেছি। কিন্তু তখন আমার মাথা একেবারেই ঠিক ছিল না। আর একবার যেই বলে ফেলেছি যে হ্যামণ্ডের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না সেই থেকে ও-কথার আর নড়চড় করিনি।

লেস্‌লি এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে। খুব সহজ দৃষ্টিতে মিস্টার জয়েসের দিকে তাকাল। ওর এই সরল শান্ত মূর্তিটি দেখলে মনে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রবার্ট বাড়িতে নেই, এ অবস্থায় রাত্তির বেলায় হ্যামণ্ডকে কেন আসতে বলেছিলেন সে কথাটারও সঙ্গত কোনো কারণ আপনাকে দেখাতে হবে!

এবার সে বড় বড় চোখ মেলে মিস্টার জয়েসের দিকে তাকাল। আগে কোনোদিন লক্ষ্য করে দেখেননি, চমৎকার দেখতে ওর চোখ দুটি, অশ্রুভারে টলটল্ করছে। ধরাগলায় কথা বলল, শুনুন তাহলে বলছি। ভেবেছিলাম রবার্টকে একটা ব্যাপারে খুব অবাক করে দেব। আসচে মাসে ওর জন্মদিন। কিছুদিন থেকে ওর একটা নতুন বন্দুক কেনবার শখ হয়েছে, আমি আবার ও-সব জিনিসের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনে। তাই ভাবলুম হ্যামণ্ডকে ডেকে পাঠাই, ওকেই বলব পছন্দসই একটি বন্দুক অর্ডার দিয়ে আনিয়ে দিতে।

আপনি বোধহয় ইতিমধ্যে চিঠির ভাষাটা ভুলে গিয়েছেন। আরেকবার চিঠিখানা দেখে নেবেন ?

না, দরকার নেই।

সামান্য একটা বন্দুক কেনার পরামর্শের জন্য কি কোনো স্ত্রীলোক কাউকে এ রকম চিঠি লিখতে পারে—বিশেষ করে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যখন আপনার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না।

হ্যাঁ, তা দেখুন চিঠিটাতে বাস্তবিক বড় বেশি আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। তবে ঐ আমার স্বভাব, সাধারণত আমি ঐ ভাবেই লিখি, বলে লেস্‌লি একটু হাসল। আর হ্যামণ্ডের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব যৎসামান্যও তো নয়। ওর অসুখের সময় আমি ঠিক ওর মায়ের মতো ওর শুশ্রূষা করেছি। মুশকিল যে, রবার্ট ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে নারাজ, এ-জন্য বাধ্য হয়ে রবার্টের অনুপস্থিতিতে ওকে ডেকে পাঠাতে হয়েছিল।

অনেকক্ষণ এক জায়গায় ঠায় বসে থেকে মিস্টার জয়েস অস্বস্তি বোধ করছিলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে দু'একবার একটু পায়চারি করলেন, বোধ করি এখন কি বলবেন মনে মনে সে কথারই তালিম দিচ্ছিলেন। একটু পরে চেয়ারটার পিঠে ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর মুখে বলতে লাগ্‌লেন, মিসেস ক্রস্‌বি

আপনাকে আমি কয়েকটি খুব গুরুতর কথা বলছি। এ পর্যন্ত যা দেখেছি আপনার মামলা নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু ছিল না। একটি মাত্র বিষয়ে আমার খটকা ছিল। সেটি হচ্ছে—হ্যামণ্ড মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও আপনি অন্তত চারবার ওকে গুলি করেছেন। আপনার মতো শান্ত শিষ্ট, মার্জিত রুচি, সংযত স্বভাব মেয়ের পক্ষে ক্রোধে অতখানি অন্ধ হওয়া কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। তবু না হয় সেটা মেনে নেওয়া গেল। ওদিকে দেখুন জোফ্রে হ্যামণ্ড লোকটা সকলের খুব প্রিয় ছিল, তার সম্বন্ধে লোকে মোটামুটি ভালো ধারণাই পোষণ করত। তথাপি তার বিরুদ্ধে আপনি যে গুরুতর অভিযোগ করেছেন সে অভিযোগও আমি প্রমাণ করতে পারব বলে মনে করি। তার মৃত্যুর পরে চীনা স্ত্রীলোক ঘটিত যে ব্যাপারটি জানা গিয়েছে তাতে তার অপরাধ প্রমাণ করা আরো সহজ হবে। ওর প্রতি লোকের যদি বা কিছু সহানুভূতি ছিল, এই ব্যাপারটিতে তা একেবারে নির্মূল হয়েছে। মামলার বিচারে ওর বিরুদ্ধে এই লোকমতের যতখানি সম্ভব সুযোগ আমরা গ্রহণ করব। আজই সকাল বেলায় আপনার স্বামীকে আমি বলছিলাম যে আপনার মুক্তি অবধার্য। এটা যে কেবলমাত্র তাকে আশ্বাস দেবার জন্য বলেছি এমন নয়।

মিসেস ক্রস্‌বি নিঃশব্দে ওঁর কথা শুনছে। সাপের ফণার সামনে পাখি যেমন হতভম্ব হয়ে থাকে, সেও তেমনি হতবাক হয়ে বসে আছে।

মিস্টার জয়েস আগের মতোই গম্ভীর সুরে বলে যেতে লাগলেন, কিন্তু এই চিঠির ফলে, মামলাটার স্বরূপ একেবারে বদলে যাচ্ছে। আমি আপনার উকিল আদালতে আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করব। আপনি যে-ভাবে আমাকে ঘটনার বিবরণ দেবেন ঠিক সেইভাবে আমাকে মামলা সাজাতে হবে। আপনার কথা সব আমি বিশ্বাস করতেও পারি, নাও করতে পারি [illegible]তে কিছু যায় আসে না। উকিল হিসেবে আমার

কর্তব্য বিচারকের কাছে এমনভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যাতে আসামী দোষী সাব্যস্ত না হয়। আড়চোখে একবার লেস্‌লির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার চোখে একটু যেন হাসির আভা ফুটে উঠেছে। মনে মনে বিরক্ত হলেন, শুষ্ককণ্ঠে বললেন, আপনি এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন না যে আপনার জরুরী আহ্বান পেয়েই হ্যামণ্ড আপনার বাড়িতে এসেছিল। লেস্‌লি কোনো জবাব দিল না, কিন্তু মনে হল কথাটা সে ভেবে দেখছে। জয়েস বললেন, অপরপক্ষ অতি সহজেই প্রমাণ করতে পারবে, আপনার বাড়ির কোনো চাকর ঐ চিঠি নিয়ে ওর বাংলোতে গিয়েছিল। আপনি এ-কথা কখনও যেন মনে করবেন না যে সংসারের আর সব লোক আপনার চেয়ে বোকা। যাদের মনে এখন পর্যন্ত কোনো রকম সন্দেহ প্রবেশ করেনি এই চিঠির কথা জানলে তারাও নানারকম সন্দেহ করতে শুরু করবে। চিঠির নকলখানা দেখে আমার নিজের কি ধারণা হয়েছে, সে-কথা আপনাকে নাই না বললাম। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আপনাকে দিয়েও আমি কিছু বলাতে চাই না। কিন্তু আপনার নিজের প্রাণরক্ষার জন্য যেটুকু বলা দরকার তা তো আপনাকে বলতেই হবে।

কথা শুনে মিসেস ক্রস্‌বি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। অ্যাঁ, তাহলে ওরা আমার ফাঁসির হুকুম দেবে?

শুধু আত্মরক্ষার জন্যই হ্যামণ্ডকে আপনি হত্যা করেছেন এ-কথা যদি আপনি প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে জুরী অবশ্যই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। জজসাহেবেরও আর কোনো উপায় থাকবে না, আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া। লেস্‌লির গলা দিয়ে তখন স্বর বেরোচ্ছে না। কোনোরকমে বলল, ওরা আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ করতে পারে।

কি প্রমাণ করতে পারে, সে তো আমি জানি না। আপনি জানেন।

আমি জানতে চাইও না। কিন্তু একবার তাদের সন্দেহের উদ্রেক হলে তারা নানারকম জেরা-প্রশ্ন করতে শুরু করবে। আর এ-সব নেটিভ চাকর-বাকরদের জেরা করলে শেষ পর্যন্ত কি বেরিয়ে যাবে, সেটা আপনিই বলতে পারেন।

হঠাৎ লেস্‌লির দেহ শিথিল হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। মিস্টার জয়েস ওকে ধরে ফেলবার আগেই ও ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল! জয়েস ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও জল নেই। লোকজন ডেকে শোরগোল করবার ইচ্ছে ছিল না। ওকে বেশ করে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ততক্ষণে ও একটু সামলে উঠুক। খানিক পরে ও যখন চোখ মেলে তাকাল তখন চোখে ওর কি ভয়ার্ত দৃষ্টি! বললেন, আর একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন, এখুনি সেরে উঠবেন।

লেস্‌লি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমাকে বাঁচান, আমাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচান।

তারপরে শুরু হল কান্না, সে কান্না কিছুতেই বাঁধ মানতে চায় না। ভদ্রলোক যথাসম্ভব ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। আচ্ছা, অবুঝ হলে তো চলবে না, নিজেকে একটু সামলে নিন।

আমাকে একমিনিট সময় দিন।

আশ্চর্য ওর মনের বল। কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় ও নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিল। এখন আগের মতো ওর শান্ত মূর্তি। বলল, এবার আমি উঠে বসি। জয়েসের সাহায্যে ও উঠে দাঁড়াল। উনি তাকে ধরে নিয়ে চেয়ারে বসালেন। খুব ক্লান্তস্বরে ও বলল, দু'মিনিট আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন।

আচ্ছা। মিস্টার জয়েস কয়েক মিনিট কিছুই বললেন না। অবশেষে লেস্‌লিই প্রথম কথা বলল, সেই চিঠিটা কোনোরকমে হাত করা যায় না।

হাঁ। তা চিঠিটা ওদের বিক্রী করবার উদ্দেশ্য না থাকলে কি আর ওরা আমাকে এসে চিঠির কথা বলত ?

সে চিঠি কার কাছে আছে ?

যে চীনে স্ত্রীলোকটি হ্যামণ্ডের বাড়িতে বাস করত তার কাছেই রয়েছে।

মুহূর্তের জন্য লেস্‌লির মুখ একটু রাঙা হয়ে উঠল।

ও কি অনেক টাকা দাবী করবে ?

স্ত্রীলোকটি নেহাৎ আনাড়ি নয়, কাজেই সে চিঠির মূল্য কতখানি সে বিষয়ে তার বেশ ধারণা আছে বলে মনে হয়। আমি তো মনে করি, অল্পস্বল্প টাকায় ও-চিঠি হাত করা যাবে না।

লেস্‌লি এবার বলল, আপনারা কি চান, আমার ফাঁসি হয় !

যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে তা হাত করা কি এতই সহজ মনে করেন ? এতো ঘুষ দিয়ে সাক্ষী ভাগানোর মতো। আমাকে এ জাতীয় কোনো কাজ করতে বলা আপনার অন্যায়।

তাহলে আমার কি হবে ?

ন্যায় বিচারে যা হবার তাই হবে।

ভয়ে আবার ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীরের ভেতর দিয়ে একটি মৃদু কম্পন বয়ে গেল। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। অবশ্যি আপনাকে অন্যায় কোনো কাজ করতে আমি বলছিনে।

ওর গলার স্বরটি একটু দ্রব হয়ে এসেছে। ও যে এতটা কাবু হবে মিস্টার জয়েস তা ভাবেননি। এখন সত্যি ওর জন্য মায়া হচ্ছে। চোখে কি মিনতিভরা দৃষ্টি ! ও প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। ভিক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে ওর এই চোখের চাউনি চিরকালের জন্য তাঁর বুকে ক্ষত হয়ে থাকবে। আর, যা হবার তো হয়েই গেছে, হ্যামণ্ডকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বহুকাল ব্যবসা করে করে মিস্টার জয়েসের ন্যায়-অন্যায়

বোধটা বোধ করি একটু ভোঁতা হয়ে এসেছিল। চোখ মুখ বুজে মনস্থির করে ফেললেন। কাজটা অবশ্যই অনুচিত তবু—। মনে মনে লেস্‌লির ওপরে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন—ওর জন্যেই তো। একটু ইতস্তত: করে বললেন, আপনার স্বামীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার সঠিক ধারণা নেই।

মিস্টার জয়েসের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে মুখ লাল করে বলল, তা, টিনের ব্যবসায় ওঁর বহু শেয়ার আছে, তা ছাড়া দু-তিনটে রবারের বাগানের অংশও রয়েছে। উনি চেষ্টা করলে টাকার যোগাড় করতে পারবেন।

কিন্তু কেন টাকার দরকার সে কথাটা তো তাকে বলতে হবে।

লেস্‌লি খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবল। বলল, উনি আমাকে খুবই ভালোবাসেন। আমার প্রাণরক্ষার জন্য উনি সব কিছু করতে রাজী হবেন। কিন্তু ওঁকে কি ঐ চিঠিখানা না দেখালেই নয়।

মুহূর্তের জন্য মিস্টার জয়েস একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, সেইটি লক্ষ্য করে লেস্‌লি বলতে লাগল, আমার নিজের জন্য আপনাকে কিছু করতে বলছি না। রবার্ট আপনার অনেক কালের বন্ধু। নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষ, কোনোদিন কারো অনিষ্ট করেনি—ও যাতে অযথা মনে কষ্ট না পায় সেইটুকু শুধু দেখবেন।

মিস্টার জয়েস ও-কথার কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লেস্‌লি তার স্বভাবসুলভ শোভনভঙ্গীতে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। ওর শুকনো ফ্যাকাশে মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই দীর্ঘ আলোচনার ধাক্কাটা ও এখনো সামলে উঠতে পারেনি। তথাপি ভদ্রতায় লেশমাত্র ত্রুটি নেই। বলল, আপনি আমার জন্য ঢের করেছেন। আপনাকে যে কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানিনে।

আপিসে ফিরে এসে মিস্টার জয়েস অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলেন,

কোনো কাজে হাত দিলেন না। বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলেন। বিচিত্র সব চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভিড় করছে। খানিক পরে দরজায় টোকার শব্দ শোনা গেল। মৃদু সাবধানী হাতের টোকা শুনেই বুঝতে পারলেন অঙ-চি-সেঙ। ভেতরে ঢুকে চীনা কেরানী বলল, টিফিন খেতে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি, জরুরি কোনো কাজ হাতে আছে কি না তাই জানতে এলাম।

না, তেমন কিছু নেই। মিস্টার রীডকে আবার আসতে বলেছিলে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি তিনটের সময় আসবেন।

বেশ।

আসি তবে, বলে চি-সেঙ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে আবার ফিরে এল। বললে, আমার বন্ধুকে বিশেষ কিছু বলবার থাকলে আমার কাছে বলতে পারেন।

কোন বন্ধুর কথা বলছ?

আজ্ঞে মিসেস ক্রস্‌বির সেই চিঠির সম্বন্ধে বলছিলাম।

ও, ঠিক ঠিক, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মিসেস ক্রস্‌বিকে আমি জিগগেস করেছিলাম। উনি বলছেন ও-রকম কোনো চিঠি উনি কক্ষনো লেখেন নি। ও চিঠি নিশ্চয় জাল। মিস্টার জয়েস পকেট থেকে চিঠির নকলখানা বার করে ওর হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

অঙ-চি-সেঙ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, আজ্ঞে তাহলে আমার বন্ধু যদি সরকারী উকিলের কাছে চিঠিখানা পাঠিয়ে দেন তাতে আপনার নিশ্চয় কোনো আপত্তি হবে না।

কিছুমাত্র না। তবে, চিঠিটা পাঠিয়ে তোমার বন্ধুর কি লাভ হবে আমি বুঝতে পারছি নে।

আজ্ঞে, আমার বন্ধু বলছেন ন্যায় বিচারের খাতিরেই চিঠিখানা বিচারকের গোচরে আনা কর্তব্য।

কারো কর্তব্য-কর্মে বাধা দেবার লোক আমি নই, চি-সেঙ।
উকিল এবং কেরানী একে অন্যের মুখের দিকে তাকালে। দুজনেরই মুখ গম্ভীর কিন্তু উভয়েই উভয়ের মনের কথা বেশ বুঝতে পারছে।
অঙ-চি-সেঙ বলল, আজ্ঞে, আপনার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে কিনা মামলার বিষয়টা আমি যতখানি ভেবে দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে ঐ চিঠি কোর্টে পেশ হলে আমাদের মক্কেলের পক্ষে খুবই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।
মিস্টার জয়েস বললেন, হতেই তো পারে। তোমার আইনের জ্ঞান সম্বন্ধে আমার বরাবরই উচ্চ ধারণা আছে।
সেজন্য আমি ভাবছিলাম কি—আমার বন্ধুর সাহায্যে ঐ চীনা স্ত্রীলোকটিকে যদি রাজী করান যেত তবে চিঠিখানা না হয় আমরাই হাত করবার চেষ্টা করতাম। করতে পারলে অনেক ফ্যাসাদ চুকে যায়।
মিস্টার জয়েস তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। একখানা ব্লটিং কাগজের টুকরোয় আপন মনে ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। একটু ভেবে বললেন, তোমার বন্ধুটি বোধহয় ব্যবসাদার মানুষ, কি হলে উনি চিঠিখানা হাতছাড়া করতে পারেন?
চিঠি তার কাছে নেই, ওটা রয়েছে সেই চীনা স্ত্রীলোকটির কাছে। আমার বন্ধু তার আত্মীয়। স্ত্রীলোকটি অশিক্ষিত, সে ঐ চিঠির মর্মও বোঝেনি, মূল্যও না। আমার বন্ধু বলাতেই—
কত উনি চান?
আজ্ঞে, দশ হাজার ডলার।
এঁ্যা, বলছ কি? মিসেস ক্রসবি দশ হাজার ডলার কোথায় পাবেন? আমি তোমাকে বলছি ওটা নিশ্চয় জাল চিঠি।
যথাসম্ভব জোর দিয়ে কথাগুলি বললেন, কিন্তু অঙ-চি-সেঙ মুখের

দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তাঁর উত্তেজনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, শান্তশিষ্ট নির্বিকার মুখে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, আমি জানি বেতং রবার এস্টেটের এক অষ্টমাংশের মালিক মিস্টার ক্রস্‌বি, অপর একটি রবার বাগানের এক ষষ্ঠাংশ শেয়ার ওঁর। উনি যদি চান তাহলে ঐ সম্পত্তি বন্ধক রেখে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারি।

তোমার দেখছি পরিচিত বন্ধুবান্ধব ঢের। যাকগে মিস্টার ক্রস্‌বিকে যদি টাকা দিতেই হয় তাহলে পাঁচ হাজার ডলারের বেশি আমি কখনো দিতে বলব না, কারণ ও চিঠি কোর্টে পেশ হলেও তার একটা সঙ্গত কারণ দেখানো খুব কঠিন হবে না।

আজ্ঞে, ঐ স্ত্রীলোকটির চিঠিটা বিক্রি করবার আদৌ ইচ্ছে নেই। আমার বন্ধুই তাকে অনেক করে রাজী করিয়েছে। কাজেই বিক্রি যদি করেই তো ঐ টাকার কমে কিছুতেই করবে না।

মিস্টার জয়েস বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে অঙ-চি-সেঙের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু *এই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টির ফলেও চীনা কেরানীর* মুখে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আগের মতোই অত্যন্ত সসম্ভ্রম ভঙ্গীতে সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার জয়েস লোকটিকে বেশ ভালো করেই চিনে নিয়েছেন। মনে মনে ভাবছিলেন, তুমি একটি কম ঘুঘু নও বাপু! বেশ একটা বড় রকম দাঁও মারতে চাচ্ছ, এর থেকে তোমার নিজের ভাগে কত পড়বে তাই ভাবছি। বললেন, বুঝতেই তো পারছ, দশ হাজার ডলার, চাট্টিখানি কথা নয় তো।

মিস্টার ক্রস্‌বি বোধ হয় চান না যে তাঁর স্ত্রীর ফাঁসি হয় কাজেই উনি নিশ্চয় টাকা দিতে রাজী হবেন।

মিস্টার জয়েস আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। চি-সেঙ লোকটা দেখা যাচ্ছে খোঁজ খবর অনেক রাখে। ক্রস্‌বি কি আছে না আছে

তার ক্ষমতা কতখানি সবই তার জানা। বেশ হিসেব করেই টাকার অঙ্কটা ধার্য করা হয়েছে।

সেই চীনা স্ত্রীলোকটি কোথায় থাকে?

আমার সেই বন্ধুর বাড়িতে আছে।

ওকে এখানে একবার আনতে পার?

আজ্ঞে, তার চাইতে বরং আপনিই ওর কাছে চলুন। বলেন তো আজ রাত্রেই আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি, চিঠিখানি আপনি তক্ষুনি পেয়ে যাবেন। তবে স্ত্রীলোকটি একেবারে অশিক্ষিত কাজেই ও চেক-টেক নিতে চাইবে না।

না, চেক দেব না, নগদ-নগদ ব্যাঙ্ক নোটই দেওয়া হবে।

কিন্তু দশ হাজারের কম হলে, গিয়ে লাভ নেই, মিথ্যে সময় নষ্ট হবে।

তা বুঝতে পারছি।

তাহলে টিফিনের পরে গিয়ে আমি আমার বন্ধুকে বলে আসব।

বেশ, ঐ কথা রইল। রাত দশটায় ক্লাবে এস, আমাকে গেট-এর বাইরেই পাবে।

যে আজ্ঞে, অঙ-চি-সেঙ নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। মিস্টার জয়েসও লাঞ্চের জন্য ক্লাবের দিকে রওনা হলেন। সেখানে রবার্ট ক্রসবির সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা আছে। যা ভেবেছিলেন তাই, ক্রসবি একটি টেবিলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেশ জমিয়ে বসেছে। মিস্টার জয়েস পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ওকে একটু মৃদু আকর্ষণ করে বললেন, তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে, যাবার আগে দেখা কর।

আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি। তোমার সময় হলেই ডেকো।

কি ভাবে কথাটা পাড়বেন মিস্টার জয়েস আগে থেকেই তা মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন। লাঞ্চের শেষে উনি ইচ্ছে করেই এক হাত ব্রিজ খেলায় বসে গেলেন। ক্লাব ক্রমে খালি হয়ে গেলে নিরালায় ওর সঙ্গে

কথা বলবেন এইটাই অভিপ্রায়। অল্পক্ষণ পরে ক্রস্‌বিও তাদের আড্ডায় এসে জুটল, পাশে বসে খেলা দেখতে লাগল। খেলা শেষ হয়ে গেলে খেলোয়াড়রা একে একে যার যার কাজে চলে গেল। ওরা দুজন ছাড়া এখন আর সবাই চলে গেছে।

মিস্টার জয়েস বললেন, আরে ভাই, একটা বড় মুশকিল বেধেছে। গলার স্বরে অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ না করে খুব সাধারণ ভাবেই কথাগুলি বললেন। দেখতে পাচ্ছি ঘটনার দিনে তোমার স্ত্রী হ্যামণ্ডকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে উনি হ্যামণ্ডকে ঐ রাত্তিরে আসতে লিখেছিলেন।

ক্রস্‌বি অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠল, এ হতেই পারে না। লেস্‌লি তো গোড়া থেকেই বলে আসচে হ্যামণ্ডের সঙ্গে ওর চিঠিপত্রের কোনো আদান-প্রদান ছিল না। আর আমি নিজেও জানি অন্তত দু'মাস আগে থেকে ওদের দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

তা, বললে কি হবে, চিঠিখানা যে রয়েছে। যে চীনা স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে হ্যামণ্ড বাস করছিল তার কাছেই ঐ চিঠিটি আছে। তোমার জন্মদিনে উনি কি একটা প্রেজেন্ট দেবেন স্থির করেছিলেন, হ্যামণ্ডকে দিয়ে ঐ জিনিসটি সংগ্রহ করা সহজ হবে ভেবে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঘটনার পরে উদ্বেগ-উত্তেজনায় তিনি সে-কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। তার ওপরে হ্যামণ্ডের সঙ্গে ইদানীং তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না, এ-কথা একবার বলে ফেলে শেষ পর্যন্ত আর আসল কথাটা স্বীকার করতে ওঁর সাহস হয়নি। এমন হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয় তবে কিনা এতে আবার একটা নতুন গেরো বাধল।

ক্রস্‌বি কথার কোনো জবাব দিল না। ওর মুখে চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না দেখে মিস্টার জয়েস একদিকে বেশ আরাম বোধ করলেন, অপরদিকে আবার মনে মনে রাগও হল।

লোকটা আচ্ছা বোকা তো! এমন লোককে নিয়ে পারা যায়? তবে কিনা এই দুর্ঘটনার পর থেকে বেচারা যা ভুগছে তাতে ওর ওপরে মায়া না হয়ে যায় না। লেস্‌লি মিস্টার জয়েসের ঐ কোমল স্থানটিতেই স্পর্শ করে বলেছে, আমার নিজের জন্য কিছু করতে বলছিনে, আপনি শুধু আমার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে যা করবার করুন।

এখন বুঝতেই তো পারছ ঐ চিঠি যদি সরকার পক্ষের হাতে পড়ে তাহলে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার স্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছেন আর ঐ মিথ্যের একটা সঙ্গত কারণও তাঁকে দেখাতে হবে। হ্যামণ্ড অনাহুত এসে বাড়িতে চড়াও হয়েছিল বলা এক কথা আর আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল বললে ব্যাপার দাঁড়ায় অন্য রকম। এতে জুরীদের মনে নানা রকমের সন্দেহের উদয় হতে পারে।

মিস্টার জয়েস একটু ইতস্তত: করলেন; এবারে আসল কথাটা পাড়তে হবে। নেহাৎ হাসবার সময় নয় বলেই, নইলে মনে মনে তাঁর হাসি পাচ্ছিল। কারণ যে লোকটার জন্য তিনি এত বড় সাংঘাতিক কাজ করতে যাচ্ছেন সে এর গুরুত্ব কিছুই বুঝতে পারছে না। বড় জোর ভাবছে এ-সব ক্ষেত্রে উকিল মাত্রেই যা করে থাকে মিস্টার জয়েস ঠিক তাই করছেন।

রবার্ট, তুমি শুধু আমার মক্কেল নও, বন্ধুও বটে। আমি তোমাকে বলছি ঐ চিঠি আমাদের হাত করা একান্ত দরকার। তবে কিনা এতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সেজন্যই তোমাকে বলতে হচ্ছে নইলে যা করবার আমিই করতাম।

কত টাকা চাই?

দশ হাজার ডলার।

দশ হাজার! এ যে অনেক টাকার মামলা। একে ব্যবসায় মন্দা তার

ওপরে এটা ওটা—মোট কথা আমার যা কিছু আছে সব বিকিয়ে দিলে তবে তোমার দশ হাজার হতে পারে।

টাকাটা এক্ষুনি সংগ্রহ করতে পার?

তা হয়তো পারি। আমার বন্ধু চার্লি মেডোজ আমার শেয়ারের ওপর ঐ টাকা দিতে রাজী হবে মনে করি।

তাহলে টাকাটা নাও গিয়ে।

কিন্তু এ কি না হলেই নয়?

তোমার স্ত্রীকে খালাস করতে চাও তো—

ক্রস্‌বির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, মুখে কথা যোগাচ্ছিল না, কোনো রকমে বললে, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। চিঠির রহস্যটা লেস্‌লি হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারবে। তুমি কি বলতে চাও ওরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে? একটা ক্রিমিকীটকে হত্যা করেছে বলে ওর ফাঁসি হবে বলছ?

না, ফাঁসি নিশ্চয় হবে না। তবে দু'তিন বছর জেল হয়ে যেতে পারে।

ক্রস্‌বি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, মুখ তার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিন বছর! আঁা?

এতক্ষণে ও যেন ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করেছে। ওর মনের অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুৎ চমকে খানিকটা আলো দেখা দিয়েছে, তাতে কিছু কিছু যেন ও আভাসে দেখতে পাচ্ছে, খুব স্পষ্ট করে না হলেও। জিগগেস করল, আচ্ছা লেস্‌লি আমাকে কি প্রেজেণ্ট দেবে বলেছিল?

বলছিলেন তোমাকে একটা বন্দুক প্রেজেণ্ট করবার ইচ্ছে ছিল।

ক্রস্‌বির মুখ আবার টকটকে লাল হয়ে উঠল। বলল, যাক্‌গে, কখন তোমার টাকা চাই, বল। গলার স্বরটা বিকৃত শোনাচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো অদৃশ্য হাত যেন ওর টুঁটি চেপে ধরেছে।

আজই রাত্তির দশটায় টাকাটা দিতে হবে। পারতো সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ টাকা সমেত আমার আপিসে চলে আসতে পার।

স্ত্রীলোকটি তোমার কাছে আসচে নাকি?

না, আমিই তার কাছে যাচ্ছি।

আচ্ছা, টাকা নিয়ে ঠিক সময়ে আসব। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

মিস্টার জয়েস অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। তোমার আবার যাবার কি দরকার? ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিলেই ভালো হতো না? কিন্তু টাকাটা তো আমাকেই দিতে হচ্ছে, কাজেই আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

মিস্টার জয়েস কি আর করেন। হতাশাজনক ভঙ্গী করে উঠে দাঁড়ালেন, বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

রাত দশটায় ঐ ক্লাবেই দুজনের দেখা। ক্লাব তখন খালি হয়ে গেছে। মিস্টার জয়েস বললেন, সব ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, টাকা আমার পকেটেই রয়েছে।

চল তাহলে যাওয়া যাক।

দুজনে একসঙ্গে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল। পার্কের ধারে মিস্টার জয়েসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসতেই একটা বাড়ির আড়াল থেকে অং-চি-সেঙ এগিয়ে এসে ড্রাইভারের পাশে বসল। ড্রাইভার তার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চালাতে লাগল। হোটেল ডি লা য়ুরোপ ছাড়িয়ে সেইলার্স হোমের পাশ দিয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রিটে। রাস্তার দু'ধারে চীনেদের দোকানপাট তখনো খোলা রয়েছে, নিষ্কর্মার দল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রিক্সা, মোটর, ঘোড়ার গাড়ির ভিড় তখনও পুরোদমে চলছে। এদের গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। চি-সেঙ মুখ ফিরিয়ে বলল, গাড়ি এখানে রেখে বাকি পথটুকু হেঁটে গেলে ভালো হয়।

তিনজনেই গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চলতে লাগল, চি-সেঙ আগে আগে

ওরা দুজন পেছনে। সামান্য একটু পথ এগিয়েই চীনা কেরানী বলল, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি ভেতরে গিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আসচি। বলেই রাস্তার ধারে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। তিন চারজন চীনাম্যান দোকানের ভেতরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। চীনাদের এ-সব দোকান বড় অদ্ভুত, জিনিসপত্রের কোনো বালাই নেই। কি জিনিসের ব্যবসা চলছে দোকানের চেহারা দেখে তা বোঝবার জো নেই। সুটপরা মোটা মতো একটি লোকের সঙ্গে চি-সেঙ দুটো-একটা কি কথা বলল। লোকটা অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একবার রাস্তার দিকে তাকাল তারপরে একটা চাবি বের করে চি-সেঙ-এর হাতে দিল। চি-সেঙ বেরিয়ে এসে ওদের ইশারা করে বলল, আসুন। দোকানটার পাশ ঘেঁষে একটা দরজা রয়েছে। চীনা কেরানীর পেছন পেছন ওঁরা দুজনও সেই দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকলেন। কয়েক পা এগুতেই এক ধাপ সিঁড়ি। চি-সেঙ বলল, এক মিনিট দাঁড়ান, আমি দেশলাই জ্বালছি। এই যে আসুন, ওপর তলায় চলুন। দেশলায়ের আলোতে সামান্যই লাভ হল, অন্ধকারে কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে উঠতে লাগল। দোতলায় উঠে একটি ঘরের তালা খুলে চি-সেঙ ভেতরে ঢুকল। একটি গ্যাসের বাতি জ্বেলে বলল, আসুন, আপনারা ভেতরে আসুন।

চৌকো মাপের ছোট একটি ঘর, তাতে একটি মাত্র জানলা। আসবাব পত্র বিশেষ কিছু নেই। মাদুর পাতা ছোট দুটি চীনা খাটিয়া আর এক কোণে একটা সিন্দুক তাতে প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে। সিন্ধুকের ওপরে আফিং এর নল লাগানো একটি ট্রে। ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় আফিং এর বেশ একটু ঝাঁঝালো গন্ধ মিশে আছে। ওদের দুজনকে বসিয়ে অঙ-চি-সেঙ সিগারেটের কৌটো বাড়িয়ে দিল। পরমুহূর্তে দরজা খুলে সেই মোটা চীনাম্যানটি প্রবেশ করল যাকে এইমাত্র ওঁরা দোকানে দেখে এসেছেন। লোকটি চমৎকার ইংরিজিতে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে

চি-সেঙ এর পাশে গিয়ে বসল। বলল, চীনা স্ত্রীলোকটি এক্ষুনি আসছে। ইতিমধ্যে দোকানের একটি ছোকরা ট্রে'তে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। চীনাম্যানটি অতিথিদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। ক্রস্‌বি চা খেতে রাজী হল না। ঘরের মধ্যে চীনাম্যান দুটি ফিস্‌ফিস্‌ করে নিজেদের ভাষায় কি বলছে, ক্রস্‌বি আর জয়েস চুপচাপ বসে। খানিক বাদে বাইরে কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মোটা চীনাম্যানটি এগিয়ে গিয়ে দরজাটি খুলে ধরতেই একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করল। মিস্টার জয়েস স্ত্রীলোকটিকে বেশ লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন। হ্যামণ্ডের মৃত্যুর পর থেকে এর কথা ঢের শুনে আসচেন কিন্তু এ-পর্যন্ত ওকে দেখেন নি। স্ত্রীলোকটির বয়স নেহাৎ কম নয়, গোলগাল ভরাট মুখে পাউডার রুজের ছড়াছড়ি, কালো সরু লাইনে ভুরু আঁকা। কিন্তু সবটা মিলিয়ে চেহারায় একটি দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা আছে। পরনে শাদা রঙের স্কার্ট-এর ওপরে নীল রঙের জ্যাকেট, কিন্তু পায়ে চীনা সিল্কের চটি— পোশাকটা খাঁটি য়ুরোপীয়ও নয় খাঁটি চীনাও নয়। স্ত্রীলোকটির সর্বাঙ্গে সোনার গহনা—গলায় হার, হাতে চুড়ি, কানে মাকড়ি, চুলে সোনার কাঁটা। ধীর পদক্ষেপে অঙ-চি-সেঙ-এর পাশে এসে বসল, চোখ তুলে শ্বেতাঙ্গ দুজনকে এক পলক দেখে নিল।

মিস্টার জয়েস জিগগেস করলেন, চিঠিখানা এর কাছে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ক্রস্‌বি কোনো কথা না বলে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করল, সব পাঁচশ ডলারের নোট। এক এক করে কুড়িখানা গুণে চি-সেঙ-এর হাতে দিল।

ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।

চীনা কেরানী নোট ক'খানা গুণে মোটা চীনাম্যানটির হাতে দিল, বললে. আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আছে।

চীনাম্যানটি নিজে একবার গুণে নিয়ে নোটগুলো পকেটে রাখল। স্ত্রীলোকটিকে চাপা গলায় কি যেন বলল, অমনি সে জামার তলা থেকে একখানি চিঠি বার করে চি-সেঙ-এর হাতে দিল। চি-সেঙ চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই চিঠি। বলে মিস্টার জয়েসের হাতে কাগজখানা দিতে যাচ্ছিল। ক্রসবি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে নিল, দেখি, দেখি, আমি একবার দেখেনি। মিস্টার জয়েস হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, ওটা আমার কাছেই থাক।

ক্রস্‌বি বেশ ধীরে সুস্থে কাগজখানা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিলে, বললে, না, এটি আমার কাছেই থাকবে, এর জন্যে ঢের দাম দিতে হয়েছে আমাকে।

মিস্টার জয়েস আর উচ্চবাচ্য করলেন না। চীনা তিনজন নীরবে ওদের কথা শুনছিল, কি ভাবছিল ওরাই জানে। মুখ দেখে ওদের মনের কথা বোঝা ভার। মিস্টার জয়েস উঠে দাঁড়ালেন। অঙ-চি-সেঙ বললে, আমার কাছে আর কোনো দরকার আছে?

না। উনি বেশ বুঝতে পারছেন এখন ওদের ভাগ বাটোয়ারার সময়। তাঁর কেরানীটি নিজের অংশ আদায় করবার জন্য কিছুক্ষণ থেকে যেতে চায়। ক্রস্‌বিকে বলল, তাহলে এখন যাওয়া যাক।

ক্রস্‌বি নীরবে উঠে দাঁড়াল। চীনাম্যানটি এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে। চি-সেঙ একটি মোমবাতি হাতে সিঁড়ি দিয়ে পথ দেখিয়ে চলল। দুজন চীনাম্যানই রাস্তা পর্যন্ত ওঁদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। স্ত্রীলোকটি তখন ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকছে।

মিস্টার জয়েস জিগগেস করলেন, চিঠিখানা দিয়ে তুমি কি করবে?

রেখে দেব।

গাড়ির কাছে এসে বললেন, এস তোমাকে পৌঁছে দি। ক্রস্‌বি মাথা নেড়ে বলল, না, আমি হেঁটেই যাচ্ছি। চলতে গিয়ে একটু ইতস্তত:

করে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যামণ্ড যেদিন মারা যায় সেদিন সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম কেন, জানো? নতুন একটা বন্দুক কেনবার জন্য, শুনেছিলাম একটি লোক তার বন্দুক বিক্রি করছে তাই। আচ্ছা, আসি তবে, গুড নাইট্। ক্রস্‌বি দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মামলা সম্বন্ধে মিস্টার জয়েস যা বলেছিলেন তাই হল। জুরীরা আগে থেকেই মন স্থির করে নিয়েছে মিসেস ক্রসবিকে খালাস দেবে বলে। লেস্‌লি নিজেই তার স্বপক্ষে সাক্ষী দিল। সোজা শাদামাঠা কথায় ঘটনার বিবরণ বলে গেল। সরকার পক্ষের কৌঁসুলিটি ভালো মানুষ, আসামীর শাস্তি হয় এটা তিনি চান না। নিতান্ত নিরুৎসুক ভাবে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তারপরে অভিযোগ সপ্রমাণের জন্য যে বক্তৃতা করলেন—সেটা আসামীর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং পক্ষেই গেল। জুরীদের অভিমত ব্যক্ত করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য, চারদিকে বিরাট উল্লাসধ্বনি উঠল। জজসাহেব মিসেস ক্রসবিকে মুক্তিদান করে ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানালেন।

হ্যামণ্ডের এই ব্যাপারটাতে মিসেস জয়েসের মনে বিষম ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। তিনি স্বভাবতই অতিশয় বন্ধুবৎসল, আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন লেস্‌লি মুক্তি পাওয়া মাত্র ওদের স্বামী-স্ত্রী দুজনকে কিছুদিন ওঁর নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন। যে বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে লেস্‌লি বেচারী আবার সেই বাড়িতেই গিয়ে উঠবে, এ হতেই পারে না। মামলা যখন শেষ হল তখন বেলা সাড়ে বারোটা। কোর্ট থেকে সদলবলে জয়েসদের বাড়িতে পৌঁছে দেখে সেখানে বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন হয়েছে। ককটেলেরও ব্যবস্থা রয়েছে, মিসেস জয়েস সোৎসাহে লেস্‌লির স্বাস্থ্য কামনা করে পান করলেন। উনি অমনিতেই খুব মিশুকে ফুর্তিবাজ মেয়ে আজকে বিশেষ করে আনন্দ

আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। একলাই কথা বলে সবাইকে মাত করে রেখেছিলেন, আর সবাই কিন্তু চুপচাপ। ওঁর নিজের কাছে সেটা বিশেষ অস্বাভাবিক মনে হয়নি, কারণ তাঁর স্বামীটি বরাবরই স্বল্পভাষী আর ক্রস্‌বিরা দুজনেই তো অতিশয় ক্লান্ত হয়ে আছে, তা হবেই তো বেচারীদের ওপর দিয়ে যা ঝড় গেছে! লাঞ্চ টেবিলে উনি একাই বকবক করে গেলেন। ভোজন-পর্ব সমাধা হলে কফি এল।

মিসেস জয়েস তাঁর স্বাভাবিক ফুর্তির সুরে বললেন, এখন বাপু তোমরা একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে নাও। বিকেলের দিকে চা খেয়ে আমি গাড়ি করে তোমাদের একবার সমুদ্রের হাওয়া খাইয়ে আনব।

মিস্টার জয়েস কদাচিৎ বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে থাকেন। আহার সমাধা করেই তিনি আপিসে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

ক্রস্‌বি বলল, মিসেস জয়েস, আমি বড়ই দুঃখিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারছিনে। আমাকে এক্ষুনি আমার বাগানে ফিরে যেতে হবে।

মিসেস জয়েস অবাক হয়ে বললেন, না, না, সে কি হয়। আজকে যাওয়া হয় না।

হ্যাঁ, আজকেই এবং এক্ষুনি যেতে হবে। আজ কতদিন ধরে কাজ কর্ম দেখাশোনা হচ্ছে না। এ-ছাড়া আমার খুব জরুরী দরকারও রয়েছে। তবে লেসলিকে যদি আপাতত আপনার কাছে রেখে দেন তবে খুবই উপকার হয়। পরে বরং কোথায় যাওয়া না যাওয়া স্থির করা যাবে।

মিসেস জয়েস ক্রস্‌বিকে থেকে যাবার জন্য আরেকবার চাপাচাপি করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বামী বাধা দিয়ে বললেন, আহা, ওর জরুরী দরকার থাকলে ও যাবে না?

মিস্টার জয়েস এত জোর দিয়ে কথাগুলো বললেন যে তাঁর স্ত্রীও একটু চমকে উঠলেন। তিনি আর কোনো কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

ক্রস্‌বি আবার বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন, আমাকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে নইলে সন্ধ্যের আগে পৌঁছতে পারব না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, লেস্‌লি, এস না, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।

নিশ্চয়। স্বামী-স্ত্রীতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মিসেস জয়েস বললেন, এ বড্ড অবিবেচকের মতো কাজ হল। ওঁর বোঝা উচিত ছিল যে এখন কিছুদিন ওঁর লেস্‌লির কাছে-কাছে থাকা উচিত।

মিস্টার জয়েস বললেন, নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদ না থাকলে ও অমনি চলে যেত না, এটি তুমি জেনে রাখ।

কী জানি, হবে হয়তো। যাক দেখিগে লেস্‌লির ঘরটা ঠিক হল কিনা। ও বেচারীর এখন যথেষ্ট বিশ্রাম আর ফুর্তির প্রয়োজন।

মিসেস জয়েস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই শোনা গেল ক্রস্‌বির মোটর বাইক প্রচণ্ড শব্দ করে খোয়া-বাঁধানো বাগানের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিস্টার জয়েস ভোজনকক্ষ ছেড়ে বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখেন লেস্‌লি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, হাতে একখানা খোলা চিঠি। চিঠিখানা দেখেই উনি চিনতে পারলেন। লেস্‌লির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ওর মুখ মৃতের মুখের মতো বিবর্ণ, রক্তলেশহীন। মিস্টার জয়েসকে দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, ও সব জানে— !

মিস্টার জয়েস এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলেন। একটি দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়ে কাগজখানায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। কাগজটি পুড়ে কুঁকড়িয়ে কালো হয়ে ওঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। দুজনেই খানিকক্ষণ পোড়া কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে জয়েস পায়ে মাড়িয়ে সবটুকু ছাই করে দিলেন। এবার ওর দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, হ্যাঁ, ও কি জানে, শুনি ?

লেস্‌লি কয়েক মুহূর্ত মিস্টার জয়েসের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চোখের চাউনিটা অদ্ভুত তাতে খানিকটা হতাশা খানিকটা বা বিদ্রূপের আভাস। বললে, হ্যামণ্ড যে আমার প্রণয়ী ছিল ও তা বুঝতে পেরেছে।

মিস্টার জয়েস কিছুই বললেন না, নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। লেস্‌লি বলে যেতে লাগল, আজ কয়েক বছর ধরেই আমাদের এই সম্পর্ক, সেই ও লড়াই থেকে ফিরে আসা অবধি। অবশ্যি আমরা যথাসাধ্য সাবধান হয়েই চলতাম। ভাবে ভঙ্গীতে আমি সব সময়ে দেখাতাম যেন লোকটাকে একেবারে পছন্দ করিনে। আর ও খুব কমই আমাদের এখানে যাওয়া আসা করত। একটি স্থান স্থির করে নিয়েছিলাম, সেখানে গোপনে দুজনে সাক্ষাৎ করতাম সপ্তাহে অন্তত দু'তিন বার। রবার্ট কাজে-কর্মে কখনো সিঙ্গাপুরে গেলে বেশ একটু রাত্তির করে, চাকর বাকর শুয়ে পড়লে পর ও আমাদের বাংলোতে আসত। যাক্‌, দেখা সাক্ষাৎ সব সময়েই হতো কিন্তু একটি প্রাণী কোনোদিন আমাদের সন্দেহ করেনি। বেশ কাটছিল—তারপরে এই বছরখানেক আগে থেকে দেখছি ওর কেমন একটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমটায় ঠিক কিছু বুঝতে পারিনি। ভাবতাম, কি জানি তবে কি আমার প্রতি ওর আর আকর্ষণ নেই? কিছু বিশ্বাস হতো না। ও নিজেও অস্বীকার করত, বলত পাগল হয়েছ! এদিকে আমার অসহ্য হয়েছে, দু-একদিন তো ওর সামনে কেঁদে কেটে একাকার করেছি। মাঝে মাঝে মনে হতো ও দস্তুরমতো আমাকে ঘৃণা করে। ওঃ কতদিন ধরে আমি কি যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি আপনাকে তা বোঝাতে পারব না। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম ও আমাকে আর চায় না, কিন্তু ওকে ছেড়ে দিতে যে আমার প্রাণে সয় না। আমি যে তখন একেবারে ডুবেছি, ওকে মন প্রাণ সব দিয়েছি। সেই আমার প্রাণ, তাকে ছেড়ে কেমন করে বাঁচি।

ঠিক সেই সময়ে কিনা শুনতে পেলাম সে নাকি একটি চীনা স্ত্রীলোককে নিয়ে বাস করছে। প্রথমটায় কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। শেষটায় নিজে গেলাম, স্বচক্ষে দেখে এলাম সেই চীনা স্ত্রীলোকটাকে। গ্রামের পথ দিয়ে সেজেগুজে হেঁটে চলেছে—হাতে চুড়ি, গলায় নেকলেস। মোটা ধুমসী চেহারা, বয়স আমার চাইতে বেশি, বলতে গেলে বুড়ি। কি লজ্জা, কি লজ্জা! রাজ্যশুদ্ধ সবাই জানে ও তার রক্ষিতা। মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল, ভাবে বোঝা গেল আমিও যে তার প্রণয়িনী সে তা বেশ ভালো করেই জানে। উপায়ান্তর না দেখে ওকে ডেকে পাঠালাম। ওকে লিখলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া চাই। সে চিঠি তো আপনি দেখেইছেন। মাথামুণ্ডু কি যে লিখেছিলাম তার ঠিক নেই, তখন কি আমার মাথার ঠিক আছে! দশদিন তাকে দেখিনি, আমার কাছে সে এক যুগ। মনে আছে শেষ যেদিন দেখা, আসবার সময় সে আমাকে বুকে চেপে আদর করে চুমু খেল, বলল, বাজে কথা নিয়ে মন খারাপ কর না। এখন বুঝতেই তো পাচ্ছেন আমার কাছ থেকে সোজা গিয়েই ও আবার ঐ মেয়েটাকে এমনি করেই আদর করেছে।

পাগলায় অথচ খুব উত্তেজিত স্বরে ও কথা বলে যাচ্ছিল। বলা শেষ হলে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, কিন্তু রুদ্ধ আক্রোশে ও তখনও কাঁপছে।

আর সেই সর্বনেশে চিঠিটা! দুজনেই এত সাবধান ছিলাম, কোনোদিন যদি একটা কথা লিখেছি, ও পড়ে তক্ষুনি তা ছিঁড়ে ফেলেছে। কেমন করে জানব এই চিঠিটা ও রেখে দিয়েছে? চিঠি পেয়ে তো ও এল। ওকে বললুম ঐ চীনা মেয়েটার কথা আমি সব শুনেছি। প্রথমটায় ও স্বীকার করতে চায় না, বলে লোকে মিথ্যা নিন্দে রটিয়েছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ক্রোধে তখন আমি জ্ঞানশূন্য। কি যে

বলেছি আর না বলেছি তার ঠিক নেই। পারলে তখন ওকে আমি ছিঁড়ে খাই। আর ছেড়েও দিই নি। বাক্যাঘাতে ওকে তচনচ করেছি, অপমানের একশেষ করেছি, আর একটু হলে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতাম! শেষটায় সেও গেল ক্ষেপে, বলল, আমি নাকি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছি, আমার মুখদর্শন করবার আর তার ইচ্ছে নেই। ওকে নাকি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছি। তারপরে চীনা মেয়ের কথাটা নিজ মুখেই স্বীকার করলে। ওর সঙ্গে অনেক কাল থেকে তার সম্পর্ক—সেই লড়াইয়ের আগে থেকে। একমাত্র সেই স্ত্রীলোকটিকেই সে জীবনে ভালোবেসেছে—আর যে-সব মেয়ের সঙ্গে মিশেছে সে কেবল এক-আধটু ফুর্তির জন্য। ভালোই হল, আমি সব জেনে ফেলেছি, এখন সে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে কি যে হয়েছে আমি জানিনে। আমি তখন জ্ঞানহারা, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। রিভলবারটা তুলে নিয়ে গুলি করলুম। চীৎকার করে উঠল, তাতেই বুঝলুম গুলি লেগেছে। টলতে-টলতে ও বারান্দার দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি ওর পেছন-পেছন ছুটে গিয়ে একধার থেকে গুলি করে যেতে লাগলাম যতক্ষণ না রিভলবারের গুলি নিঃশেষ হল।

কথা শেষ করে ও বসে হাঁপাতে লাগল। ওর ক্রুদ্ধ হিংস্র মূর্তি বীভৎস দেখাচ্ছে, মানুষ বলে চেনাই ভার। এমন শান্তশিষ্ট মার্জিত মেয়েটির মধ্যে যে এতখানি হিংস্রতা থাকতে পারে সে কথা কে ভেবেছিল ওর মূর্তি দেখে মিস্টার জয়েস ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। উনি একেবারে হতভম্ব। এ তো মানুষের মুখ নয়, একটা বীভৎস মুখোশ পরে কে যেন কথা বলবার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে কার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মিসেস জয়েস লেস্লিকে ডাকছেন, লক্ষ্মী ভাই, এদিকে এস। তোমার ঘর ঠিক করে দিয়েছি শুয়ে পড়। তুমি নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছ।

মিসেস ক্রস্‌বির মুখের ভাব ক্রমে কোমল হয়ে এল। মুখের প্রতি রেখায় যে হিংস্রতা ফুটে উঠেছিল ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে গেল, যেন কে অতি যত্নে হাত দিয়ে মুছে মসৃন করে দিয়েছে। মুখের রঙটি তখনও একটু পাংশু কিন্তু ঠোঁটে চমৎকার মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে। সেই বীভৎস [মূ]র্তিটা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে, সুমুখে বসে আছে চিরদিনের সেই অতি ভদ্র, অতি মার্জিত সম্ভ্রান্ত মহিলাটি।

[ব]ন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলল, এই যে যাচ্ছি ভাই, ডরোথি। [তো]মাকে আবার মিছিমিছি খাটিয়ে মারছি।

—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত





মুখের কাটা দাগ

মুখের কাটা দাগটার জন্যে লোকটিকে আমি প্রথম লক্ষ্য করি। রগ থেকে চিবুক পর্যন্ত চওড়া লাল দাগটা অর্ধচন্দ্রাকার কাটা। এটা কোনো প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন সন্দেহ নেই। আঘাতটা গোলার টুকরোর না তলোয়ারের তাই ভাবছিলাম। গোলগাল মোটাসোটা হাসিখুশি মুখে দাগটাও কেমন বেমানান। চেহারায় তার বিশেষত্ব কিছু নেই, মুখের ভাবও সরল। তার মেদবহুল শরীরে মুখটা যেন ঠিক খাপ খায় না। খুব শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথায় সাধারণের চেয়ে লম্বা। একটা অত্যন্ত খেলো ছাই রঙের কোট প্যান্টালুন, একটা খাকি শার্ট আর মাথায় একটা দোমড়ান 'সমব্রেরো' ছাড়া আর কিছু তাকে কখনো পরতে দেখিনি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধার দিয়েও যায় না। গুয়াতামালা শহরের প্যালেস হোটেলে 'ককটেল' খাবার সময় প্রতিদিন সে আসত, তারপর ধীরে সুস্থে 'বারের' এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে লটারির টিকিট বিক্রি করত। জীবিকা অর্জনের পন্থাটা তার মোটেই সুবিধের বলা যায় না, কখনো তার কাছে কাউকে কিছু কিনতে দেখিনি। তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মদ খাবার নিমন্ত্রণ সে পেত। নিমন্ত্রণ সে প্রত্যাখ্যান কখনো করত না। টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে তার দুলে-দুলে চলবার ধরন দেখে মনে হতো পায়ে হেঁটে বহুদূর যাওয়া তার অভ্যাস। প্রত্যেক টেবিলে থেমে একটু হেসে সে তার বিক্রি করবার টিকিটগুলোর নম্বর জানিয়ে দিত, তারপর কেউ গা না করলে তেমনি একটু হেসে সরে যেত। মনে হতো সব সময়ই নেশায় সে চুর হয়ে আছে।

গুয়াতামালার প্যালেস হোটেলে বড় ভালো 'ড্রাই মার্টিনি' দেয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পরিচিত একজনের সঙ্গে 'বারে' দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় লোকটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। এখানে আসা অবধি এই নিয়ে কুড়িবার সে আমার কাছে টিকিট বেচবার চেষ্টা করলে। কিন্তু আমার সঙ্গী প্রসন্নভাবে মাথা নুইয়ে বললেন, "কোয়েতাল, জেনারেল। জীবন কেমন কাটছে?"

"মন্দ নয়, ব্যবসায় বিশেষ সুবিধে নেই, তবে এর চেয়ে খারাপও হতে পারত।"

"কি খাবেন বলুন, জেনারেল?"

"একটা ব্র্যাণ্ডি।"

এক ঢোকে সেটা খেয়ে নিয়ে জেনারেল গ্লাশটা নামিয়ে রাখল, তারপর মাথা নুইয়ে আমার সঙ্গীকে বললে, "গ্রাৎসিয়া। হাস্‌টা লুইয়ে গো।"

এবার সে অন্যদের কাছে টিকিট বিক্রি করতে গেল।

জিগগেস করলাম, "আপনার বন্ধুটি কে? মুখের কাটা দাগটা তো ভয়ঙ্কর!"

"ওর চেহারা কিছু ওতে খোলেনি, না? নিকারাগুয়া থেকে ও নির্বাসিত। লোকটা গুণ্ডা আর ডাকাত বটে, কিন্তু আসলে বদ নয়। মাঝে মাঝে দু'চার 'পেসো' ওকে আমি দিই। ও বিদ্রোহীদের সেনাপতি ছিল। গুলি বারুদ ফুরিয়ে না গেলে রাজত্ব উল্টে দিয়ে ওই আজকে যুদ্ধমন্ত্রী হতো। গুয়াতামালায় ওকে আর লটারির টিকিট বিক্রি করতে হতো না। দলে লোকজন যা ছিল সবশুদ্ধ ও তারপর ধরা পড়ে। সামরিক বিচারও হয়। এ-সব দেশে ও-ধরনের বিচার খুব চটপটই সারা হয়। বিচারে ঠিক হয় যে পরের দিন সকালে তাকে গুলি করে মারা হবে। ধরা পড়বার সময়েই তার ভাগ্যে কি আছে সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। সমস্তরাত অন্য সকলের সঙ্গে জুয়া খেলে কাটায়। সবশুদ্ধ

ছিল তারা পাঁচজন। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে তারা পোকার খেলে ওর কাছেই শুনেছি যে জীবনে জুয়ার ভাগ্য খারাপ ওর কখনো যায়নি। শুধু গোলাম পর্যন্ত তাশ নিয়ে তারা খেলছিল কিন্তু বার ছয়েকের বেশি ভালো হাত সে পায়নি। সারারাত হারের পর তার শুধু হারই হয়েছে। সকাল বেলা প্রাণদণ্ডের জন্যে সিপাইরা যখন তাকে জেলের কুঠুরী থেকে নিয়ে যাবার জন্যে এল তখন পর্যন্ত যত দেশলাই সে হেরেছে সারা জীবনেও সাধারণ কোনো লোক তা ব্যবহার করে ফুরোতে পারে না।

"জেলের প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে তাদের পাঁচজনকে পাশাপাশি একটা দেয়ালের ধারে দাঁড় করান হল। গুলি যারা করবে তারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ, আমাদের বন্ধু তাই প্রধান অফিসারকে ডেকে জিগগেস করলে, তাদের এমন করে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মানেটা কি? প্রধান অফিসার তাতে জানালে যে সরকারী সৈন্যদের যিনি সেনাপতি তিনি নিজে এ-ব্যাপারে উপস্থিত থাকতে চান। তাঁর আসার জন্যেই তারা অপেক্ষা করছে।

"'তাহলে আমি আর একটা সিগারেট খেতে পারি,' আমাদের বন্ধু বলে উঠল, 'সময়মতো কোনো কিছু করা এই সেনাপতির স্বভাবই নয়।'

"কিন্তু সে সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই সেনাপতি তাঁর এ. ডি. সি-কে নিয়ে হাজির হলেন। সেনাপতি আর কেউ নয় সান ইগনাসিও। জানিনা তাঁর সঙ্গে আপনার কখনো দেখা হয়েছে কিনা। নিয়মমতো গোড়ায় যা কিছু করবার সব শেষ হলে সান ইগনাসিও প্রাণ দণ্ডিতদের জিগগেস করলেন মৃত্যুর আগে তাদের কারুর কিছু চাইবার আছে কিনা। পাঁচজনের ভেতর চারজন মাথা নাড়ল কিন্তু আমাদের বন্ধু বললে, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী কাছে আমি বিদায় নিতে চাই।'

"'বুয়েনো,' সেনাপতি বললেন, 'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কোথায় তিনি?'

"'জেলের দরজায় অপেক্ষা করছে।'

"'তাহলে তো পাঁচমিনিটের বেশি দেরি হবে না।'

"'অতও হবে না সেনর জেনারেল,' আমাদের বন্ধু বললে।

"সেনাপতি আদেশ দিলেন, 'ওকে একধারে সরিয়ে রাখ।'

"দুজন সিপাই আমাদের বিদ্রোহী বন্ধুকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সেনাপতি মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করায় বন্দুকধারী সিপাইদের প্রধান অফিসার গুলি ছোঁড়ার আদেশ দিলে। সব কটা বন্দুকের একটা জড়ান গোছের আওয়াজ শোনা গেল, চারজন লোক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পড়ল তারা অদ্ভুত ভাবে—এক সঙ্গে নয়, পর পর, যেন খেলাঘরের রঙ্গমঞ্চের সাজান পুতুলের মতো, প্রায় বিকট ভঙ্গী করে। অফিসার তাদের কাছে গেল। একটি লোক তখনো মরেনি। অফিসার তাকে দু-দুবার রিভলভার দিয়ে গুলি করলে। আমাদের বন্ধু সিগারেট খাওয়া শেষ করে প্রান্তটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

"গেটের কাছে সামান্য একটু গোল শোনা গেল। দ্রুতপদে একটি মেয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকল, তারপর বুকের ওপর একটা হাত রেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। চীৎকার করে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে সে আবার ছুটে গেল।

"'সেনাপতি বলে উঠলেন, 'ক্যারাম্বা।'

"মেয়েটির গায়ে শোকের কালো পোশাক, মাথায় একটা ওড়না, মুখ তার মড়ার মতো শাদা। নেহাৎ বালিকা বললেই হয়, পাতলা একহারা, সুশ্রী সুঠাম চেহারা, বড় বড় ডাগর দুটি চোখ। চোখ দুটিতে গভীর বেদনার আকুলতা। মেয়েটি এমনই মধুর যে নিতান্ত কাতর ভাবে ছোট মুখটি একটু হাঁ করে তাকে ছুটে যেতে দেখে উদাসীন সৈনিকেরাও বিস্ময়ে একবার চমকে উঠল।

"বিদ্রোহী দু'একপা তার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি ধরা গলায় উচ্ছ্বসিত একটা চীৎকার করে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল: 'আল্মা দে মি কোরাজঁ, প্রাণের প্রাণ আমার'—বিদ্রোহী নিবিড় ভাবে তাকে চুম্বন করলে। আর সেই মুহূর্তে তার ছেঁড়াখোঁড়া শার্টের ভেতর থেকে একটা ছোরা টেনে বার করল—কি করে যে ছোরাটা সে কাছে রেখেছিল আমি বুঝতে পারি না। ছোরাটা মেয়েটির গলায় সে বসিয়ে দিলে। ছিন্নশিরা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে তার শার্ট রাঙিয়ে দিল। তারপর আবার সে মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলে।

"এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটল যে অনেকে কি যে হয়েছে কিছু বুঝতেই পারেনি, কিন্তু অন্যেরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। ছুটে এসে তারা তাকে ধরে ফেললে। তার দৃঢ় আলিঙ্গন মুক্ত করে দেবার পর মেয়েটি হয়তো পড়েই যেত, কিন্তু এ. ডি. সি. তাকে ধরে ফেলল। মেয়েটির তখন জ্ঞান নেই। তাকে মাটির ওপর শুইয়ে দিয়ে হতাশ বিষণ্ণ মুখে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। বিদ্রোহী জেনে শুনেই যথাস্থানে আঘাত করেছিল। রক্তস্রোত থামান গেল না। এ. ডি. সি. তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। সে উঠে পড়ে প্রায় চুপি-চুপি বললে, 'মারা গেছে।'

"বিদ্রোহী ক্যাথলিক খৃষ্টানদের রীতি অনুযায়ী নিজের বুকে ক্রুশ আঁকার ভঙ্গী করলে।

"সেনাপতি জিগগেস করলেন, 'কেন এ-কাজ করলে?'

"'আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

"ভীড় করে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের ভেতর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বয়ে গেল। অদ্ভুত ভাবে তারা হত্যাকারীর দিকে তখন চেয়ে আছে। সেনাপতিও নীরবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন।

"'অবশেষে তিনি বললেন,'হৃদয় খুব বড় না হলে এ-কাজ কেউ পারে না।

এমন লোকের প্রাণদণ্ড আমি দিতে পারব না। আমার গাড়ি নিয়ে ওকে সীমান্ত পার করে দিয়ে এস। সেনর, বীরের কাছে বীরের যে মর্যাদা তাই আমি আপনাকে দিলাম।'

"যারা দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের মধ্যেও সম্মতির একটা গুঞ্জন শোনা গেল। এ. ডি. সি. বিদ্রোহীর পিঠে একটু আঘাত করল। নীরবে দুজন সৈনিকের মাঝে সে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল।"

আমার বন্ধু চুপ করলেন। আমিও খানিক নীরব হয়ে রইলাম। আমার বলে রাখা উচিত যে আমার বন্ধু গুয়াতামালার লোক। আমার সঙ্গে তিনি স্প্যানিশে কথা বলছিলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর কথা অনুবাদ করে দিয়েছি, কিন্তু তাঁর ভাষার উচ্ছ্বাস সংশোধন করবার কোনো চেষ্টা করিনি। সত্যি কথা বলতে কি এ-গল্পে এ উচ্ছ্বাস মানায় বলে আমি মনে করি।

অবশেষে আমি জিগগেস করলাম, "তাহলে ওর মুখের ওই দাগটা কিসের?"

"ও, একটা বোতল খুলতে গিয়ে ফেটে যায়, তা থেকেই ও-কাণ্ড। বোতলটা জিঞ্জার-এল্-এর।"

বললাম, "ও বস্তুটিতে বরাবর আমার অরুচি।"

—প্রেমেন্দ্র মিত্র





স্বপ্ন

উনিশ শ' সতেরোর আগস্টে কাজের খাতিরে একবার নিউইয়র্ক থেকে পেট্রোগ্রাড যেতে হয়েছিল। নিরাপদে পৌছবার জন্য ব্লাডিভস্টক হয়ে যাবার পরামর্শ পেলাম। পেট্রোগ্রাড পৌছলাম সকালবেলা। দীর্ঘ অলস দিন যথাসম্ভব ভালোভাবে কাটাবার চেষ্টা করা গেল। সাই-বেরিয়াগামী গাড়ি, যতটা মনে পড়ে, রাত্রি ন'টায় ছাড়বার কথা। স্টেশনের রেস্তরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা একা-একাই শেষ করতে হবে। খাবার ঘরে বেশ ভীড়। একটা ছোট টেবিলে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বসলাম। তাঁর চেহারাটা ভারি মজার। ভদ্রলোক একজন রুশ—বেশ লম্বা কিন্তু আশ্চর্য মেদবোঝাই তাঁর শরীর, আর ভুঁড়িটি এমন বিপুল যে টেবিল থেকে বেশ খানিকটা তাঁকে সরে বসতে হয়েছে। দেহের অনুপাতে ছোট হাত দুটো মাংসের স্তূপে ডুবে গেছে। লম্বা, কালো, পাতলা চুল ক-গাছা মাথার টাক ঢাকবার জন্য চাঁদির উপর দিয়ে সযত্নে আঁচড়ান। অত্যন্ত স্থূল দোভাঁজ চিবুক আর প্রকাণ্ড ফ্যাকাশে মুখ এমন পরিষ্কার করে কামান যে তাতে একটা অশ্লীল নগ্নতার ছাপ পড়েছে। নাকটা ছোট—প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ডের উপর যেন একটি হাস্যকর বোতাম। কালো চকচকে চোখদুটোও অত্যন্ত ছোট। ওর চওড়া লাল মুখটা কিন্তু কামুকের। ভদ্রলোক কালো পোশাকটিকে বেশ পরিপাটি করে পরেছেন। পোশাকটা পুরানো নয় কিন্তু দেখে মনে হয় কোনোদিনই পরিষ্কার বা ইস্তিরি করা হয় নি।

খাবার ঘরে পরিবেশনের ব্যবস্থা ভালো নয়—আর পরিবেশকদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করাও অসম্ভব ব্যাপার। দুজনেই অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ শুরু করলাম। রুশ ভদ্রলোকটি ভালো ইংরিজি বলতে পারেন—বেশ দ্রুত। উচ্চারণে জোর দেওয়া অভ্যাস কিন্তু শ্রুতিকটু নয়। আমার এবং আমার কর্মসূচি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। তখনকার কাজে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, তাই চতুরের মতো আন্তরিকতা দেখিয়েপ্রশ্নের জবাব দিতে লাগলাম। ওঁকে জানালাম আমি একজন সাংবাদিক। জিগগেস করলেন গল্পসল্প লিখি কিনা। অবসর সময়ে একটু-আধটু লিখে থাকি জানতে পেরে আধুনিক রুশ ঔপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। নিঃসন্দেহে বোঝা গেল তিনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক।

এতক্ষণে একজন পরিবেশককে বলে-কয়ে একটু বাঁধাকপির স্যুপ আনানো গেল। পরিচয়টাও জমে উঠল ক্রমশ। পকেট থেকে একটি 'ভদকা'র বোতল বার করে ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ জানালেন। ঠিক বুঝতে পারলাম না, এটাকি 'ভদকা' কিংবা রুশজাতির বাকপ্রিয়তা যা ওঁকে এত বেশি মুখর করে তুলল। জিগগেস না করা সত্বেও নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই বলতে লাগলেন। মনে হল লোকটি সম্ভ্রান্ত বংশের—কথাবার্তা সংস্কারমুক্ত, ওকালতিই তাঁর পেশা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কী একটা গোলমালের জন্য দূর বিদেশে যেতে হয়েছিল, এখন আবার দেশে ফিরে যাচ্ছেন। কাজের খাতিরে ভ্লাডিভস্টকে কিছু দিন থাকতে হবে—সপ্তাহখানেকের ভিতরেই রওনা হবেন মস্কোতে। বললেন আমি একবার মস্কো গেলে খুবই খুশি হবেন তিনি।

"আপনি কি বিবাহিত?" হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, আমি বুঝলাম না, এ-খবরে তাঁর কি দরকার ছিল, তবু জানালাম আমি বিবাহিত। শুনে তিনি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—"আমার স্ত্রী মারা গেছেন। উনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা—জাতিতে সুইস—বাস করতেন জেনিভায়। ইংরিজি,

জার্মান, ইতালিয়ান চমৎকার বলতে পারতেন—অবশ্য ফরাসিই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। বিদেশীদের তুলনায় রুশভাষার ওপরও ওঁর দখল ছিল অসাধারণ। রুশভাষায় কথা বলতে এতটুকু বেগ পেতেন না তিনি।"

একজন পরিবেশক ডিসে করে ট্রে-বোঝাই খাবার নিয়ে যাচ্ছিল—তাকে ডাক দিয়ে পরবর্তি খাবারের আর কত দেরি এ-কথাই জিগগেস করলেন বোধহয়—তখন রুশভাষা আমার মোটেই জানা ছিল না। পরিবেশকটি দ্রুত এমন একটি ভঙ্গী করল যেন আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

"বিপ্লবের পর থেকে রেস্তরাঁয় খাওয়া-দাওয়া একটা জঘন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এই নিয়ে ভদ্রলোক কুড়ি নম্বর সিগারেট ধরালেন। আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম ট্রেনে ওঠবার আগে পুরো খাওয়া মিলবে কিনা কে জানে।

ভদ্রলোকটি আবার শুরু করলেন— "আমার স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ। পেট্রোগ্রাডে সম্ভ্রান্ত মেয়েদের একটি ইস্কুলে তিনি ভাষা শিক্ষা দিতেন। দীর্ঘকাল আন্তরিক সৌহৃদ্য নিয়ে চমৎকার বসবাস করছিলাম। অবশ্য ওঁর স্বভাবটা ছিল ঈর্ষাপরায়ন; আর আমার যেমন অদৃষ্ট, আমার প্রতি ভালোবাসায় তিনি ছিলেন একেবারে উন্মাদ।"

ভদ্রলোকটি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা কঠিন হয়ে উঠল। এ-রকম কুৎসিত লোক জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হাসিখুশি মোটাসোটা মানুষদের সময়-সময় আমাদের বেশ ভালো লাগে কিন্তু এই ব্যক্তিটির বিরক্তিকর স্থূলতা শুধু ঘৃণারই উদ্রেক করল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—

"অবশ্য এ-কথা আমি বলতে চাইনে যে আমিও স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলাম। যখন বিয়ে করি তখন তিনি গতযৌবনা আর বিবাহিত

জীবনের দশটি বৎসরও গিয়েছিল কেটে। দেখতে ছোট আর পাতলা ছিলেন আমার স্ত্রী—রঙটাও সুবিধের নয়, কথাবার্তা অত্যন্ত ঝাঁঝাল। তীব্র আসক্তির জন্যে বড় দুঃখ পেতেন—এমনি ছিল তাঁর স্বভাব। ওঁকে ছাড়া আর কারও দিকে এতটুকু নজর পড়বে এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমার পরিচিতা মেয়েদের প্রতিই যে তাঁর ঈর্ষা ছিল তা নয়—আমার বিড়াল আর বইগুলোকেও তিনি হিংসে করতেন। একবার কোথায় গিয়েছিলাম। একটা কোটকে একটু বেশি পছন্দ করতাম বলে সেই সুযোগে কাকে সেটা দান করে দিলেন। আমার মেজাজটা কিন্তু শান্ত। ওর সঙ্গে বাস করা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই কিন্তু ওর এই রুক্ষ স্বভাবকে ঈশ্বরের দান বলেই মেনে নিয়েছিলাম। এর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও ছিল যৎসামান্য। যতক্ষণ সম্ভব আমি তাঁর অনুযোগগুলোকে অস্বীকারের চেষ্টা করতাম, যখন দেখতাম উপায় নেই, ঘাড় নেড়ে একটি সিগারেট ধরানই ছিল আমার কাজ। কখনও খুব অবাক হয়ে ভাবতাম আমার প্রতি এটা কি তাঁর তীব্র আসক্তি না আন্তরিক ঘৃণা। কখনও মনে হতো ভালোবাসা আর ঘৃণার ভিতরে যেন বিশেষ কোনোও পার্থক্য নেই।

হয়তো এমনি করেই জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌছতাম যদি না একদিন রাত্রিতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটত। স্ত্রীর তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চীৎকারে ঘুম ভাঙল। চমকে উঠে জিগগেস করলাম কী ব্যাপার। উনি বললেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—আমি যেন ওঁকে খুন করবার চেষ্টা করছি। মস্ত বড় একটা বাড়ির উপরতলায় বাস করতাম আমরা। যে জায়গাটার চারধার ঘুরে সিঁড়ি উপরে উঠেছে সেটা খুব চওড়া। স্বপ্নে দেখলেন আমাদের ঘরের মেঝেয় পা দিতে যাব এমনি সময় জড়িয়ে ধরে রেলিং-এর উপর দিয়ে তাঁকে নিচে ফেলবার চেষ্টা করছি। বাড়িটা

ছ'তলা—নিচ পর্যন্ত বরাবর পাথরের সিঁড়ি। তার উপর পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা খেলেন আমার স্ত্রী। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ওঁকে শান্ত করবার কিন্তু পরদিন সকাল, তারও দু-তিনদিন পর ঐ একটি ঘটনারই উল্লেখ করলেন। দেখলাম হাসিঠাট্টা সত্ত্বেও স্বপ্নটা ওঁর মনে বাসা বেঁধেছে। আমারও কেমন যেন হল— এই ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। স্বপ্নটা যেন আমাকে এমন একটা জিনিস দেখিয়ে দিল যা কোনোদিনই সন্দেহ করি নি। স্ত্রী ভাবলেন, তাঁকে আমি ঘৃণা করি সুতরাং তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি খুশিই হব— তিনি নিজেও জানতেন তাঁকে সহ্য করা কঠিন। কখনো বা তাঁর মনে হয়েছে আমি তাঁকে সত্যিই খুন করতে পারি। মানুষের চিন্তাধারার হদিস পাওয়া কঠিন। এমন অনেক ধারণা আমাদের মনে এসে হাজির হয় যা স্বীকার করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। কখনো ইচ্ছে হয়েছে আমার স্ত্রী যদি কোনো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যেতেন—কখনও ভেবেছি কোনো কষ্টহীন হঠাৎ-মৃত্যু তাঁর হাত থেকে যদি আমাকে মুক্তি দিত—কিন্তু কখনো ইচ্ছে করে জীবনের অসহ্য ভারমুক্ত হব এ-কথা ভাবিনি।

স্বপ্নটার প্রভাব কিন্তু আমাদের দুজনেরই উপরে হল অসাধারণ। ভয়-পাওয়া স্ত্রীর মেজাজটা আগের চাইতে নরম হল—সহ্যগুণও অনেকটা বেড়ে গেল তাঁর। আমার কী যে হল—যখনই সিঁড়ি দিয়ে ঘরের দিকে এগুতে থাকি কিছুতেই রেলিংটার উপর দিয়ে একবার নিচে না তাকিয়ে পারি না—ঐ সঙ্গে এ-কথাও না ভেবে উপায় নেই স্ত্রী যা স্বপ্নে দেখেছেন তা তো কতই সহজ। রেলিংটা ভয়ঙ্কর নিচু একটা দ্রুত ঝাঁকুনি, ব্যস, সব শেষ। মন থেকে চিন্তাটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। এর কয়েকমাস পরে স্ত্রী আমাকে আবার ঘুম থেকে জাগালেন। শরীরটা বড় ক্লান্ত ছিল—রাগও হল খুব। চেয়ে দেখি ওঁর চেহারা ভয়ে

শাদা হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। আবার সেই স্বপ্ন দেখেছেন। চোখ দিয়ে ওঁর ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। জিগগেস করলেন সত্যিই ওঁকে ঘৃণা করি কিনা। দেবতাদের নামে শপথ করে বললাম আমি তাঁকে ভালোবাসি। অবশেষে উনি আবার ঘুমোতে গেলেন। এর চেয়ে বেশি আর কীই-বা করতে পারতাম আমি। জেগে শুয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল যেন দেখতে পাচ্ছি আমার স্ত্রী রেলিং-এর উপর দিয়ে সেই প্রশস্ত জায়গাটায় পড়ে যাচ্ছেন—তাঁর তীক্ষ্ণ চীৎকার এমন কি কঠিন পাথরের উপর পড়ে যাওয়ার শব্দটাও যেন কানে এল। আমি কেঁপে উঠলাম।"

কৃশ ভদ্রলোকটি থামলেন। তাঁর কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। গল্পটি তিনি বেশ গুছিয়ে তরতর করে বলে গেছেন যাতে মন দিয়ে শুনতে পারি। বোতলে তখনও খানিকটা 'ভদকা' ছিল—তিনি সেটা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করলেন।

একটু থেমে আমি জিগগেস করলাম "আচ্ছা, আপনার স্ত্রী পরে কী করে মারা গেলেন?"

একটা নোংরা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তিনি বললেন—

"স্বপ্নের সঙ্গে ঘটনার একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল। দেখা গেল একদিন একটু বেশি রাতে উনি সিঁড়ির নিচে ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে আছেন।"

"কে দেখতে পেলেন ওঁকে—" জিগগেস করলাম।

"এই মারাত্মক দুর্ঘটনার একটু পরেই ওখানকার একজন বাসিন্দা ওঁকে দেখতে পান।"

"আপনি তখন কোথায়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি রকম শয়তানের মতো ধূর্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। দেখলাম ওঁর খুদে কালো চোখদুটো চকচক করে উঠল।

"আমি সন্ধ্যাটা সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে কাটাচ্ছিলাম। বোধহয় ঘটনার ঘণ্টাখানেক বাদে আমি সেখানে পৌঁছই।"

এই সময় পরিবেশকটি আমাদের অর্ডারি মাংস নিয়ে এল। রুশ ভদ্রলোকটি মাংসের প্লেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন—প্রকাণ্ড হাঁ করে মুখভর্তি মাংস চিবুতে লাগলেন তিনি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। লোকটি কি এই সামান্য গল্পের অছিলায় ওঁর স্ত্রীকে খুন করবার কাহিনীটাই বর্ণনা করলেন? অত্যধিক স্থূল আর অলস এই লোকটিকে দেখে তো খুনী বলে মনে হয় না! এতখানি সাহস ওঁর ভিতরে আছে এ-কথা বিশ্বাস করাও কঠিন। আবার মনে হল আমাকে নিয়ে ভদ্রলোক একটা উৎকট রসিকতা করলেন না তো?

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে গিয়ে ট্রেন ধরতে হল। ওঁকে ছেড়ে চলে এলাম—আজ পর্যন্ত আর দেখতে পাইনি ভদ্রলোকটিকে, কিন্তু কোনোদিনই এ-কথা ভেবে ঠিক করতে পারিনি লোকটি কি আমাকে একটা সত্যি ঘটনাই বললেন না এটা তাঁর নিছক একটা রসিকতা!

—ফল্গু কর





লাল সাহেব

কাপ্তেন অতি কষ্টে ট্রাউজারের পকেট থেকে রূপোর ঘড়িটা টেনে বার করলে। কষ্ট হবারই কথা। একে কাপ্তেনের ভুঁড়িটা প্রকাণ্ড, তার ওপর আবার পকেটটা ট্রাউজারের পাশে না হয়ে সামনের দিকে—ঠিক ভুঁড়ির ওপর। পকেট-ঘড়িটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কাপ্তেন মুখ তুলে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকাল। হালের চাকা হাতে হাওয়াইয়ান খালাসী কিছু না বলে কর্তার দিকে এক পলক দেখে নিল—কাপ্তেনের দৃষ্টি তখন নিকটবর্তী দ্বীপের দিকে নিবদ্ধ। পালতোলা জাহাজ ক্রমেই দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু দূরে সমুদ্রতলের শৈলশ্রেণীর ওপর ক্রমাগত আছাড় লেগে সমুদ্রের জলে একটি শাদা ফেনরেখা ; কাপ্তেন জানে এই বেষ্টনীর মাঝে এমন একটি ফাঁক আছে যার ভেতর দিয়ে জাহাজটা অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে। যত ফেনরেখার কাছে এগিয়ে আসছে ততই সে ভাবছে এবার বুঝি সেই পথটা চোখে পড়বে। অন্ধকার হতে এখনো এক ঘণ্টা। শৈলবেষ্টনী ও দ্বীপের মাঝখানের জায়গাটা নিস্তরঙ্গ গভীর হ্রদ—সেখানে একবার নোঙর ফেলতে পারলে—ব্যস্, আর ভাবতে হবে না। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামটি বেশ দেখা যাচ্ছে—এ-গাঁয়ের মোড়ল আবার সর্দারমাল্লার বন্ধু লোক। রাত্তিরটা ডাঙায় কাটাতে পারলে মন্দ হয় না! সর্দারের দিকে তাকিয়ে কাপ্তেন-সাহেব বলল,

"এক বোতল খাঁটি মাল নিয়ে যাওয়া যাবে—কি বল? নাচগান করার মতো দু'চারটে ছুঁড়ি জোগাড় করতে পারবে তো?"

"সে তো হল। রাস্তাটা এখন দেখতে পাচ্ছি না যে, জাহাজ ভিড়াই কি করে?" সর্দারমাল্লা বলল।

এ লোকটিও হাওয়াইবাসী, বেশ লম্বা চওড়া সুদর্শন চেহারা, মেটে রঙ। নাকমুখের গঠনে একটু যেন রাজকীয় ভাব আছে—অনেকটা রোমক সাম্রাজ্যের শেষ যুগের নৃপতিদের মতো; মেদাধিক্যে গতিটা স্বভাবতই মন্থর।

দূরবীনের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে কাপ্তেন বলল, "রাস্তাটা এখানেই ধারে কাছে কোথাও হবে—নজরে পড়ছে না কেন জানিনা। একজন খালাসীকে পাঠাও না মাস্তলের ওপর উঠে দেখে আসুক।"

সর্দারের হুকুমে একজন খালাসী তরতর করে মাস্তল বেয়ে উঠল। কি বলে শোনার অপেক্ষায় কাপ্তেন সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। হাওয়াইয়ান খালাসী চেঁচিয়ে বলে উঠল ফেনের রেখা ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। শ্বেতাঙ্গ কাপ্তেন তার জাহাজের মাঝিমাল্লাদের মতোই সমানে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে। খুব একচোট মুখ খিস্তি করে সামোয়ান ভাষায় সে খালাসীকে গালাগাল দিতে লাগল।

সর্দার খালাসী জিগগেস করল, "ও কি ওখানেই থাকবে?"

"ও-ব্যাটা চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে, ওকে ওখানে রেখে লাভ—কানার হদ্দ! আমি চড়তাম মাস্তলে ঠিক রাস্তাটা খুঁজে বার করতাম।"

সরু লম্বা মাস্তলটার দিকে কাপ্তেন যেন বেশ একটু রাগতভাবে তাকাল। এ-সব ওঠা-নামা নেটিবদেরই পোষায়—সারাজীবন নারকেল গাছ বেয়ে ওঠা ওদের অভ্যেস। কাপ্তেন যেমন মোটা তেমনি ওজনে ভারী। চেঁচিয়ে বলল—

"নেমে আয়, ব্যাটা অকর্মার ধাড়ী! ফেনের লাইন বরাবর জাহাজ চালাও, যতক্ষণ না রাস্তাটা চোখে পড়ে।"

জাহাজটা ছোট, ওজনে সত্তর টনের বেশি নয়। পালে ভর দিয়েই চলে, সময়ে অসময়ে ব্যবহারের জন্য একটা প্যারাফিন ইঞ্জিনও ফিট্ করা আছে। প্রতিকূল বাতাস না থাকলে ঘণ্টায় মাইল চার-পাঁচ যায়। জাহাজের চেহারাটা কুৎসিত। অনেকদিন আগে জাহাজের খোলে এক পোঁচ শাদা রঙ পড়েছিল, আজ সেই রঙ খসে গিয়ে বীভৎস ছোপধরা নোংরা চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। জাহাজের সর্বত্র প্যারাফিন্ ও শুকনো নারকেলের উগ্র বিশ্রী গন্ধ। এ-জাহাজটা বেশির ভাগ শুকনো নারকেলই চালান দেয়। ইতিমধ্যে ওরা ফেনরেখার প্রায় একশ' ফিটের মধ্যে এসে পড়েছে। কাপ্তেন হালধারী খালাসীকে বলে দিল যেন ওই লাইন বরাবর চলে যতক্ষণ না ফাঁকটা চোখে পড়ে। মাইল-দুয়েক এগিয়ে যাবার পর ওরা বুঝতে পারল রাস্তাটা পিছনে কোথাও ফেলে এসেছে। এবার হুকুম হল পিছু হটতে, কিন্তু ফেনরেখার কোথাও ফাঁক দেখা যাচ্ছে না, সূর্যও ডুবু-ডুবু। খালাসীদের একচোট গালাগাল দিয়ে কাপ্তেন স্থির করল আগামী সকাল অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই।

"এখানে নোঙর ফেলা চলবে না, মোড় ঘোরাও।"

সমুদ্রের মধ্যে কিছুদূর ঢুকতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল, নোঙর ফেলা হল। পাল গুটিয়ে নিতেই জাহাজটা ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে শুরু করল। এপিয়া বন্দরের লোকেরা বলাবলি করে একদিন হয়তো মরণ দোলায় দুলবে। জাহাজের মালিক একজন জার্মাণ-আমেরিকান, সে তো স্পষ্টই বলে অজস্র টাকা পেলেও সে কোনোকালে এ-জাহাজে পাড়ি দেবে না। চীনে বাবুর্চি—পরনে ছেঁড়া ময়লা শাদা ট্রাউজার—জামার ওপর পাতলা একখানা আঙরাখা—এসে খবর দিল 'সাপার' তৈরী। কাপ্তেন কেবিনে ঢুকে দেখে জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ইতিপূর্বেই খানা-টেবিল-এ বসে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার লোকটি যেমন লম্বা তেমনি রোগা,

ঘাড় তো নয়—প্যাকাটি। নীলরঙা ওভার-অলের উপর হাতকাটা জার্সি—কনুই থেকে কব্জি অবধি সমস্ত হাতটা উল্কিতে ভরা।

"শালার কপাল দেখেছ," কাপ্তেন বললে, "ডাঙার কাছে এসে কিনা, সমুদ্রের ওপর রাত কাটান!"

ইঞ্জিনিয়ার কিছু জবাব দিল না। আহারপর্ব চলল নিঃশব্দে। একটি কেরাসিন তেলের আলো স্তিমিতভাবে জ্বলছে কেবিনে। টিনের খোবানি দিয়ে খাওয়া শেষ হলে পর চীনেম্যানটা এক কাপ করে চা দিয়ে গেল। কাপ্তেন একটা চুরুট ধরিয়ে চলে গেল ডেক্-এর ওপর। চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে মসীকৃষ্ণ বস্তুপুঞ্জের মতো। তারাগুলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। ঢেউগুলো অবিরাম আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে. ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসছেনা। কাপ্তেন একটা ডেক্-চেয়ারে গা ছেড়ে বসে পড়ল—অলসভাবে চুরুটে টান দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে দু'চারজন খালাসী এসে ওর পায়ের কাছে বসল—একজনের হাতে ব্যাঞ্জো আর একজনের হাতে কনসার্টিনা। বাজনা শুরু হল—একজন গান জুড়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। বিলিতি যন্ত্রে নেটিব গানের সুর কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। গানের সুরে সুরে দুজন খালাসী নাচতে আরম্ভ করল। সে কী উদ্দাম নাচ, হাত পায়ের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী—দেখলেই মনে হয় এই নাচের মধ্যে নিগূঢ় কোনো যৌন অর্থ আছে। তার মধ্যে রতিক্রিয়ার আভাস আছে কিন্তু কামুকতা নেই। নিম্নস্তরের পশুদের আসঙ্গলিপ্সার ভঙ্গী ওদের নাচের মধ্যে রূপ নিয়েছে, কোনো লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, সহজ সরল ভঙ্গী। এ-নাচ এত স্বাভাবিক বলেই যেন এত সুন্দর। অনেকক্ষণ অঙ্গবিক্ষেপের পর ক্লান্ত হয়ে ওরা ডেক্-এর উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। চারদিকে থমথমে একটা স্তব্ধতা। কাপ্তেন ডেক্-চেয়ার ছেড়ে উঠল;

নিজের কেবিন-এ গিয়ে কাপড়চোপড় খুলে বাঙ্ক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। ঘুম কি ছাই আসে—একে মেদবহুল শরীর তার ওপর এই গরম— শুয়ে শুয়ে সে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

পরদিন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ওপর যখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল, দেখা গেল ডুবন্ত শৈলশ্রেণীর মধ্যে সেই ফাঁকটি জাহাজের একটু অল্প দূরেই আত্মগোপন করে ছিল। কিছু দূরে পুবদিকে সেই পথটা দেখা গেল অথচ গত রাত্রে এর জন্য কী হয়রানি! শিলাবেষ্টিত হ্রদের মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করল—আয়নার মতো স্বচ্ছ মসৃণ জল, কোথাও একটি তরঙ্গ নেই। নিচের দিকে তাকালে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশটুকু চোখে পড়ে—সেখানে প্রবালের ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে রঙ-বেরঙের মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। জাহাজ নোঙর করা হল, কাপ্তেন প্রাতরাশ সেরে একবার ডেক্-এর ওপর গেলেন। মাথার ওপর সূর্যসংপ্লুত মেঘহীন সুনীল আকাশ—বাতাস এখনো ভোরবেলাকার শিশিরের ছোঁওয়া লেগে শীতল হয়ে আছে। আজ রবিবার—সমস্ত আবহাওয়ায় একটা যেন ছুটির আমেজ লেগেছে, বিশ্বপ্রকৃতি আজ যেন কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়েছে। তীরে নারকেল গাছের শ্রেণীর দিকে অলসভাবে তাকিয়ে কাপ্তেন আরামে বসে রইল। ক্রমে ওর মুখের ওপর একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল, প্রায় নিঃশেষিত চুরুটটা জলে ফেলে দিয়ে বলল,

"বোট নামাও, একবার ডাঙার দিকে ঘুরে আসি।"

মোটা মানুষ—শরীরের গ্রন্থিগুলোও শক্ত হয়ে গেছে, কোনোমতে সিঁড়ি দিয়ে জাহাজের গা বেয়ে বোট-এ পা দিল। একজন খালাসী দাঁড় বেয়ে ওকে ছোট একটি খাড়ির কাছে পৌঁছে দিল। এখানে নারকেল গাছগুলো প্রায় যেন জলের কিনারা অবধি নুয়ে পড়েছে—ঘেঁষাঘেঁষি সারিবদ্ধ ভাবে নয় পরস্পরের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। দেখে

মনে হয় যেন বিগতযৌবনা কুমারীরা ব্যালে-নৃত্য করবার জন্য পুরাতনকালের ফ্যাশন অনুযায়ী বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। যৌবন নেই:অথচ চটুল ভাবটা আছে। এই নারকেল বনের ভিতর দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কাপ্তেন চলেছে অলস মন্থর চালে। পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে আরেকটা অপ্রশস্ত খাড়ির কাছে। খাড়ির ওপর সরু লম্বা একটা সাঁকো, পর পর নারকেল গাছের গুঁড়ি পেতে তৈরি। দুটো শাখাবিশিষ্ট ডাল কিছু দূর অন্তর খাড়ির ভেতরকার মাটিতে পোঁতা—এই ডালগুলোই সাঁকোটাকে তুলে ধরে রেখেছে। কী ভয়াবহ ব্যাপার ভেবে দেখুন, এক একটি করে নারকেলের গুঁড়ি পর পর পাতা, শূন্যের ওপর সুগোল মসৃণ পিচ্ছিল এই পথ বেয়ে যেতে অতি বড় সাহসী লোকের বুকও ভয়ে দুরু-দুরু করে ওঠে। পড়ো-পড়ো অবস্থায় কোনো কিছু যে ধরব তারও উপায় নেই, পা ফসকালেই অতল সমুদ্রের জল। কাপ্তেন প্রথম একটু ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু লোভ সামলান দায়। খাড়ির ওপারেই বীথিকাঘেরা একটি বাংলো-বাড়ি—নিশ্চয় কোনো শ্বেতাঙ্গের হবে। মন স্থির করে ও গুটিগুটি সতর্ক পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল। এক জায়গায় দুটো গুঁড়ি এসে মিলেছে অথচ মেশেনি—অসমতল জায়গায় ও আর একটু হলেই পড়ে গিয়েছিল আর কি! শেষ গুঁড়িটা পার হয়ে ওপারের শক্ত মাটিতে পা দিয়ে কাপ্তেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই সাঁকো পেরবার দুরূহ কাজে ও এমনি মশগুল ছিল যে দেখতেও পায়নি আর কেউ একজন ওকে লক্ষ্য করে দেখছে। ওকে উদ্দেশ করে কথা বলতেই ও যেন চমকে উঠল।

"অভ্যেস যদি না থাকে তাহলে এই সাঁকো পেরতে গেলে বুকের পাটা যথেষ্ট শক্ত হওয়া দরকার।"

চোখ তুলে দেখে একটি লোক ওর সামনে দাঁড়িয়ে, বোধকরি ওই বাংলো-বাড়ি থেকে এসে থাকবে। লোকটি একটু হেসে বলতে লাগল,

"দেখছিলাম আপনি ইতস্তত: করছেন। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয় পড়ে যাবেন।"

ডাঙায় পা দিয়ে কাপ্তেনের নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে এসেছে, বেশ স্পর্ধার সঙ্গে বলল, "হুঁ:, পড়ে যাবে বললেই হল।"

"আগেভাগে আমিও দু-একবার পড়ে গেছি মশাই। এখনো মনে পড়ে একদিন শিকার করে ফিরছি, সাঁকো পেরতে গিয়ে বন্দুক-টন্দুক শুদ্ধ ধপাস্! আজকাল শিকার করতে বেরলে সঙ্গে একটা ছোকরা নিয়ে যাই বন্দুকটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য।"

লোকটি যৌবন পেরিয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে, সরু লম্বাটে মুখের প্রান্তে ছোট্ট দাড়িতে একটু যেন পাক ধরেছে। ওর পরনে হাতকাটা গেঞ্জি ও শাদা ট্রাউজার, পায়ে না আছে মোজা, না আছে জুতো, ইংরিজি উচ্চারণে সামান্য বিদেশী টান।

কাপ্তেন জিগগেস করল, "আচ্ছা আপনিই কি নীলসন্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার কথা আমি শুনেছি। এই দ্বীপেই কোথাও আপনি থাকেন বলে মনে হয়েছিল।"

গৃহকর্তার পেছন পেছন কাপ্তেন তার বাংলো-বাড়িতে ঢুকল ও নীলসনের ইঙ্গিতক্রমে একটি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। নীলসন্ হুইস্কি ও গেলাশ আনতে ভেতরে গেছে, সেই ফাঁকে তার অতিথি বসার ঘরটি ভালো করে দেখতে লাগল। ও অবাক হয়ে গেছে—এক সঙ্গে এত বই ও জীবনে দেখেনি। চারটা দেয়ালেই মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেয়াল জোড়া বইয়ের তাক—বইয়ে বইয়ে একেবারে ঠাসা। এক কোণে একটি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো তার ওপর স্বরলিপির বইয়ের ছড়াছড়ি। প্রশস্ত টেবিলটার উপর হরেক রকম বই ও পত্রিকা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। বসবার ঘরের ব্যাপার দেখে ও যেন একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এখন ওর

হঠাৎ মনে পড়ল লোকে কানাঘুষো করে যে নীলসন্ লোকটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। অনেকদিন এ-অঞ্চলে আছে অথচ ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেউ জানে না—তবে যারা ওকে চেনে তারা একটা বিষয়ে একমত যে লোকটা ছিটগ্রস্ত। আর তাতে আশ্চর্য কি—নীলসনের দেশ হল সুইডেন।

নীলসন্ ফিরে এলে পর কাপ্তেন বলল, "বাব্বাঃ এক গাদা বই জোগাড় করেছেন দেখছি—বই আর বই।"

একটু হেসে গৃহকর্তা বললেন, "থাকনা—কাউকে কামড়াচ্ছে না তো।"

"এত সব বই আপনি পড়েছেন নাকি?"

"বেশির ভাগই পড়েছি।"

"পড়াশুনোর এক-আধটু অভ্যেস আমারও আছে। প্রতি হপ্তায় ওরা নিয়মিত আমার কাছে *Saturday Evening Post* পাঠায়।"

নীলসন্ অতিথির জন্য বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢালল, একটা চুরুটও দিল। ফলে কাপ্তেন একটু অতিরিক্ত আলাপী হয়ে পড়ল।

"কাল রাত্তিরেই পৌঁছতাম—ঢোকবার রাস্তাটা না দেখতে পেয়ে কী ভোগান্তি। সারারাত খোলা সমুদ্রে নোঙর ফেলে থাকতে হল অগত্যা। এদিকে আমি আগে কখনো জাহাজ নিয়ে আসিনি। আমাদের কর্তা বলল, এখানে কিছু মাল চালান দিতে হবে। গ্রে বলে কাউকে চেনেন নাকি?"

"হ্যাঁ চিনি বৈকি। এই তো একটু এগিয়েই গ্রে'র দোকান।"

"ওর বুঝি কিছু শুকনো নারকেল মজুত আছে, তার বদলে এক কাঁড়ি টিনে-পোরা খাবার-দাবার অর্ডার দিয়েছিল। ওরা বলল এপিয়াতে নিষ্কর্মা বসে থাকার চাইতে এখানে একবার ঘুরে যাই তো বেশ হয়। সাধারণতঃ আমার দৌড় এপিয়া থেকে প্যাগো প্যাগো অবধি—প্যাগো প্যাগোতে বসন্ত লেগেছে বলে হাতে কোনো কাজ ছিল না।"

এক চুমুক হুইস্কি টেনে কাপ্তেন চুরুটটি ধরাল। এমনিতেও লোকটা বেশি কথা কয় না, কিন্তু নীলসন্ এমন একটা কিছু ওর মধ্যে দেখেছে যাতে ও বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। এই ভাবটা ও যেন কথা দিয়ে ঢাকতে চায়। নীলসন্ বড় বড় কালো চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক আমোদের আভাস।

"ছোট্টখাট্টো সুন্দর বাংলোটি আপনার।"

"কম খাটতে হয়নি এর জন্যে আমার।"

"তাছাড়া নারকেল গাছ থেকে আপনার বোধহয় বেশ আয় হয়। দিব্যি গাছগুলো। শুকনো নারকেলের বাজারও তো আজকাল বেশ ভালো। আমারও এক কালে উপোলু অঞ্চলে একটা নারকেলের বাগান ছিল। রাখতে পারিনি, বিক্রি করে দিতে হয়েছে।"

কাপ্তেন আর একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল—তাকের ওপর স্তরে স্তরে সাজানো বইগুলো ওর কাছে দুর্বোধ্য ভাবে জটিল ঠেকে। দুর্বোধ্য বলেই ঘরটার প্রতি ওর মনে মনে একটা বিরুদ্ধতা জমে ওঠে।

"যাই বলুন—কিন্তু এ-রকম জায়গায় নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ না মনে হয়ে যায় না।" কাপ্তেন বলে।

"নির্জনতা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। একি আজকের কথা—এখানে আমি একটানা আছি গত পঁচিশ বছর।"

কাপ্তেন আর কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না, নিঃশব্দতার ফাঁক ভরাবার জন্য ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছে। বোঝা গেল নীলসন্ও বেশি বাক্যব্যয় করতে চায় না। বেশ নিবিষ্টভাবে সে তার অতিথির দিকে তাকিয়ে রইল। কাপ্তেন লোকটি লম্বায় ছ'ফুটেরও বেশি—যেমন লম্বা তেমনি মোটা। মুখের চামড়া লাল, এখানে ওখানে মেচেতাপড়া, গালের ওপর লাল রঙের অজস্র সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শিরা। নাকমুখচোখ সমস্ত যেন প্রচুর

মেদের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। চোখের রঙ ঘোর লাল। থাকে-থাকে চর্বি ওর ঘাড়টা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ঘাড়ের প্রান্তে শাদায় কালোয় লম্বা কোঁকড়া চুলের ঝালর নেমে গেছে—এই কয়েকটি গুচ্ছ ছাড়া সমস্ত মাথা জুড়ে প্রকাণ্ড তকতকে ঝকঝকে বিরাট এক টাক। প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধির আভাস নেই, উলটে বরঞ্চ দুর্বলবুদ্ধির পরিচয় দেয়। ওর পরনে গলাখোলা নীল ফ্ল্যানেলের জামা, ফাঁক দিয়ে লালচে রঙের রোমবহুল থলথলে বুকটা দেখা যাচ্ছে। নীল সার্জের ট্রাউজার বহুদিনের পুরানো। চেয়ারের ওপর থেবড়ে বসেছে কাপ্তেন, প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা যেন ঠেলে সামনের দিকে উঠেছে, মেঝের উপর মোটা মোটা পা দুটোর মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো স্ফূর্তি নেই, গ্রন্থিগুলো কঠিন হয়ে গেছে। নীলসন্ মনে মনে একবার ভাবতে চেষ্টা করল এ-লোকটা যৌবনে কেমন ছিল দেখতে। এই অতিকায় প্রাণীটি কোনোদিন যে বালকসুলভ চপলতায় মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াত সে-ছবি আজকের দিনে কল্পনাও করা অসম্ভব। কাপ্তেন তার গেলাশটা শেষ করলে পর নীলসন্ ওর দিকে বোতলটা ঠেলে দিয়ে বলল, "আর একটু ঢেলে নিন।"

একটু ঝুঁকে পড়ে, প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে বোতলটা ধরে কাপ্তেন জিগগেস করল—"আচ্ছা মশাইয়ের এ-অঞ্চলে কী করে আসা হল জিগগেস করতে পারি।"

"আমি এসেছিলাম শরীর সারাতে—আমার ফুসফুসের দোষ ছিল কিনা। ডাক্তার তো বলেছিল আমার মেয়াদ একবছরের বেশি নয়। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এখনো তো দিব্যি বেঁচে আছি দেখছেনই তো!"

"না না আমি তা জিগগেস করিনি। আমি জানতে চাইছিলাম এত জায়গা থাকতে এই বিশেষ অঞ্চলটা বেছে নিলেন কেন।"

"আমি আবার একটু ভাবপ্রবণ লোক কিনা—!"

"ও।"

নীলসন্ বেশ বুঝেছে 'ভাবপ্রবণ' কথাটার অর্থ কাপ্তেনের মাথায় ঢোকেনি। বেশ কৌতুকের দৃষ্টিতে ওর দিকে নীলসন্ তাকিয়ে রইল— কাপ্তেন লোকটি হাবাগোবা বলেই নীলসনের কেমন একটু মজা করবার ইচ্ছে হল। বলতে লাগল—

"পড়ি কি মরি এই ভাবনায় আপনি এমন ব্যস্ত ছিলেন—সাঁকো পেরবার সময় বোধ করি ভালো করে চারদিক দেখতেও পারেননি। লোকে কিন্তু বলে এ-জায়গাটির দৃশ্য বড় সুন্দর।"

"হ্যাঁ, সে বলতেই হবে—বাড়িটা আপনার ছোটর মধ্যে চমৎকার দেখতে।"

"আমি প্রথম যখন এখানে থাকি এ-সব কিছুই ছিল না। এ-জায়গায় ছিল একটা নেটিব কুঁড়ে। নারকেল গাছের গুঁড়ির থাম তার উপর মৌচাকের মতো গোল চাল। প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল সামনে, তাতে লাল ফুল ফুটত। লাল হলদে সোনালি রঙা পাতাবাহারের ঝোপ ছিল চারদিকে। আর ছিল নারকেল গাছ, বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র তাদের রঙ্গ! সারাটা দিন ধরে জলের মুকুরে তন্বী নারকেলগুলো তাদের মুখ দেখছে তো দেখছেই। তখন আমি ছিলাম যুবক—সে কি আজকের কথা, তারপর পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। মৃত্যুর অন্ধকার লোকে মিলিয়ে যাবার আগে আমার তখন একমাত্র ইচ্ছা এ-জগতের সমস্তটুকু সৌন্দর্য আমি নিঃশেষে সম্ভোগ করব। এর আগে এক জায়গায় এতখানি সৌন্দর্য আমি কোথাও দেখিনি। প্রথম যেদিন এখানে পা দিলাম সেদিনকার বিস্মিত অভিভূত ভাবটা কখনো ভুলব না। বুক ফেটে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল, এমন সুন্দর ভুবন ছেড়ে আমি যাবো কী করে! ভেবে দেখুন— মোটে পঁচিশ বছর বয়েস, ডাক্তারের কথা মেনে নিয়েছি না হয়, কিন্তু মরতে কি সাধ যায়। খুব অদ্ভুত বলতে হবে এই জায়গায় এসেই প্রথম

মনে একটা শক্তি পেলাম নিজের অদৃষ্টকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নেবার। মনে হল আমার পুরাতন জীর্ণ 'আমি'টাকে আমি পিছনে ফেলে এসেছি। স্টকহল্‌ম, স্টকহল্‌ম এর ইউনিভার্সিটি, তারপর বন্‌-এ যে-আমি শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছি, সেই আমি-র সঙ্গে আমার যেন চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। দর্শনতীর্থদের ভাষায়—আমি নিজেও একজন পি-এইচ-ডি জানেন বোধহয়—এতদিন পর আমি যেন আমার সত্য স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় পেলাম। নিজেকে উদ্দেশ করে নিজেই বললাম, 'একটি বছর হাতে আছে—পুরো একবছর এখানে কাটিয়ে যদি মরি তাহলে মরলেও আমার দুঃখ নেই।

"জানেনই তো যুবক বয়সে আমরা সকলেই এক-আধটু ভাববিলাস দুঃখবিলাস করতে ভালোবাসি, তা যদি না করতাম তাহলে হয়তো পঞ্চাশে আমাদের বুদ্ধি অতটা পাকত না।···ওকি গেলাশটা নামিয়ে রাখলেন যে, যা-তা বকে যাচ্ছি—কিছু মনে করবেন না যেন।"

নীলসন্‌ সরু হাতটা দিয়ে বোতল দেখিয়ে দিল। কাপ্তেন তার গেলাশের অবশিষ্ট হুইস্কি একচুমুকে শেষ করলে পর গৃহকর্তা একটু হেসে বলল, "আপনি দেখছি কিছু খাচ্ছেন না। আমার নেশা আবার হুইস্কিতে মানায় না, আরো সূক্ষ্ম জিনিসের দরকার হয়। এটা আপনি নিছক অহমিকা ভাবতে পারেন, কিন্তু এ-কথা সত্যি যে আমার নেশা একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না। আপনাদের হুইস্কির চাইতে আমার নেশা কিন্তু ক্ষতি কম করে।"

কাপ্তেন বলল, "শুনেছি বটে কোকেনের ব্যবসাটা আজকাল জোর চলছে বিশেষ করে আমেরিকায়।"

নীলসন্‌ খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, "শ্বেতাঙ্গ লোকের দেখা পাই কদাচিৎ কালে ভদ্রে—তাছাড়া মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা হুইস্কি—কী আর ক্ষতি করবে।"

অল্প খানিকটা হুইস্কি ঢেলে, সোডা মিশিয়ে এক চুমুক খেয়ে ও বলে চলল, "কিছুকাল এখানে কাটাবার পর আবিষ্কার করলাম এই জায়গাটার অপার্থিব অপূর্ব সৌন্দর্যের উৎসটা কোথায়। প্রেম এসে এখানে কিছু দিনের জন্য বাসা বেঁধেছিল; দেশান্তরী পাখি যেমন সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের ওপর অল্পক্ষণের জন্য পাখা গুটিয়ে জিরিয়ে নেয়, প্রেমও তেমনি দুটো দিনের মতো এখানকার কুড়েঘরে বিশ্রাম করে, আবার তার নিজের পথে চলে গেছে। যে মাসে আমাদের দেশে হথর্ন যখন ফোটে, তখন তার গন্ধে আকাশ-বাতাস সুরভিত হয়ে ওঠে, ফুলের মতো সুন্দর একটি প্রেমের সুবাস এখানকার আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করেছিল। আমার মনে হয় কি জানেন, যে-সব জায়গায় মানুষ গভীর-ভাবে ভালোবেসেছে অথবা গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছে, সে-সব জায়গার আবহাওয়ায় এমন একটা কিছু থেকে যায় যা চিরদিন সেই ভালোবাসা অথবা সেই দুঃখের স্মৃতি বহন করে। মানুষের মনের সংযোগে এ-সব জায়গাগুলো এমন একটা আত্মিক মাহাত্ম্য অর্জন করে যার প্রভাব, পথচলতি মানুষের মনের উপর যার রহস্যময় প্রতিক্রিয়া, অস্বীকার করা যায় না। বোধহয় কথাটা ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না।" একটু হেসে পরমুহূর্তেই নীলসন্ বলে উঠল, "আর পারলেও সেটা ঠিক আপনার বোধগম্য হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।" বক্তা খানিকক্ষণ চুপ করে আবার শুরু করল—

"এ জায়গাটা সুন্দর লেগেছিল বোধহয় এই জন্য যে এ ছিল যুগল প্রণয়ীর মধুর প্রেমের লীলাক্ষেত্র।" একটা কাঁধ ঈষৎ উঠিয়ে নীলসন্ বলল, "কী জানি সবই হয়তো আমার মনগড়া। নবীন প্রেম এবং তারই উপযুক্ত মনোরম পটভূমি এই যোগাযোগটা আমার ভাবতে ভালো লাগে বলেই হয়তো মনে মনে কত কী কল্পনা করে সুখ পাচ্ছি।"

কাপ্তেন লোকটার বুদ্ধি খুব প্রখর নয়—সে-কথা সত্য। ওর চাইতে

বুদ্ধিমান লোকও যদি নীলসনের কথা শুনে হতবুদ্ধি হতো তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যেত না। ওর মুখের হাসিটা দেখে মনে হয় ও যেন নিজের কথা নিজেই উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়। ওর হৃদয় যা বলছে ওর বুদ্ধি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। নীলসন্ নিজেই বলেছে যে ও-লোকটা একটু ভাবপ্রবণ, যখন হৃদয়োচ্ছাসের সঙ্গে শুষ্ক যুক্তিবাদ এসে যোগ দেয় তখন মিশেলটা যে কেমন হয় তা ভগবানই জানেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে নীলসন্ হঠাৎ বিহ্বল চোখে কাপ্তেনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "জানেন মশাই, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আপনাকে কোথাও আমি দেখে থাকব।" কাপ্তেন জবাব দিল, "আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে বলে আমার তো মনে পড়ছে না।"

"অদ্ভুত বলতে হবে, আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে এ-যেন আমার পরিচিত মুখ। কেবল স্থান ও কালের সঙ্গে আমার স্মৃতিটার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি না।"

কাপ্তেনের চেয়ারে একটা বিরাট মাংসপিণ্ড নড়ে চড়ে বসল। কাপ্তেন বলল, "কে জানে মশাই, আজ তিরিশ বছর হল এ-দেশে এসেছি। কত লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে সবাইকে কি আর মনে রাখা যায়?"

নীলসন্ মাথা নাড়িয়ে বলল, "আরে না না, আমি তা বলছি না। ধরুন আপনি যেন এমন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন যেখানে আগে কখনও আপনি যাননি। কখনও কখনও মনে হয় না জায়গাটা যেন আপনার চেনা-চেনা। আপনাকে দেখেও আমার সেইরকম মনে হচ্ছে।" মৃদু হেসে নীলসন্ বলে চলল, "কে জানে হয়তো পূর্বজন্মে আপনি ছিলেন প্রাচীন রোমের কোনো সওদাগরের জাহাজের অধিনায়ক আর আমি ছিলাম সামান্য ক্রীতদাস, দাঁড়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিরিশ বছর ধরে আছেন আপনি এখানে?"

"পুরো তি-রি-শ-টা বছর।"

"আচ্ছা লালসাহেব বলে পরিচিত একটা লোককে আপনি চিনতেন কি?"

"লালসাহেব?"

"তাছাড়া তার অপর কোনো নাম আছে বলে তো জানিনা। অবশ্য আমি তাকে চিনতাম না, এমন কি কখনো তাকে আমি চোখেও দেখিনি। অথচ ও আমার কাছে এমন স্পষ্ট, এতো জীবন্ত যে আমার মনে হয় যে আমার ভাইদের চাইতেও আরো নিকটভাবে আমি লালসাহেবকে চিনি। দান্তের পাওলো মালাতেস্তা অথবা শেক্সপিয়রের রোমিও যেমন পাঠকের কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায়, এ-লোকটাও তেমনি বহুপরিচিত রোম্যান্সের নায়কের মতো আমার কল্পনায় একটা সুস্পষ্ট মূর্তি নিয়েছে। বাজে বকছি, আপনি হয়তো দান্তে কিম্বা শেক্সপিয়রের নামও শোনেন নি।"

"কই মনে তো পড়ছে না," কাপ্তেন বলল জবাবে।

চুরুট টানতে-টানতে নীলসন্ অলসভাবে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল; শান্ত হাওয়ায় কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ভাসছে, তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসি অথচ চোখের দৃষ্টি যেন গভীর ভাবনায় মগ্ন। কাপ্তেনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল—লোকটা অভদ্ররকম মোটা, ওর প্রচুর মেদের অপরিমিত পরিতৃপ্তি চোখকে যেন পীড়া দেয়। আইন করে এ-রকম লোককে সভ্য সমাজ থেকে নির্বাসিত করা উচিত। ওকে দেখে নীলসনের মন ঘেন্নায় রী-রী করতে থাকে। বাস্তবে যাকে ও দেখছে তার সঙ্গে ওর কল্পনার মানুষটার কত যোজন তফাত, সে-কথা ভাবতে ওর বেশ মজা লাগছে।

"শোনা যায় লালসাহেবের মতো এমন সুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তখনকার দিনে ওকে যারা চিনত এমন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ লোকদের সঙ্গে আলাপ করে শুনেছি যে প্রথম দৃষ্টিতে সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে

তাকিয়ে থাকত, বিস্ময়কর ভাবে সুন্দর ছিল লোকটি। আগুনের শিখার মতো উজ্জল ছিল ওর কোঁকড়া সোনালি চুল। চুলের রঙের জন্যই ওর নাম হয়েছিল 'লালসাহেব'। রজেটি, মরিস প্রভৃতি শিল্পী যে ধরনের চুল নিয়ে উচ্ছ্বাস করত ওর চুল ছিল সেই রঙের। নিজের চেহারা নিয়ে লালসাহেবের মনে কোনো দেমাক ছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ও ছিল দিল্‌খোলা, আত্মভোলা লোক। তবে রূপ নিয়ে অহঙ্কার করা ওকেই সাজত। এখানকার সেই নেটিব কুড়েঘরটার ঠিক মাঝখানে ছিল একটা নারকেল গাছের গুড়ির খুঁটো—সেই খুঁটোতে ছুরি দিয়ে একটা চিহ্ন কাটা ছিল—সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যায় ও লম্বায় ছিল ছ'ফুটেরও দু'এক ইঞ্চি বেশি। গ্রীক ভাস্কর্যে দেবতাদের মূর্তি যেমন, তেমনি ছিল লালসাহেবের চেহারা—চওড়া কাঁধ, সরু কোমর—একেবারে প্রাক্‌সিটেলিসের অ্যাপলোর মূর্তি—সরল সুগঠিত পুরুষের মধ্যে ঠিক তেমনি রমণীসুলভ সুকুমার সৌষ্ঠব। সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা রহস্যময় ভাব মিশে সৌন্দর্যকে যেন মধুরতর করে তুলেছে। শুভ্র উজ্জল দুগ্ধধবল গায়ের রঙ সাটিনের মতো, নারীদেহের মতো কোমল ও মসৃণ ছিল ওর দেহ।"

জবাফুলের মতো রাঙা চোখে কাপ্তেন একটু কৌতুকের ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, "বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমারও না কি ছেলেবয়েসে দুধের মতো ধবধবে রঙ ছিল।"

নীলসন্ ওর কথা কানেও তুলছে না। ও এখন গল্প বলছে মশগুল হয়ে, বাধা পেলে অধীর হয়ে উঠছে।

"যেমন সুগঠিত ছিল ওর শরীর তেমনি সুন্দর ছিল ওর মুখ। বড় বড় নীল চোখ, এত গাঢ় নীল ছিল ওর চোখের মণি, কেউ কেউ বলত ওর কালো চোখ। এক মাথা সোনালি চুল অথচ ভ্রূর ও চোখের পাতার রঙ ছিল কুচকুচে কালো। চেহারায় কোথাও কোনো খুঁত ছিল না। সরস দুটি ঠোঁট ছিল টুকটুকে লাল। তখন লালসাহেবের বয়েস কুড়ি।"

নীলসন্ নাটকীয় ভঙ্গীতে একটুখানি সময় চুপ করে রইল। এক চুমুক হুইস্কি পান করে আবার সে বলে চলল, "ও ছিল অনুপম, ওর রূপের তুলনা হয় না। ও ছিল প্রকৃতির একটা অভূতপূর্ব ঘটনা, অযত্ন বর্ধিত অরণ্যের মধ্যে ও এসেছিল অতি আশ্চর্য সুন্দর ফুলের মতো।

"হঠাৎ একদিন ও এই মাটিতে পা দিল, ঠিক আপনি যে-জায়গায় আজ এসে পা দিলেন সেইখানে। যে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজে লালসাহেব ছিল নাবিক, সে-জাহাজ তখন এপিয়াতে নোঙর বাঁধা। পালিয়ে এসেছিল এপিয়া থেকে সাফোটোযাত্রী একটা নেটিব নৌকায়, এই দ্বীপের কাছাকাছি এসে একটা ডিঙিতে ওকে নামিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধজাহাজ থেকে ওর পালিয়ে আসার কারণটা ঠিক কি, সে আমি জানিনা। হয়তো যুদ্ধজাহাজের কড়া নিয়মকানুন ওর পছন্দ হয়নি, হয়তো কোনো বিপদে পড়েছিল। আবার এমনও হতে পারে যে এই অতি মনোরম দ্বীপগুলির রোমান্টিক পরিবেশ ছেড়ে যেতে ওর মন চায়নি। এই দেশের একটা অদ্ভুত কুহক আছে, সে তো আমরা দেখতেই পাই। পোকা যেমন মাকড়সার জালে আটকা পড়ে তেমনি কত লোক এই দ্বীপপুঞ্জের ইন্দ্রজালে ধরা পড়েছে। হয়তো আসলে ওর মনটা ছিল নরম, হয়তো এ দেশের সবুজ পাহাড়, হালকা হাওয়া, নীল সমুদ্র, এ সমস্ত ওর মনকে দিয়েছিল দুর্বল করে। এ দেশটা যেন দিলাইলা—মায়া দিয়ে ভুলিয়ে সামসন্-এর শক্তি অপহরণ করাটাই যেন এর কাজ। সে যাই হোক তখন ওর একমাত্র কাম্য লুকোবার মতো নিরাপদ জায়গা—ও ভাবল যুদ্ধ-জাহাজ সামোয়া ছেড়ে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত এই নিভৃত কোণটি আত্মগোপন করে থাকার জন্য চমৎকার হবে।

"তীরে পা দিয়ে দেখে সামনে একটা নেটিব কুড়ে। ও একটু ইতস্তত: করছে, ভাবছে কোনদিকে পা বাড়াবে, এমন সময় একটি মেয়ে কুড়ে থেকে বেড়িয়ে এসে ওকে ডাকল। সামোয়ান ভাষার ও দুটো কথাও

জানত কি না সন্দেহ, মেয়েটিরও ইংরিজি ভাষায় অনুরূপ অজ্ঞতা। কিন্তু ওর হাসির ভাষা, ওর লাস্যময় দেহ ভঙ্গিমার অর্থ বুঝতে লালসাহেবের একটুও দেরি হয়নি। মেয়েটির পেছন পেছন ও কুড়েতে এসে ঢুকল; ওর জন্য মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিয়ে মেয়েটি কিছু আনারস কেটে এনে ওকে খেতে দিল। লালসাহেব, আমি যতটুকু জানি সে-সমস্তই লোকমুখে শোনা, কিন্তু লালসাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঠিক বছর তিন বাদে মেয়েটিকে আমি নিজে দেখেছি। তখন মেয়েটির বয়স উনিশের চেয়েও কম। ও যে কী চমৎকার দেখতে ছিল, সে-কথা কল্পনা করাও কঠিন। জবাফুলের মতো দৃপ্ত বর্ণাঢ্য ওর সৌন্দর্য। দীর্ঘ তন্বী দেহ, মুখের ওপর একটা অদ্ভুত কোমল লাবণ্য, বড় বড় চোখদুটো যেন নারকেল বীথির নিচে নিথর সরোবরের মতো—যেমন গভীর তেমনি কালো, একপিঠ ভরতি কোঁকড়া কালো চুল, গলায় একটা সুগন্ধি ফুলের মালা। পেলব দুটি হাত যেমন সুকুমার তেমনি অসহায়, দেখলে কেমন একটা করুণা না হয়ে যায় না। তখনকার দিনে মেয়েটি অল্পতেই হাসত, এমন মিষ্টি হাসি সচরাচর চোখে পড়ে না। সোনালি রোদ্দুরে পাকা ফসলের যে-রঙ সেই রকম ঝলমলে রঙ ছিল ওর গায়ের। ও ছিল অপরূপ, ওর রূপের বর্ণনা করতে যাওয়া বৃথা।

"এই দুটি নবীন প্রাণী প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন মেয়েটির বয়স ষোলো, ছেলেটির কুড়ি। যে-প্রেম সমানুভূতি, বা সমমনোবৃত্তি থেকে জন্মায় এ-প্রেম সে ধরনের নয়। ওদের প্রেম ছিল নিছক খাঁটি প্রেম—স্বর্গের পারিজাত বনে সদ্যোজাগ্রত আদম ঈভ্-এর শিশির-স্নাত-চোখে যে-প্রেম দেখেছিল—এ হল সেই জাতের প্রেম। দেবদানব পশুপক্ষী এই প্রেমের টানে পরস্পরের কাছে ধরা দেয়, এ-প্রেম যাদুমন্ত্রের মতো এই পুরাতন পৃথিবীকে নিত্য নবীন সাজে সাজিয়ে নূতন করে দেয়, প্রাণের নিগূঢ় নিহিতার্থকে প্রকাশ করে। ফ্রান্সের অতিবিজ্ঞ

অতি অবিশ্বাসী ডিউক-এর কথা আপনি হয় তো শোনেননি। তিনি বলতেন প্রণয়ের ব্যাপারে সর্বদা দেখা যায় যে এক পক্ষই ভালোবাসে, অপর পক্ষ ভালোবাসতে দেয়। কথাটা খুব কটু হলেও সত্য—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে কালে ভদ্রে চোখে পড়ে; দেখা যায় যে পরস্পর পরস্পরকে কেবল চায় যে তা নয়, পরস্পর পরস্পরের কাছে নিঃশেষে বিলিয়েও দেয়। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। অচিরাৎ যখন দেওয়া নেওয়ার মধ্যে এমন একটি মধুর মিলন ঘটে, তখন মনে হয় সূর্য যেন তার কক্ষপথে থমকে থেমে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই একটি ঘটনার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

"পঁচিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও যখন আমি এ-দুটি নবীন প্রণয়ীর কথা ভাবি, যখন ভাবি তাদের সেই পরিপূর্ণ প্রেমের কথা, তখন মনে ব্যথা পাই। বুকে যেন সেই ব্যথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে পূর্ণ চাঁদের আলো নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের ওপর অঝোরে ঝরে পড়ছে—এ-ছবি দেখলে জল আসে আমার চোখে। আমার মনে হয় এ-দুটো ব্যথাই একই ধরনের। অপূর্ণ অসুন্দর জগতে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কথা ভাবতেও দুঃখ হয়।

"এরা দুটিতে ছিল শিশুর মতো। মেয়েটির স্বভাব ছিল যেমন মৃদু তেমনি মধুর। ছেলেটির কথা আমি অবশ্য কিছুই জানি না। তবে মনে করতে ভালো লাগে, সে সময়ে অন্ততঃ ওর মনটা ছিল শাদা ও সরল, ওর দেহের মতো সুন্দর। তবু এক-একবার ভাবি, সত্যি মন বলে পদার্থ কি ছিল ওর কিছু? রূপকথায় বলে সৃষ্টির আদিযুগে বনে থাকত বনদেব, তারা কেবল বনে উপবনে বাঁশি বাজাত আর ঝরনার জলে স্নান করত গা ডুবিয়ে। মন জিনিসটা খুব গোলমেলে জিনিস, মনের বালাই নিয়ে মানুষ তার স্বর্গোদ্যান থেকে চিরদিনের মতো নির্বাসিত।

যাক, এখন আমাদের গল্পতে ফিরে আসা যাক। লালসাহেব যখন এ-দ্বীপে আসে, তার কিছু দিন আগে এখানকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মহামারীতে উজাড় হয়ে গেছে। এ-সব মড়ক শ্বেতাঙ্গদেরই আনা। মেয়েটির আপনজন বলতে যে-কেউ ছিল সবাই সেই মড়কে মারা গেছে। দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়ের বাড়িতে সে তখন আশ্রয় নিল, বাড়িতে দুটি ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধা, দুজন আধবয়সী মেয়ে, একজন বয়স্ক পুরুষ ও একটি ছোট ছেলে। এই বাড়িতেই লালসাহেবকে মেয়েটি ডেকে আনল। সেখানে ও অতি অল্প দিনই ছিল। ওর হয়তো আশঙ্কা ছিল সমুদ্রের অত ধারে কাছে থাকলে শ্বেতাঙ্গ কারো সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে এবং তাহলে ওর লুকোবার জায়গাটা আর গোপন থাকবে না। হয়তো প্রণয়ীযুগল চেয়েছিল লোকচক্ষুর বাইরে একান্ত নিভৃতে পরস্পরের প্রেম সম্ভোগ করতে। একদিন সকালবেলা ওরা দুটিতে বেরিয়ে পড়ল, মেয়েটির যৎসামান্য জিনিসপত্র যা ছিল সঙ্গে নিয়ে। নারকেল গাছের তলা দিয়ে, ঘাসে ঢাকা রাস্তা বেয়ে, ওরা এসে পৌছুল এই খাড়ির কাছে। আপনি যে সাঁকো পেরিয়ে এলেন ওদেরও সেই সাঁকো পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ছেলেটি ইতস্তত: করছিল দেখে মেয়েটি খিলখিল্ করে হেসে কুটিপাটি। সাঁকোর প্রথম নারকেল গাছের শেষ অবধি ছেলেটি তো কোনোমতে সঙ্গিনীর হাত ধরে এল, তারপর ভয়ে আর এগোতে পারে না। শেষপর্যন্ত ও ডাঙায় ফিরে এল, কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে তবে পার হল সাঁকো। মেয়েটি দিব্বি মাথার ওপর নিজের জিনিসপত্র ও ছেলেটির কাপড়-চোপড় চাপিয়ে এদিকে চলে এল। ঠিক এ-জায়গাটায় ছিল একটা খালি কুড়ে ঘর—সেখানে এসে দুজনে আস্তানা গাড়ল। এ-ঘরটির ওপর ওর কোনো অধিকার ছিল কিনা জানি না। হয়তো এর মালিক সেই মহামারীতেই মারা গেছে—সে যাই হোক এ-জায়গায় ওরা তো আশ্রয়

নিল, কেউ কিছু আপত্তি করল না। আসবাব বলতে ছুটো মাহুর, এক টুকরো আয়না আর ছুটো একটা বাসন। এ-দ্বীপে সংসার পত্তনের জন্য এই সামান্য কয়েকটি জিনিসই যথেষ্ট।

"লোকে বলে যে-সব জাত হাসিখুশি তারা ইতিহাসের ধার ধারে না। যে-প্রেমে নিছক আনন্দ তারও কোনো ইতিহাস থাকে না। এদের ছুটির কোনো কাজ করতে হতো না, অথচ দিন যেন লঘু পাখার ভর দিয়ে চট্ করে কেটে যেত। মেয়েটির এ-দেশী একটা নাম ছিল, কিন্তু লালসাহেব ওকে ডাকত স্তালি বলে। এখানকার অতি সহজ বুলি ও চট্ করে শিখে নিল। মাহুরের ওপর শুয়ে লালসাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত, পাশে বসে স্তালি অনর্গল কথা বলে চলেছে। ও-লোকটা ছিল একটু চুপচাপ, বোধ করি ওর বুদ্ধিটাও খুব বেশি তীক্ষ্ণ ছিল না। মোট কথা ওর বেশির ভাগ সময় কাটত শুয়ে বসে; তামাক পাতা দিয়ে মেয়েটি এক ধরনের বিড়ি বাঁধত তাই টানত সারাক্ষণ। বিড়ি টানত আর দেখত স্তালি নিপুণ হাতে দ্রুত মাহুর বুনে চলেছে। কখনো কখনো পাড়াপ্রতিবেশী কেউ এসে পুরানো কালে এই দ্বীপে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের ঝগড়া-বিবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শুনিয়ে যেত ফলাও করে। কচিৎ কখনো লালসাহেব একঝুড়ি নানা রঙ বেরঙের মাছ ধরে আনত, কখনো বা বেরত লণ্ঠন হাতে গলদা চিঙড়ির খোঁজে। ঘরের চারদিকে ছিল কলাগাছ, কলা-সেদ্ধ ছিল ওদের প্রতি দিনকার আহারের অঙ্গ। তাছাড়া, নারকেল দিয়ে হরেক রকম খাবার তৈরি করতে জানত স্তালি। খাড়ির পাশেই ছিল রুটিফলের গাছ। মোটকথা খাবার কষ্ট ছিল না। পালাপর্বের দিন ওরা বাচ্চা শূয়োরের মাংস রাঁধত নেটিব কায়দায় গরম পাথরের ওপর। খাড়িতে দুজনে মিলে স্নান করত, সন্ধ্যাবেলা কখনো বা তীরের কাছাকাছি ডোঙায় চেপে বেরত জলবিহারে। সকালবেলা সমুদ্রের জল নীল,

বিকেলে মদের মতো লালচে রঙ ; কিন্তু তীরের ঠিক কাছটাতে শৈল বেষ্টিত অংশটিতে রঙের কী বৈচিত্র, কখনো নীলাভ সবুজ, কখনো বেগনি, কখনো আবার মরকত-মণির মতো নরম সবুজ। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে কয়েকটা মুহূর্ত সমস্ত হ্রদটা যেন গলিত স্বর্ণে ভরে ওঠে। তাছাড়া নানা আকারের নানা বর্ণের প্রবাল তো আছেই—কোনোটা বাদামি, কোনোটা শাদা, কোনোটা লাল, কত তাদের রঙের বাহার। সমুদ্রের তলাটা যেন যাদুকরের তৈরি বাগান, এই বাগানে মাছগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মতো। অবাস্তবভাবে অবিশ্বাস্যভাবে সুন্দর এই জগত, মনে হয় ক্ষণিকেই সব মিলিয়ে যাবে মায়ার মতো। প্রবালের পুঞ্জ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত—মাঝে মাঝে গলি—সেখানকার বালি ধবধবে ঝকঝকে, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে সবটুকু যেন স্পষ্ট দেখা যায়। এই পরিষ্কার জলে আরামে স্নান সেরে ওরা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে খাড়ির দিকে ফিরে আসত। নরম ঘাসের ওপর পা ফেলে, হাত ধরাধরি করে ওরা ছুটিতে চলেছে, দুধারের নারকেলবীথি নীড়ে-ফিরে-আসা পাখির কলরবে মুখর। তারপর উদার উন্মুক্ত সোনালি আকাশ ঘিরে আসত রাত্রি, মন্দমধুর হাওয়া বইত কুড়েঘরের দরজার ভিতর দিয়ে, দীর্ঘ রাত্রি যেন নিমেষে যেত কেটে। স্যালির বয়স তখন ষোলো, লালসাহেবের বয়স বোধহয় কুড়ির চাইতেও কম। ভোরবেলা নারকেল গাছের খুঁটোর ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিমিলি রোদ্দুর ঢুকে এই ছুটি আলিঙ্গনবদ্ধ শিশুর দিকে যেন উঁকি মেরে একবার দেখে নিত। পাছে ওদের ঘুম ভেঙে যায় সেই জন্যই যেন সূর্য কলাগাছের ছেঁড়াপাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলত, তারপর খেলার ছলে হঠাৎ সোনালি আলোর থাবা আচমকা মারত ওদের মুখের উপর—পারসিক বেড়ালের মতো। ঘুমেল চোখে ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মধুর করে হাসত—তৈরি হতো নতুন আর একটা দিনকে অভ্যর্থনা করে নিতে।

দিন গেল, হপ্তা গেল, মাস গেল কেটে, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। সময়ে কত পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই দুজনার ভালোবাসায় এই এক বছরে একটুও তারতম্য ঘটেনি। সেই প্রথম দেখার শুভলগ্নে দুজনে দুজনকে যেমন সহজভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়ে চেয়েছিল, ঠিক তেমনি একান্ত ভাবে আজও তারা দুজনা দুজনকে চায়! ওদের এই ভালোবাসায় কোনো উদ্দামতা নেই, উদ্দাম প্রেমের যে-দুঃখ তাও ওদের ভোগ করতে হয়নি। এ-প্রেম যেন একটা সহজাত আকর্ষণ, মানুষের তৈরি সম্বন্ধ এ নয়—এ হল দেবতার দান।

"আমার দৃঢ়বিশ্বাস ওদের সে সময় যদি কেউ জিগগেস করত, ওরা নিঃসন্দেহে বলত এ-গভীর প্রেম কখনো ফুরবে না। চিরন্তনতা ও প্রেম —প্রেমিকের কল্পনায় এ-দুটোর যেন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তবু আমার মনে হয় লালসাহেবের মনের মধ্যে এমন একটি অঙ্কুর ছিল, যার কথা মেয়েটি তো জানতই না, সে নিজেও হয়তো তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। কালে এই অঙ্কুর প্রণয়োত্তর অবসাদে পরিণত হতে পারত।

"ইতিমধ্যে একদিন সমুদ্রতীরবাসী একজন হাওয়াইয়ান খবর আনল ওদের দ্বীপের দক্ষিণ দিকে একটা ব্রিটিশ তিমি-শিকারী জাহাজ এসে ভিড়েছে।

"লালসাহেব খবর শুনে বলল, 'নারকেল আর কলার বদলে ওদের কাছ থেকে দু-এক পাউণ্ড তামাক পাই তো বেশ হয়।'

"স্যালি ওর জন্যে যে বিড়ি বেঁধে দিত অক্লান্ত হাতে, সেগুলি কড়া তো ছিলই—টানতেও নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু বিড়ি টেনে ওর যেন মন উঠত না। হঠাৎ সত্যিকার তামাকের জন্যে ওর সমস্ত মনটা যেন পিপাসিত হয়ে উঠল। কতদিন যে পাইপ টানেনি, এখন পাইপ টানার সম্ভাবনায় ওর জিভে যেন জল আসতে লাগল। স্যালি তার প্রেমে অন্ধ; তার তখন ধ্রুব বিশ্বাস যে পৃথিবীতে হেন শক্তি নেই যা ওর প্রেমাস্পদকে

চিরকালের মতো ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যদি সংশয় থাকত তাহলে ভাবী অকল্যাণের সম্ভাবনায় ও হয়তো লালসাহেবকে বারণ করত যেতে। দুজনে মিলে পাহাড়ে গিয়ে ওরা ঝুড়ি ভর্তি করে আনলে সরস কমলালেবু, কুড়েঘরের চারদিককার কলাগাছ থেকে সংগ্রহ করল কাঁদি-কাঁদি কলা, নারকেল গাছ থেকে নারকেল, আর আনল রুটিফল ও আম। ঝুড়ি ভর্তি ফলমূল ওরা বয়ে নিয়ে গেল সমুদ্রের ধারে। তারপর ডিঙি বোঝাই করে লালসাহেব ও যে-হাওয়াইয়ান ছেলেটি জাহাজের খবর দিয়েছিল সে—এই দুজনে মিলে দাঁড় দিয়ে ডিঙি বেয়ে পাড়ি দিল। "হ্যালির পক্ষে সেই হল তার প্রণয়ীকে শেষ দেখা।

"পরদিন ছোকরাটি হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। ও যে-গল্পটি বলল তা এই:—বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে ওরা সেই তিমি-শিকারী জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে পৌছল। লালসাহেব চেঁচিয়ে ডাকতে একজন শ্বেতাঙ্গ ওদের জাহাজে উঠে আসতে বলল। ঝুড়িভরতি ফল ওরা দুজনে ডেক্-এ এনে হাজির করল, লালসাহেব সেগুলি স্তূপাকার করে সাজিয়ে রাখলে। তারপর শ্বেতাঙ্গ লোকটির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। মনে হল একটা কিছু যেন বোঝাপাড়া হল ওদের মধ্যে। জাহাজের লোকটি নিচে নেমে গিয়ে খানিকটা তামাক আনতেই, লালসাহেব খানিকটা তামাক যেন ছোঁ মেরে নিয়ে পাইপ ধরাল। ছেলেটি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল, কী রকম আকুল আগ্রহে পাইপ টেনে লালসাহেব একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর জাহাজের লোকেরা ওকে ডেকে নিয়ে গেল ক্যাবিন্-এ। খোলা জানালা দিয়ে ছেলেটি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল—বোতল আর গেলাশ বার করা হল, লালসাহেবের একসঙ্গে ধূমপান ও সুরাপান চলতে লাগল। ওরা ওকে কি-যেন প্রশ্ন করায় ও মাথা নেড়ে হাসল। যে লোকটির সঙ্গে ওদের প্রথম সম্ভাষণ হয়েছিল সেও একটু

হেসে গেলাশ ভরে দিল দ্বিতীয় বার। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে সুরাপান চলছে. দেখে দেখে ছেলেটির ক্লান্তি ধরে গেছে—কথা শুনছে অথচ কিছু বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ পরে ও ডেক্-এর ওপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। আচমকা গায়ের ওপর একটা পদাঘাতে ওর ঘুম ভেঙে যেতে ছেলেটি বুঝতে পারল জাহাজ চলতে শুরু করেছে। দেখল হাতের ওপর মাথাটা রেখে টেবিলের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে বসে লালসাহেব অঘোরে ঘুমচ্ছে। ওকে জাগিয়ে দেবার জন্য ছেলেটি পা বাড়িয়েছে, এমন সময় একটা লোক চোখ পাকিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল, শক্ত হাতে ওর হাত ধরে বিড় বিড় করে গালাগাল দিতে দিতে জাহাজের কানার দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলল। ছেলেটি কিছু না বুঝতে পেরে ভয়ে চেঁচিয়ে সাহেবকে ডাকল। পর মুহূর্তে কোলপাঁজা করে উঠিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল জলে। অসহায় অবস্থায় ছেলেটি কোনোমতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ওর ডিঙিটা গিয়ে ধরল, সেটা অদূরেই ভেসে চলেছিল। ডিঙিতে উঠে হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে ও দাঁড় বেয়ে তীরে এসে পৌঁছুল।'

"ব্যাপারটা যা ঘটল, তা অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তিমি-শিকারী জাহাজটাতে খুব সম্ভব মাল্লার অভাব ঘটেছিল, নেটিব খালাসী কারও কারও হয়তো অসুখ করেছিল, হয়তো বা কেউ কেউ চম্পটও দিয়েছে। মোটকথা লালসাহেবকে জাহাজের কাপ্তেন হয়তো বলেছিল মাল্লা হিসাবে যোগ দিতে—ও রাজী না হওয়ায় ওরা ওকে প্রচুর মদ গিলিয়ে একপ্রকার জোর করেই ধরে নিয়ে গেল।

"স্তালির তার প্রণয়ীর শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল—তিনটা দিন ও কাতর চীৎকার করে কেঁদেই কাটাল। দ্বীপের লোকেরা ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল বিস্তর। কিছুতেই ওর মন মানে না। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিল। তিন দিন অবিরত অশ্রুবর্ষণের পর অবসন্ন হয়ে ও যখন

চুপ করল, তখন ও যেন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। সারা দিন ও গালে হাত দিয়ে চুপচাপ সমুদ্রের ধারে বসে থাকে—মনে মনে আশা হয়তো ছাড়া পেয়ে লালসাহেব পালিয়ে আসবে—ফিরে আসবে ওর কাছে। ঘন্টার পর ঘন্টা শাদা বালির ওপর বসে থাকে, গাল বেয়ে অঝোরে ঝরতে থাকে চোখের জল। রাতের অন্ধকার যখন নামে, যখন কিছু আর দেখা যায় না তখন ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে খাড়ি পার হয়ে ও বাড়ি ফিরে আসে। এই সেদিনও এই শূন্য কুড়েঘরটি ওদের প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। লালসাহেব আসার আগে স্থালি যাদের সঙ্গে থাকত সেই আত্মীয়েরা ওকে কত করে বলল ওদের কাছে ফিরে আসতে। তাদের অনুরোধে উপরোধে ও কানই দিল না, কারণ তখনও ওর স্থির বিশ্বাস ওর প্রেমাস্পদ ফিরে আসবে। চারমাস পর স্থালির একটি মৃত সন্তান প্রসব হল। আঁতুড়ের জন্য যে বুড়ী ধাই এসেছিল, সে প্রসবের পর থেকে স্থালির সঙ্গেই থেকে গেল।

"স্থালির জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। আগেকার সেই অসহ্য শোকাবেগ কালক্রমেখানিকটা প্রশমিত হল বটে,কিন্তু তার জায়গা জুড়ে একটা গভীর বিষাদ মনের মধ্যে বাসা বাঁধল যেন চিরকালের মতো। এ-দেশী লোকদের মধ্যে সচরাচর এরকম দেখা যায় না। এদের অনুভূতি এবং তার প্রকাশ সচরাচর মনের উপরিতলেই সীমাবদ্ধ থাকে—এত গভীরে প্রবেশ করে না। স্থালির প্রেম যেন অবিনশ্বর, স্থান কালের অতীত। ওর স্থির বিশ্বাস লালসাহেব একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। সর্বদাই ও যেন প্রেমাস্পদের আসার আশায় বসে আছে—যখনই কেউ নারকেল গাছের সাঁকো বেয়ে আসে তখনই ও চোখ তুলে চায়। ভাবটা এমন—এতদিনে ও বুঝি ফিরে এল।"

নীলসন্ কিছুক্ষণ চুপ করে অস্ফুট সুরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাপ্তেন জিগগেস করল, "শেষ পর্যন্ত কী হল স্থালির?"

নীলসন্ কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "কী আর হবে, তিন বছর বাদে আর একজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গ নিল।"

কাপ্তেন হেঁ-হেঁ করে হেসে বিজ্ঞের মতো বলল, "ওই ওদের রীতি।" কথাটা শুনে নীলসনের সমস্ত শরীর মন যেন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেল। এই মোটা লোকটার প্রতি ওর মনে কেন যে এত গভীর বিতৃষ্ণা জমে উঠছে, নীলসন্ ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না। পরক্ষণেই ওর মন আবার ফিরে গেল সেই পঁচিশ বছর আগেকার দিনে, সেই প্রথম যখন সে এই দ্বীপে পা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করার পর মনে মনে ও কী রঙিন ছবিটাই না এঁকেছিল। ডাক্তারের একটি কথায় সে-ছবি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। রুগ্ন ক্লান্ত মানুষটি সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এল সুদূর বিদেশে। প্রথম প্রথম এসেছিল এপিয়া বন্দরে—সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের অপরিমিত মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ওর ভালো লাগেনি; যে-কটি মাস ওর হাতে আছে সে-কটি মাস ও অতি সাবধানে কৃপণের ধনের মতো খরচ করতে চায়। এপিয়া ছেড়ে নীলসন্ চলে এল এই নির্জন দ্বীপে, ডেরা নিল একজন আধা-ইউরোপিয়ান দোকানদারের বাড়িতে। এ-জায়গা থেকে মাইল দুয়েক দূরে ছিল সেই দোকানঘর, ঠিক এই গ্রামের প্রান্তে। একদিন নারকেল বীথির তলা দিয়ে, শ্যামল ঘাসের ওপর দিয়ে আপন মনে নীলসন্ বেড়াতে চলেছে। হঠাৎ চোখ গেল স্যালির কুড়েটির দিকে। এমন মনোরম পরিবেশ, এতখানি সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দেখতে পেল স্যালিকে। স্যালির মতো সুন্দরী ও আগে কখনো দেখেনি। ডাগর কালো চোখে গভীর বেদনার ছায়া—নীলসনের হৃদয়টাকে যেন মোচড় দিল। হাওইয়ানদের মধ্যে সুন্দরীর অভাব নেই—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওদের দেহ সৌষ্ঠবে কেবল শরীরটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে, মনের সঙ্গে যেন এই দৈহিক সৌন্দর্যের কোনো যোগ নেই। কিন্তু স্যালির

কালো চোখে কী গভীর রহস্যময় বেদনা! একটা সকরুণ সন্ধানী মন যেন ওর দৃষ্টিতে বাসা নিয়েছে। সেই দোকানদারের মুখে সমস্ত কথা শুনে স্থালির প্রতি নীলসনের মায়া হতে লাগল। "আচ্ছা, ওর সেই প্রেমিক কি কখনো আবার ফিরে আসবে?" নীলসন্ জিগগেস করল।

দোকানদার বলল, "আরে ক্ষেপেছেন মশাই। তিমি-শিকারী জাহাজের মাল্লারা সাধারণতঃ বছর দুই কাজ না হলে একটি পয়সাও পায় না। তদ্দিনে স্থালির কথা ও নিশ্চয় ভুলে গেছে। ওকে ফুসলিয়ে ধরে আনা হয়েছে, ঘুম ভাঙার পর একলা টের পেয়ে লালসাহেবের মাথায় নিশ্চয় খুন চেপেছিল। কিন্তু তখন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। মাসখানেক যেতে না যেতে ও নিশ্চয় মনে মনে ভেবেছে এ-যেন শাপে বর হল, স্থালির হাত থেকে অদৃষ্টের চক্রান্তে অতি সহজে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।"

স্থালির প্রণয়কাহিনী নীলসন্‌কে যেন পেয়ে বসল। সে নিজে রুগ্ন ও দুর্বল, তাই বোধ করি লালসাহেবের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের ছবিটা কল্পনা করতে ওর ভালো লাগত। ওর নিজের চেহারা নগণ্য কুশ্রী ছিল বলেই সুগঠিত সুদর্শন লোকদের প্রতি সহজেই ওর মন আকৃষ্ট হতো। যাকে বলে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া, সেরকম ভালোবাসা ও কাউকে কখনো বাসেনি—ওর প্রতিও সেরকম ভাবে কেউ কখনো আকৃষ্ট হয়নি। এই দুটি তরুণতরুণীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি আত্মনিবেদন এ-জিনিসটা ওর কাছে বড়ো মধুর লেগেছে। এদের প্রেমে যেন অনির্বচনীয়তার আস্বাদ, যেন অনন্তের ছোঁওয়া লেগেছে। কিছুদিন পর পর ও খাড়ির ধারের সেই ছোট্ট কুড়েঘরটির দিকে বেড়াতে যেতে লাগল। ভাষা আয়ত্ব করার ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, পরিশ্রমী মন—নিয়মিত পড়াশুনো করা ওর অভ্যাস—তা ছাড়া সামোয়ান ভাষা শেখবার জন্য ও ইতিপূর্বেই অল্পবিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেছে। এতদিনকার মজ্জাগত অভ্যাস ও

গবেষণা করা. স্যাস্কোয়ান ভাষার ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করার কাজে ও তখন ব্যস্ত। সেই অছিলায় ও বুড়ী ধাইয়ের সঙ্গে ভাব করল। একদিন বুড়ি ওকে স্যালির ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, খেতে দিল সরবত ও সিগারেট। বুড়ি গপ্পে লোক, একজন শ্রোতা পেয়ে খুব খুশি। বুড়ী যে সময়টা কথা বলতে ব্যস্ত. সে-সময়টা নীলসন্ স্যালির দিকে তাকিয়ে থাকে। নেপল্‌স যাদুঘরে-রাখা সাইকির মূর্তিটি মনে পড়ে যায়, অক্ষতযোনি কুমারীর মতো শুচিস্নাত স্নিগ্ধ মূর্তি, মনেও হয় না স্যালি কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

দু'তিনটা দিন এভাবে দেখাশুনো হবার পর স্যালি ওর সঙ্গে প্রথম কথা বলেছে। কথা আর কিছু নয়—একটি মাত্র প্রশ্ন—এপিয়াতে থাকতে লালসাহেব বলে কাউকে নীলসন্ দেখেছে কি না। দু'দুটো বছর গত হয়েছে—কিন্তু তাহলে কি হয়, স্পষ্ট বোঝা যায় লালসাহেব ওর দিনের চিন্তা, রাত্রের স্বপ্ন।

অল্প কিছুদিন যেতেই নীলসন্ বুঝতে পারল সে স্যালির প্রেমে পড়েছে। দস্তরমতো চেষ্টা করে তবে ও খাড়ির দিকে প্রত্যহ যাওয়া বন্ধ করেছে। মন ওর সারাক্ষণ পড়ে থাকে স্যালির কাছে। প্রথম দিকে ও ভাবত অল্প যে-কটা দিন ও বাঁচে, সে-কটা দিনের জন্য মাঝে মাঝে যেন ও স্যালিকে দেখতে পায়, স্যালির দুটো কথা যেন শুনতে পায়। শুধু দেখা পাওয়া, শুধু কথা শোনা—ব্যাস্ এর বেশি ও চায় না। এই কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমের কথা ভাবতেও যেন ওর গায়ে শিহর লাগত। সত্যি, স্যালির কাছ থেকে ও তো আর কিছু চায় না, ও শুধু চায় স্যালিকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনতে। এদিকে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার খোলা জায়গায় থাকার গুণে ওর শরীরের অভাবনীয় ভাবে উন্নতি হতে লাগল। রাত্রে সেই ঘুষঘুষে জ্বর তাপমানের মাত্রা ছাড়িয়ে আর ওঠে না, কাশিটাও কম, ওজন বাড়তে শুরু করেছে, ছ'মাস হয়ে গেল ওর একটিবারও আর

রক্তবমি হয়নি। হঠাৎ একদিন ও বুঝতে পারল হয়তো ও বেঁচে যেতেও পারে। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে ও বিস্তর পড়াশুনো করছে, যা শিখেছে জেনেছে তা থেকে ওর মনে আশা জাগল, যে খুব সাবধানে চললে হয়তো রোগটাকে সে বাধা দিতে পারবে। আবার যেন ভবিষ্যতের দরজা ওর কাজে খুলে গেল—কী করবে না করবে ইত্যাদি সব কথা ও ভাবতে লাগল। বাইরের কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া—সেটা অবশ্য সম্ভব হবে না কিন্তু এই দ্বীপে বাসা বেঁধে ও অনায়াসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। ওর সামান্য অর্থসম্পত্তি যা আছে অন্যত্র সেটা অকিঞ্চিৎকর হলেও, এ-জায়গায় জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট। নিতান্ত যদি কোনো কাজ নিয়ে থাকতে হয় তো নারকেল গাছের চাষ করতে পারে, তা ছাড়া দেশ থেকে ওর পিয়ানো এবং বইগুলোও তো এনে ফেলতে পারে। নীলসনের বুঝতে বাকি নেই এ-সমস্তই হল ওর নিজের মনকে আঁখিঠারা, নানান অজুহাতে ওর মনের সত্যকার বাসনাটি ঢাকা দেবার চেষ্টা।

স্যালিকে ও একান্তভাবে চায়। কেবল ওর দেহের সৌন্দর্যকে যে ও ভালোবাসে তা নয়, স্যালির আকুল চোখে যে বিরহী মনের প্রকাশ সে মনটাকেও নীলসন্ আপন করে পেতে চায়। প্রেমের উচ্ছ্বাসে ও স্যালিকে অভিভূত করে দেবে, ভুলিয়ে দেবে ওর দুঃখ। আত্মনিবেদনের মোহ নীলসন্‌কে তখন এমন করে পেয়ে বসেছে যে কল্পনায় সে দেখতে লাগল—ওর ফিরে পাওয়া যৌবনের আতপ্ত আনন্দটুকু ও যেন স্যালির সঙ্গে সমানভাবে সম্ভোগ করছে।

নীলসন্ তাদের মিলিত জীবন যাপনের কথা স্যালির কাছে প্রস্তাব করল। স্যালি তাতে কান দিল না। প্রত্যাখ্যাত হবে সে-কথা ও জানত কিন্তু তাতে নীলসন্ দমল না কারণ তার স্থির বিশ্বাস একদিন না একদিন স্যালি ওর কছে ধরা দেবেই। প্রেমের দুর্জয় স্রোত একদিন

স্যালির সমস্ত আপত্তি ভাসিয়ে নেবেই। বুড়ী দাইমার কাছে একদিন কথাটা পাড়তে ও খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গেল—আবিষ্কার করল যে বুড়ী ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা ওর গোপন প্রেমের কথা অনেক আগেই টের পেয়েছে, এমন কি ওরা স্যালিকে বার বার নাকি বুঝিয়েছে নীলসনের প্রস্তাবে রাজী হতে। আসল ব্যাপারটা হল এই যে, সব নেটিব-মেয়েই শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ঘর করাটা সৌভাগ্য মনে করে। আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে, ওদের চোখে নীলসন্ হল দস্তুরমতো বড়লোক। দোআঁসলা যে-দোকানদারের বাড়িতে নীলসন্ থাকত, সে-লোকটি স্যালির মুখের ওপরেই বলে বসল যে এমন সুযোগ একবার হারালে আর মিলবে না। তাছাড়া স্যালি নিতান্ত বোকা না হলে আরো অনেক আগেই লালসাহেবের আশা ত্যাগ করত। এতদিন কেটে গেল আর কি সে কখনও ফেরে! স্যালির কাছ থেকে বাধা পেয়েই যেন নীলসনের কামনা উদ্দাম হয়ে উঠল, ওর আগেকার সেই কামগন্ধ-হীন প্রেম এখন উদগ্র বাসনায় পরিণত হল। ও যেন প্রতিজ্ঞা করে বসল কোনো বাধা ও মানবে না, স্যালিকে এক মুহূর্তের জন্য ও শান্তি দেবে না। শেষ পর্যন্ত নীলসনের অধ্যবসায় এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধ-উপরোধ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনারই জয় হল—স্যালি রাজী হল। বিজয় গর্বে উৎফুল্ল হয়ে তার পরদিন নীলসন্ ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখল আগের রাতে স্যালি তাদের সেই প্রেমের সুখস্মৃতি ঘেরা ছোট কুড়েঘরটি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। বুড়ী স্যালিকে গালমন্দ দিতে দিতে ছুটে এল, নীলসন্ তার কথায় কান না দিয়ে বলল তাতে হয়েছে কি, ওই কুড়েঘরটার জায়গায় ও বাংলো-প্যাটার্ন-এর বাড়ি তুলবে। তা ছাড়া এ-কথা তো অস্বীকার করার জো নেই যে পিয়ানো ও তার সঙ্গে এক লাইব্রেরি বই যদি আনতে হয় তো বিলিতি কায়দায় বাড়িই ভালো হবে। এই হল ছোট্ট এই কাঠের বাড়ি তৈরি করার

ইতিহাস। কত বছর কেটে গেল এখানে স্যালিকে বিয়ে করার পর। স্যালি যতটুকু ওকে দিত, ততটুকুতে ও আর কতদিন খুশি থাকবে। প্রথম কয়েকটা দিনের বিহ্বল আবেগের পর ও বুঝল, নিতান্ত অনুপায় হয়েই স্যালি নিজেকে ওর কাছে দিয়েছে, যে দেহটা ওকে দিয়েছে তার প্রতি ওর নিজের যেন বিন্দুমাত্র মমতা নেই। ওর গভীর কালো চোখে যে বেদনাতুর মনটিকে দেখেছিল—সে মনটা চিরকালই ওর যেন নাগালের বাইরে থেকে গেল। নীলসন্ বুঝল ওর প্রতি স্যালি সম্পূর্ণ উদাসীন। এখনো ও লালসাহেবকেই ভালোবাসে, এখনো ও যেন প্রেমাস্পদের আসার আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। লালসাহেব যদি কোনোদিন ওকে অঙ্গুলি সংকেতে ডাকে, তবে ও সবকিছু উপেক্ষা করে ছুটে চলে যাবে, নীলসনের দয়া মায়া প্রেম কোনো কিছু ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এ-সম্ভাবনার কথা ভেবে লোকটা যেন মরীয়া হয়ে গেল, স্যালির নিগূঢ় মনের দুর্ভেদ্য দুর্গের দেয়ালে ও যেন মাথা কুটতে লাগল। স্যালির দিক থেকে একটুও সাড়া মিলল না, নীলসনের মনটা তেতো হয়ে উঠল। ভালোবাসা দিয়ে ও স্যালির হৃদয় আর্দ্র করার চেষ্টা করল, মন ভিজল না। উপেক্ষার ভান দেখাল, স্যালি লক্ষ্যও করল না। কোনো কোনো দিন মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে ও যখন গালিগালাজ করত, স্যালির চোখ থেকে তখন অঝোরে জল ঝরে পড়ত, মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরত না। কোনো কোনো দিন নীলসনের মনে হতো স্যালির হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই, যা আছে সেটা ওর নিজেরই ভুয়ো কল্পনা—মন্দিরই নেই তো স্যালির মনের মন্দিরে ও ঢুকবে কা করে। প্রেমের শৃঙ্খল থেকে ও এখন মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু সামান্য দোরটুকু খোলার পর্যন্ত ওর শক্তি নেই। দুয়োর খুলে খোলা হাওয়ায় ও যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে—সেটুকু সামর্থ্যও নীলসন্ হারিয়ে ফেলেছে। এ যেন দগ্ধে-দগ্ধে মরা। আস্তে আস্তে ওর আশা ভরসা সব নির্মূল হয়ে

গেল, ওর মনের আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হঠাৎ যখন দেখে স্যালির দৃষ্টি খাড়ির ওপরকার সংকীর্ণ সাঁকোর ওপর নিবদ্ধ তখন আর সে রেগে জলে পুড়ে মরে না, ওর মনটা কেবল তিক্ত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। নিতান্ত কতকগুলো সুবিধা ও অভ্যাসের বন্ধনে ওরা এখন পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। বছরের পর বছর, একঘেয়ে এই রকম জীবন কেটে গেছে। ওর সেই পুরাতন মোহের কথা মনে পড়লে আজকাল নীলসনের হাসি পায়। স্যালি এখন পরিণতবয়স্কা—এ-দেশী মেয়েরা অল্পতেই বুড়ী হয়। এখন ওর প্রতি নীলসনের কেবলমাত্র অনুকম্পা আছে—প্রেম নেই। স্যালি ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। নীলসন্ তার পুঁথিপত্র ও পিয়ানো নিয়েই সন্তুষ্ট। নীলসনের ভাবনাগুলো যেন কথায় রূপ নিচ্ছে। ও বলে চলল: "পেছন ফিরে যখন তাকাই, লালসাহেব ও স্যালির উদ্দাম প্রেমের কথা যখন ভাবি, তখন আমার মনে হয়, ওদের ভাগ্য ভালো যে ওদের প্রেম যখন সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছেচে ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অদৃষ্টের দেবতা তাদের দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ওরা দুঃখ পেয়েছে সত্যি, কিন্তু এ-দুঃখ কাব্যের দুঃখের মতো সুন্দর। প্রেমের বিয়োগান্ত পর্ব থেকে ওরা চিরকালের মতো বাদ পড়ে গেছে।"

কাপ্তেন বলল, "আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বিচ্ছেদ কিম্বা মৃত্যুই যে প্রেমের সমাপ্তি ঘটায়, তা নয়। আরো কিছুকাল একসঙ্গে থাকলেই ওদের একজনের না একজনের প্রেমে ভাটা পড়তই। সেটা কি শোচনীয় হতো ভেবে দেখুন। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যে মেয়েকে একদিন আপনি ভালোবেসেছেন, যার ক্ষণিক অদর্শনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার ঠেকত, মনে করুন এমন একটা দিন এল যখন সে যদি চলেও যায় তবু আপনার কিছু আসে যায় না। সেটা কী সাংঘাতিক হবে বলুন তো! প্রেমের আসল ট্রাজিডি কোনখানে জানেন—যখন অনুরাগ চলে গিয়ে বিরাগে পরিণত হয়।"

নীলসন্ কথা বলে চলেছে, ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। কথা অবশ্য ও বলছিল কাপ্তেনকে উদ্দেশ করে। আসলে কিন্তু ও কথা দিয়ে ওর ভাবনাগুলো গেঁথে চলেছিল আপন মনে। ওর চোখ আছে কাপ্তেনের দিকে, কিন্তু দেখছে না। হঠাৎ যেন নীলসনের চোখের সামনে একটা মূর্তি ভেসে উঠল, সে-মূর্তিটি কাপ্তেনের নয়, অপর কারুর। এক ধরনের আয়না আছে যার উপর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে বিকৃত ভাবে, কখনো দেখায় বিশ্রীভাবে চ্যাপ্টা, কখনো বা উৎকটভাবে লম্বাটে। এ-ক্ষেত্রে ঠিক যেন তার উলটো হল, এই বিদঘুটে-মোটা কুৎসিত বুড়ো কাপ্তেনের মধ্যে নীলসন্ যেন একটি বালককে দেখতে পেল। কাপ্তেনের দিকে একবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ও দেখে নিল। লোকটা সত্যি কি নিছক খেয়ালের বশে এই দ্বীপে এসে পড়েছে? ওর বুকের ভেতরটা যেন দুরু-দুরু করতে লাগল, নিশ্বাস ফেলতে একটু যেন কষ্ট হচ্ছে। একটা অদ্ভুত সন্দেহ ওর মনে জেগেছে। ও যা ভাবছে তা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু কেন, সত্যিও তো হতে পারে!

আচমকা নীলসন্ জিগগেস করল, "আপনার নাম কি?"

একটা বিশ্রী ধরনের হাসিতে কাপ্তেনের মুখের সমস্ত রেখাগুলো যেন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কুটিল বিদ্বেষে ভরা একটা কদাকার মুখভঙ্গী করে কাপ্তেন বলল,

"কদ্দিন আগে ছাই ও-নামটা শুনেছি—আমি নিজেই প্রায় ভুলতে বসে-ছিলাম আর কি! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মশাই, গত তিরিশটা বছর এই অঞ্চলের লোকেরা সদাসর্বদা আমায় লালসাহেব বলেই জানত।"

একটা শব্দহীন হাসিতে ওর প্রকাণ্ড শরীরটা একবার যেন কেঁপে উঠল। হাসিটা দস্তুরমতো অশ্লীল। নীলসন্ ঘেন্নায় শিউরে উঠল। লালসাহেবের যেন খুশি আর ধরে না, হাসির আবেগে ওর জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

নীলসন্ অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি স্ত্রীলোক সেই ঘরে ঢুকল। নেটিব মেয়ে, চেহারাতে খানিকটা যেন প্রভুত্বের ভাব ফুটে আছে, দোহারা চেহারা কিন্তু মোটা নয়, রঙ সাধারণতঃ পরিণত বয়সে নেটিবদের যেমন হয় অর্থাৎ কালো; চুলের রঙ ধবধবে শাদা। একটা ঢিলেঢালা কালোরঙের গাউন গায়ে, এত পাতলা কাপড় যে তার ভেতর দিয়ে স্ত্রীলোকটির প্রকাণ্ড ছুটি পয়োধর দেখা যাচ্ছে।

সেই চরম মুহূর্ত এসেছে এতদিন পরে।

স্যালি এসেছে কী একটা সাংসারিক কথা বলতে। কথা বলা হল, নীলসন্ জবাবও দিলে। ওর গলার আওয়াজটা যে সহজ ও স্বাভাবিক নয়, স্যালি সে-কথা টেরও পায়নি। জানলার ধারে যে-লোকটা বসে ছিল, তাকে যেন দেখেও দেখল না। স্যালি বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—পরম মুহূর্ত এল আর চলে গেল।

এত গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছে নীলসন্ যে কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে যেন আর কথাই বেরতে চায় না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আজ একটু যদি আমাদের এখানে ডিনার খেয়ে যান তো খুব খুশি হব। সামান্য চারটি খাওয়া—কী-ই বা আছে!"

লালসাহেব বলল, "সে বোধহয় আমি পারব না। এই গ্রে-লোকটাকে ধরতে হবে। তাকে তার মালগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়তে চাই। কালই এপিয়ায় ফিরতে চাই কিনা।"

"বেশ, আমি একটা ছোকরা দিচ্ছি, সে আপনাকে গ্রে-র বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দেবে।"

"তাহলে তো দিব্যি হয়।"

লালসাহেব অতি কষ্টে তার প্রকাণ্ড বপুটিকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নীলসন্ ইতিমধ্যে একটি ছোকরাকে ডেকে এনেছে।

ছোকরাটিকে ও বুঝিয়ে দিল কাপ্তেন কোন দিকে যেতে চায়। ছোকরা সাঁকো বেয়ে চলতে শুরু করল। লালসাহেব পিছন পিছন যাবার উদ্যোগ করছে, নীলসন্ বলল, "দেখবেন, পড়বেন না যেন।"

"কিছুতেই পড়ছি না।"

খাড়ির এদিক থেকে নীলসন্ দেখতে লাগল লালসাহেব সাঁকো বেয়ে ওপারের নারকেল-বীথির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও কিন্তু দেখছে তো দেখছেই। তারপর হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। ঐ-লোকটির জন্যেই ও তাহলে সুখী হতে পারেনি, ঐ-লোকটাকেই স্যালি এতদিন ধরে ভালোবেসে এসেছে, ওরই জন্যে আকুল হয়ে চেয়ে থাকত পথের দিকে? খুবই অদ্ভুত বলতে হবে। আচমকা যেন খুন চেপে গেল মাথায়, ইচ্ছে হল হাতের কাছে যা-কিছু পায় সব যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। ও ঠকে গেছে। দুজনের দেখা হয়েছে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু পরস্পরকে চিনতে পারেনি। ও হাসতে লাগল—এ-হাসি যেন নিজের অদৃষ্টকে পরিহাস করার হাসি, হাসছে তো হাসছেই—পাগলের মতো হাসছে। বড় ঠকানটা ঠকিয়েছে যা হোক। এখন তো আর চারা নেই—যৌবন আর ফিরে আসবে না। নীল্সনের বয়েসটা আজ যেন বেশি করে জানান দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর স্যালি এসে খবর দিল—ডিনার তৈরি। স্যালির মুখোমুখি বসে ও খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। মনে মনে ও তখন ভাবছে, আচ্ছা স্যালিকে যদি বলে দি ; যদি বলি যে ঐ মোটা বিদঘুটে বুড়োটা হল ওর সেই বালিকাবয়সের প্রেমাস্পদ, যার কথা ভাবতে আজও ওর বুকে শিহর জাগে? নাঃ, বলবে না। আগে যখন স্যালির জন্য দুঃখ পেয়ে স্যালির প্রতি ওর রাগ হতো—সে সময় এ-খবরটা জানাতে ওর একটুও বাধত না। তখন আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে

পারলেই যেন ও খুশি হতো, ওর তখনকার সেই রাগ অনুরাগেরই নামান্তর। আজ ওর কিছুতে আসে যায় না।

"কি চাইছিল ঐ লোকটা ?" স্যালি জিগগেস করলে।

চট করে জবাবটা দিতে পারল না। স্যালিও আজ পরিণতবয়স্কা, মোটাসোটা নেটিব বৃদ্ধা। এমন উন্মাদ ভাবে কেমন করে ও স্যালিকে ভালোবেসেছিল—আজ সে-কথা ভাবতেও ওর যেন আশ্চর্য লাগছে। ওর হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ উজাড় করে নীলসন্ একদিন স্যালির পায়ের কাছে ঢেলে দিয়েছিল। স্যালি ফিরেও তাকায়নি। সব নষ্ট হয়ে গেছে—কিছু আর বাকি নেই! এখন স্যালির দিকে তাকালে কেবল ঘেন্না হয়। এতকাল পর ওর ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেছে। স্যালির প্রশ্নের জবাবে নীলসন্ বললে, "ও একটা জাহাজের কাপ্তেন—এপিয়া থেকে এসেছে।"

"ও।"

"আমার দেশের খবর এনেছে ও—বড়দাদার খুব অসুখ, আমায় দেশে ফিরে যেতে হবে।"

"অনেক দিনের জন্য যাবে নাকি ?"

নীলসন্ অনিশ্চয়তার ভঙ্গীতে কাঁধটা একটু নাড়াল—কোনো জবাব দিল না।

—ক্ষিতীশ রায়





লাঞ্চ

অভিনয় দেখতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হাত-পাখার ইঙ্গিতে আমায় ডাকলেন ইণ্টারভেল্-এর সময়। আমি পাশে গিয়ে বসলাম। অনেকদিন পরে দেখা। কে একজন ওর নামটা উল্লেখ করেছিল, তা না হলে হয়তো চেনা শক্ত হতো। ভদ্রমহিলা খুব যেন খুশি হয়েছেন, সোৎসাহে বলতে শুরু করলেন :

"তাইতো, সেই কতদিন আগে প্রথম দেখাশোনা। সময় কি ছাই কারো জন্যে বসে থাকে। সময় চলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বয়সও বেড়ে চলে। এই তো, দেখুন না আপনার আমার সেই যৌবনের দিনগুলো আর কি কখনো ফিরে আসবে? মনে পড়ে সেই প্রথম আপনার সঙ্গে যখন দেখা। আপনি আমায় লাঞ্চ-এ নেমন্তন্ন করেছিলেন।"

মনে নেই আবার!

বিশ বছর আগেকার কথা; তখন আমি থাকতাম প্যারিস-এ। লাতিন কোয়ার্টার-এর ওপর ছোট্ট একখানা ঘরে ছিল আমার আস্তানা, জানলা খুললেই গোরস্তান দেখা যেত। যৎসামান্য রোজগার করতাম, কায়-ক্লেশে দিন চলত। আমার লেখা একটি বই পড়ে ভদ্রমহিলা সে-বই সম্বন্ধে আমায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওঁর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করলাম। জবাবে উনি আর একটা চিঠি লিখে জানালেন: "কিছুদিনের মধ্যেই আমি বেরচ্ছি। পথে প্যারি নেবে যাবার ইচ্ছা; সে-সময় আপনার সঙ্গে আলাপ হলে বেশ হতো। তবে হাতে সময় খুব অল্প। আসচে বিষ্যুতবার সকালবেলাটা আমার লুক্সেমবূর্গ-এ

কাটবে—দুপুরবেলা যদি লাঞ্চ-এ দেখা হয়ে যায় 'ফোইয়োঁ'র রেস্তোরাঁয় তাহলে খুবই খুশি হব·· ইত্যাদি।"

ফোইয়ো হল অতি উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের রেস্তোরাঁ। এ-হেন রেস্তোরাঁর চৌকাঠ কোনোদিন পেরব এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু তখন আমার অবস্থা অন্যরকম—অভিসারের প্রস্তাবে মনটা রঙিন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সে-বয়সে কোনো মেয়েকে না বলা যে-কোনো পুরুষের পক্ষে শক্ত। আর বয়সের দোহাই-ই বা দিই কেন, মেয়েদের মুখের উপর কঠিন ভাবে না-বলাটা যে-কোনো পুরুষমানুষের পক্ষে দুঃসাহসিক ব্যাপার, তা তার যতই বয়স বা অভিজ্ঞতা হোক না কেন। মাসের বাকি দিন ক'টার খরচ বাবদ আমার হাতে তখন মোট মজুত ছিল আশি ফ্রাঙ্ক। মোটামুটি ধরনের লাঞ্চ-এর জন্য পনেরো ফ্রাঙ্ক-এর বেশি খরচ হবার কথা নয়। দিন চোদ্দ কফি বাদ দিলে খরচটা দিব্যি পুষিয়ে যাবে।

আমি চিঠি লিখে আমার নতুনলব্ধ বান্ধবীটিকে জানিয়ে দিলাম যে আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটায় ফোইয়োতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। যতটা অল্পবয়স হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল তার চাইতে বয়স বেশি; চেহারাতেও মাধুর্যের চাইতে গরিমা বেশি। আসলে তখন ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ। মনোজ্ঞ বয়স সন্দেহ নেই, কিন্তু ও-বয়সের মেয়েকে দেখে প্রথম দর্শনে আহা-মরি ভাবের উদ্রেক হওয়াটা একটু অস্বাভাবিক। তাছাড়া প্রথম দেখে আমার মনে হল যে জীবনধারণের জন্য যতগুলো দাঁতের প্রয়োজন, এ-ভদ্রমহিলার যেন তার চাইতে দাঁতের সংখ্যা অনাবশ্যক ভাবে বেশি। দন্তরুচি কৌমুদীর শোভাটা কিছু যেন অত্যধিক। কথা বলেন একটু বেশি, সেটা তবু তত মারাত্মক নয়, বিশেষত এ-ক্ষেত্রে যখন তাঁর বাচালতার বিষয়বস্তু হলাম আমি স্বয়ং। নিজের প্রশংসা নিজে বেশ ধৈর্য ধরে শুনছিলাম।

আহার্যের তালিকা পেয়ে চমকে উঠলাম, এ-রকম সাংঘাতিক দাম হবে কল্পনাও করতে পারিনি। বান্ধবী আমার মনের কথাটা আঁচ করতে পেরেই যেন বললেন—

"লাঞ্চ-এ আমি যৎসামান্য খাই—।"

আমি বেশ দরাজভাবে বললাম, "সে আমি শুনছি না।"

"একটা কোর্স-এর বেশি আমি কিছুতেই খাই না। আমার কি মনে হয় জানেন, আজকাল আমরা বড্ড বেশি খাই—প্রয়োজনের অতিরিক্ত। একটু মাছ হয়তো খাব, এদের এখানে স্যামন পাওয়া যদি যায়।" সে সময়টা স্যামন পাওয়ার কথা নয়, তালিকাতেও কোনো উল্লেখ দেখলাম না। তবু একবার পরিবেশককে ডেকে জিগগেস করলাম একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কিনা।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার, পারি বইকি। এইমাত্র চমৎকার একটি স্যামন এসেছে, এ আমাদের মরসুমের প্রথম স্যামন।"

আমার অতিথিটির জন্য এই স্যামনটি আনতে বললাম। পরিবেশক তাঁকে জিগগেস করল.যে মাছটা তৈরি হতে হতে একটি অন্য কোনো ডিস্ আনবে কিনা।

ভদ্রমহিলা বললেন, "না, না, আমি একটা ডিসের বেশি কিছুতেই খাই না। তবে যদি তোমাদের এখানে কিছু ক্যাভিয়ার পাওয়া যায় তাহলে বিশেষ আপত্তি নেই।"

আমি একটু দমে গেলাম। আমি জানতুম ক্যাভিয়ার দস্তুরমতো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, খরচ হয়তো কুলিয়ে উঠতে পারব না। কিন্তু বান্ধবীকে তো আর সে-কথা বলতে পারি না। পরিবেশককে বললাম ক্যাভিয়ার এনে দিতে। আমি নিজে বেছে নিলাম মটন্ চপ—দামের দিক থেকে ঐটেই সব চেয়ে সস্তা ডিস্।

ভদ্রমহিলা একটু যেন আপত্তির সুরে বললেন,"এটা কিন্তু আপনি ভালো

করছেন না—চপ-এর মতন গুরুপাক খাবারের পর কাজ করা অসম্ভব। পরিপাক শক্তির ওপর অযথা অত্যাচার করাটা আমি পছন্দ করি না।"

তারপর এল পানিয়ের কথা। বান্ধবী বললেন, "লাঞ্চ-এর সময় আমি কিছু পান করি না।" ওঁর কথা ফুরতে না ফুরতে বললাম—

"আমিও না।"

আমার কথাটা যেন শুনতেই পাননি এমন ভাবে উনি বলে চললেন—

"অবশ্য হোয়াইট-ওয়াইন ছাড়া। ফ্রান্স-এর শাদা ওয়াইন-এর মতো লঘু পানীয় আর কোথাও পাওয়ার জো নেই—হজমের পক্ষে আশ্চর্য রকমের উপকারী।"

আমার আতিথেয়তায় একটু যেন উচ্ছ্বাসের অভাব ঘটল। তবু যথা সম্ভব শিষ্টভাবে জিগগেস করলাম—

"কোন ওয়াইন-এর কথা বলব?"

বান্ধবীর দন্তপংক্তির ওপর আবার একটা সুমিষ্ট হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আমার ডাক্তার আবার শ্যামপেন ছাড়া অন্য কিছু পান করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

কথাটা শুনে আমি হয়তো একটু ভড়কে গিয়েছিলাম—আধ বোতল শ্যামপেন অর্ডার দেওয়া গেল! সেই ফাঁকে জানিয়ে দিলাম শ্যামপেন খাওয়া আমার বারণ—ডাক্তারের মানা আছে।

"তাহলে কি পান করবেন আপনি?"

"জল।"

বান্ধবী ক্যাভিয়ার খেলেন, স্যামন খেলেন ও খোশমেজাজে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর মতামত আওড়ে চললেন। আমার সেদিকে মন নেই, আমি কেবল ভাবছি বিল্-এর অঙ্কটা

কী রকম দাঁড়াবে। আমার মটন্ চপ-টা এলে পর তিনি দস্তুরমতো তিরস্কার শুরু করলেন—
"আপনি দেখছি লাঞ্চ-এ বড্ড বেশি খান, এটা কিন্তু ভুল করছেন—আমার মতো অভ্যেস করুন। দেখছেন তো আমি একটা কোর্স-এর বেশি খাই না, এতে শরীর বেশ ঝরঝরে থাকে।"
পরিবেশক আবার যখন তালিকা নিয়ে এল আমি বললাম—
"একটা জিনিসের বেশি আমি খাচ্ছি না।"
বান্ধবী হাতের ইঙ্গিতে পরিবেশককে সরিয়ে দিয়ে বললেন—
"না না, আমি লাঞ্চ-এ কিছু খাই না, সামান্য দাঁতে কাটবার মতো একটা কিছু হলেই হল। খাওয়ার জন্য তো খাওয়া নয়, আলাপ জমাবার জন্যই খাওয়া। আর কিছু খেতে আমি পারব না। অবশ্য এদের এখানে যদি ভালো অ্যাস্‌পারাগস্ কিছু থাকে তবে অন্য কথা। অ্যাস্‌পারাগস্ না চেখে প্যারি ছেড়ে যাওয়া শোচনীয় হবে।"
পরিবেশককে প্রশ্ন করলাম, "মাদাম জানতে চাইছেন তোমাদের এখানে ভালো জাতের অ্যাস্‌পারাগস্ কিছু পাওয়া যাবে কি না।"
আমার একান্ত ইচ্ছে লোকটা যাতে 'না' বলে। প্রশ্ন শুনে লোকটার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভক্ত যেমন দেবীর স্তবগান গায় তেমন ভাবে ও বলতে শুরু করল, ওদের রেস্তোরাঁয় এমন অ্যাস্‌পারাগস্ আছে যা স্বাদে-গন্ধে-রূপে-রসে অতুলনীয়।
আমার অতিথি ভদ্রমহিলা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার খিদে অবশ্য একটুও নেই। আপনি নিতান্ত যদি জোর করেন তাহলে সামান্য একটু অ্যাস্‌পারাগস্…"
আমি আনতে বলে দিলাম।
"ওকি—আপনি একটু খাবেন না?"
"নাঃ, অ্যাস্‌পারাগস্ আমি কখনো খাই না।"

"কেউ কেউ আছে বটে যাদের অ্যাস্‌পারাগস্‌ পছন্দ নয়। আসলে কী হয়েছে জানেন—বেশি মাংস খেয়ে খেয়ে আপনাদের রুচি বিকৃত হয়ে গেছে।"

অ্যাস্‌পারাগস্‌ তৈরি হবার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। মাসের বাকি ক'টা দিন কী করে চলবে সে-ভাবনা চুলোয় গেছে। বিল্‌-এর টাকাটা দিতে পারলে এখন বাঁচি। হয়তো দেখব দশ ফ্রাঙ্ক কম, তখন অতিথির কাছে ধার চাইব কোন লজ্জায়। সে আমি কিছুতেই পারব না। গোনাগুনতি আশি ফ্রাঙ্ক আছে পকেটে—বিল যদি তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে একটা উপায় ঠিক করতে হবে। ঠিক করলাম পকেটে হাত দিয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে উঠব—এই রে পকেট মেরেছে। যদি অতিথির কাছেও যথেষ্ট না থাকে তবে অবশ্য বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। তাহলে ঘড়িটা গচ্ছিত রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না, বলতে হবে পরে টাকা দিয়ে ফেরত নিয়ে যাব।

অ্যাস্‌পারাগস্‌ এল—তাজা লকলকে, রসে টইটম্বুর—দেখলেই জিবে জল আসে। সদ্য গলিত মাখনের গন্ধ নাকের ভেতর যেন শুড়শুড়ি দিচ্ছে। মেয়েটি লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে গবগব অ্যাস্‌পারাগস্‌ গিলতে শুরু করে দিল। আমি আর কি করি—স্বভাবসুলভ বিনয়ের সুরে ততক্ষণে বলকান প্রদেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে একতরফা আলোচনা শুরু করেছি। শেষপর্যন্ত ওর ভোজনপর্ব তো সমাধা হল।

আমি জিগগেস করলাম, "কফি?"

"হাঁ, কেবল একটু আইসক্রীম আর কফি।"

এখন আমার মরিয়া অবস্থা। নিজের জন্য কফি ও ভদ্র মহিলার জন্য আইসক্রীম ও কফির অর্ডার দিয়ে দিলাম।

আইসক্রীম খেতে খেতে বান্ধবী বললেন, "দেখুন, যত দিন যাচ্ছে ততই

একটা বিশ্বাস আমার দৃঢ় হচ্ছে—সেটা হল এই যে 'আরো কিছু খেতে পারি' এইরকম যখন মনের অবস্থা, ঠিক সেই সময় টেবিল ছেড়ে ওঠা উচিত।"

অস্ফুটগলায় জিগগেস করলাম,

"আজ্ঞে, এখনো কি আপনার পেট ভরেনি?"

"না না, আমার খিদে একটুও নেই। আসলে আমি তো আর লাঞ্চ খাই না—সকালে এক কাপ কফি, তারপর একেবারে রাত্তিরে ডিনার। লাঞ্চ-এ এক কোর্সের বেশি আমি কক্ষনো খাই না। আমি ভাবছিলাম আপনার কথা।"

"ও হ্যাঁ, বুঝলাম।"

এরপর একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। কফির জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় প্রধান পরিবেশক হাসিমুখে প্রবেশ করল—হাতে তার ঝুড়ি ভরতি প্রকাণ্ড পীচ। পীচগুলো যেন কুমারী মেয়ের মতো লজ্জারুণ, ইতালিয়ান ছবির মতো ওদের রঙের ঐশ্বর্য। কিন্তু পীচ তো তখন বাজারে ওঠবার কথা নয়। কী ভীষণ দাম হবে ভগবানই জানেন। খানিকটা পরে আমিও দামটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে একটা পীচ তুলে নিলেন। "দেখুন মাংস খেয়ে আপনি পেট ভরিয়ে ফেলেছেন, (হায় রে আমার তুচ্ছ একটি মটন্ চপ!) আর কিছু খাবার উপায় রাখেননি। আমি সামান্য অল্পসল্প খেয়েছি বলেই এখন দিব্বি একটা পীচ খেতে পারছি।"

বিল্ এল। চুকিয়ে দেবার পর দেখা গেল বকশিশ দেবার জন্য নিতান্ত যৎসামান্য বাকি আছে। পরিবেশকের জন্য যে-তিন ফ্রাঙ্ক রেখে এলাম সেদিকে বান্ধবী একপলক দেখে নিলেন। নিশ্চয় মনে মনে ভাবলেন—কী ছোটলোক, কী কঞ্জুষ! রেস্তোরাঁ থেকে যখন বেরুচ্ছি তখন আমার পকেট খালি, সামনে একটা মাসের পুরো তিরিশটা দিন।

বিদায়সম্ভাষণের সময় ভদ্রমহিলা বললেন,

"খাওয়ার ব্যাপারে আমার দেখাদেখি চলুন। খবরদার লাঞ্চ-এ একটি পদের বেশি কক্ষনো নয়।"

"তার চাইতে বেশি কিছু করব দেখবেন—আজ রাত্তিরে ডিনারটা স্রেফ বাদ দেব।"

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে হালকাসুরে বান্ধবী বললেন—"খামখেয়ালী লোকদের কথাই আলাদা—খুশিমতন চলে।"

শেষপর্যন্ত ঠিক প্রতিশোধ নেওয়া গেছে। স্বভাবতঃ আমি প্রতিহিংসা-পরায়ণ নই; আর তাছাড়া স্বয়ং দেবতারা যেখানে একহাত নিয়েছেন সেখানে ফলাফল দেখে মাটির মানুষ যদি একটু তৃপ্তিলাভ করে, তাহলে খুব বেশি কি দোষ তাকে দেওয়া চলে? বর্তমানে ভদ্রমহিলার দেহের ওজন সাড়ে তিন মনেরো কিছু বেশি!

—ক্ষিতীশ রায়





লুইস

আমি তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে লুইস আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামায় কেন? আমি জানি সে আমাকে অপছন্দ করে আর আমার অগোচরে তার সেই স্বভাবসুলভ মোলায়েম কায়দায় আমার সম্পর্কে অপ্রীতিকর কিছু বলবার সুযোগ পেলে তা সে কখনই ছাড়ে না। সামনাসামনি কোনো মতামত প্রকাশ করতে অত্যধিক লাজুকতায় তার বাধে কিন্তু সামান্য একটু ইঙ্গিত, ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস কিংবা তার সুন্দর হাতের ছোট্ট একটু তুড়িতেই সে তার বক্তব্য স্পষ্ট করতে পারে। এ-কথা সত্যি পঁচিশ বছর ধরে আমাদের আন্তরিক পরিচয়, কিন্তু পুরানো পরিচয়ের দাবিতে কাবু হবার মতো মেয়ে সে নয়। লুইসের ধারণা আমি অমার্জিত ও বর্বর, ইতর এবং উন্নাসিক। এ-কথা ভেবে কেবলই অবাক হয়ে যাই লুইস কেন সহজ পথ বেছে নিচ্ছে না—কেন সে পুরোপুরি বাদ দিচ্ছে না আমাকে; কিন্তু এ-রকম কিছুরই বাসনা নেই তার। সত্যি বলতে কি সে একেবারে নাছোড়বান্দা—প্রায়ই তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে আমার ডাক পড়ে আর বছরে অন্তত দু'বার সপ্তাহ শেষে ওর দেশের বাড়িতে কাটিয়ে আসবার নিমন্ত্রণ আসে। শেষটায় যেন বুঝতে পারলাম ওর মতলবটা আমি ধরে ফেলেছি। ওকে আমি বিশ্বাস করিনে—ওর মনে এই একটি অস্বস্তিকর সন্দেহ, আর এ-সন্দেহই যদি আমাকে অপছন্দ করবার ওর কারণ হয় তবে ঠিক এই কারণেই সে আমার এত বেশি সান্নিধ্যপ্রয়াসী। একমাত্র আমিই যেন ওকে একটি অদ্ভুত জীব বলে ধারণা করেছি—এই কথা ভেবে লুইস মনে মনে

কষ্ট পায় এবং যতক্ষণ না আমি পরাজয় স্বীকার করে সবটাই আমার ভুল বলে মেনে না নিই ততক্ষণ ওর শান্তি নেই। সম্ভবতঃ ওর মনে এ-রকম একটা সন্দেহ ছিল যে আমি মুখোশের পিছনে আসল মুখটা দেখতে পাই। আর সেইজন্যই ওর জিদ চড়ে গেছে ওই মুখোশটাই যে মুখ তা শেষ পর্যন্ত আমাকে স্বীকার করিয়ে ছাড়বে। লুইস সম্পূর্ণ ভণ্ড কিনা তা কোনো দিনই বুঝে উঠতে পারিনি। অনেক সময় ভেবে দেখেছি লুইস যেমন সহজে পৃথিবীকে বোকা বানিয়ে দেয় তেমনি করে নিজেকেও সে বোকা বানায়, না তার অন্তরের গভীরে একটি প্রচ্ছন্ন রসিকতা ঝলমল করছে? হয়তো বা তার এই রসিকতাবোধই লুইসকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে—যেমন একজোড়া ঠগ সকলের অজানা গোপন একটা খবরের অংশীদার হিসেবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

লুইসের বিয়ের আগে থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন ও ছিল বড়ো নির্জীব, বড় পলকা— বিষাদভরা একজোড়া টানা চোখ চোখে পড়ত। কী একটা অসুখে, বোধহয় পীতজ্বরে, ওর হৃৎপিণ্ড বড় দুর্বল হয়ে পড়ে; এ-জন্যে ওকে বিশেষ যত্ন নিয়ে শরীর বাঁচাতে হয়। লুইসের প্রতি ওর মা ও বাবার ভালোবাসা প্রায় ভক্তিরই নামান্তর। সব সময়ে মেয়ের প্রতি দেবতার মতো একটা শ্রদ্ধা। টম মেইটল্যাণ্ড যখন লুইসকে বিয়ের প্রস্তাব জানাল লুইসের মা এবং বাবা যুগপৎ ঘাবড়িয়ে গেলেন, কারণ তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা বিবাহের কঠোরতা সহ্য করা লুইসের মতো দুর্বল মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু লুইসদের আর্থিক অবস্থাটা ভালো নয় আর মেইটল্যাণ্ড রীতিমতো বড়লোক। মেইটল্যাণ্ড শপথ করলে পৃথিবীতে লুইসের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব সে করবে। শেষটায় লুইসের বাপ-মা একটি সঁপে-দেওয়া অর্ঘের মতোই লুইসকে মেইটল্যাণ্ডের হাতে সমর্পণ করলেন। মেইটল্যাণ্ড লোকটি দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ—চমৎকার

দেখতে, রীতিমতো একজন ভালো খেলোয়াড়। লুইসকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে লাগল। লুইসের হৃৎপিণ্ড বড়ো দুর্বল—সুতরাং বেশি দিন ওকে কাছে রাখতে পারবে মেইটল্যাণ্ড তা ভাবতেই পারে না। পৃথিবীতে যে সামান্য ক'টা দিন লুইস বেঁচে আছে ওকে সবরকমে সুখী করবার চেষ্টাই সে প্রাণপণে করতে লাগল। কতগুলো খেলায় মেইটল্যাণ্ড বিশেষ পারদর্শী ছিল—সেগুলোও সে ছেড়ে দিলে। এর কারণ এই নয় যে লুইস তাকে খেলা ছাড়বার পরামর্শ দিল—মেইটল্যাণ্ড শিকার করুক, গল্‌ফ খেলুক এতে লুইস খুশিই হতো, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে মাত্র একদিনের জন্যও লুইসকে ছেড়ে বাইরে যাবার কথা বললেই অমনি লুইসের সেই বুকের রোগটা বেড়ে যায়। মতের অমিল ঘটলে লুইস সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর মত মেনে নেয় কারণ লুইসের মতো এরকম অনুগতা স্ত্রী একান্তই দুর্লভ; কিন্তু এর ফলে লুইসের হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়—আর এক সপ্তাহের জন্য সে শয্যাগ্রহণ করে। এ-সময়ে লুইসের অবস্থাটা ভারি মোলায়েম আর মিষ্টি—একেবারে অনুযোগহীন। মেইটল্যাণ্ড তো আর পশু নয় যে অসুস্থ স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবে। কাজেই দু'জনের মধ্যে তারপর ছোটখাটো একটা বাদানুবাদ চলে, শেষটায় মেইটল্যাণ্ড অনেক সাধ্যসাধনা করে লুইসকে তার নিজের জিদ বজায় রাখতে বাধ্য করে।

একবার একটি অভিযানে লুইসকে স্বেচ্ছায় আট মাইল হাঁটতে দেখে টম মেইটল্যাণ্ডকে আমি বলেছিলাম, "লুইসকে আমরা যা ভাবি তার চাইতে অনেক বেশি ও মজবুত।" মেইটল্যাণ্ড শুধু মাথা নেড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "না, না, না—ভয়ঙ্কর দুর্বল ও। ওকে পৃথিবীর সব চেয়ে ভালো হৃদবিশারদের কাছে নিয়ে গিয়েছি। লুইসের জীবন একটি সুতোয় ঝুলছে—এ-বিষয়ে তাঁরা সবাই এক মত; কিন্তু ও যে বেঁচে আছে, এ নিছক মনের

জোরে।" আমি লুইসের সহ্যশক্তি সম্বন্ধে এ-রকম একটা যে মন্তব্য করেছি মেইটল্যাণ্ড তা তার স্ত্রীকে জানালে। শুনে লুইস আমাকে বললে, "কালকেই এর ফল ফলবে—একেবারে পৌঁছে যাব মৃত্যুর দোর গোড়ায়।" আমি বিড়বিড় করে বললাম, "দেখ লুইস আমার কি মনে হয় জান? তুমি যা করবে বলে স্থির কর তা করবার মতো যথেষ্ট শক্তি তোমার আছে।"

আমি এও লক্ষ্য করেছি, কোনো একটা নাচের আসর জমে উঠলে লুইস ভোর পাঁচটা পর্যন্ত একটানা নেচে যেতে পারে, কিন্তু আসর যদি না জমে লুইসের শরীর হয় খারাপ—টম তখন তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়। লুইস আমার মন্তব্য মোটেও পছন্দ করেনি। আমার দিকে চেয়ে মুখে সে একটু করুণ হাসি ফুটিয়ে তুলল কিন্তু ওর দীর্ঘ নীলাভ চোখে আমি এতটুকু আনন্দের রেশ দেখতে পেলাম না। লুইস বললে, "তোমাদের পছন্দ মতো, তোমাদের খুশি করবার জন্য, আমি তো আর যখন ইচ্ছে চট করে মরে যেতে পারি না।"

লুইসের স্বামী কিন্তু মারা গেল লুইসের অনেক আগে। ওরা একবার বেড়াতে গিয়েছিল সমুদ্রে। যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সবগুলো কম্বল চাপান হল লুইসের গায়ে, আর মেইটল্যাণ্ড মারা গেল ঠাণ্ডা লেগে। প্রচুর অর্থ আর একটি কন্যা রেখে গেল সে। লুইসকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারল না। আশ্চর্য—সে এই শোকের ধাক্কাটা সহ্য করলে। ওর বন্ধুবান্ধবরা ভেবেছিল লুইসও শিগগিরই স্বামীর অনুগমন করবে। লুইসের মেয়ে আইরিশের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সত্যি সত্যি তাদের অত্যন্ত দুঃখ হতে লাগল। লুইসের ওপর সবাই নজর রাখতে লাগল আগের চাইতে দ্বিগুণ। এতটুকু এদিক ওদিক নড়তে দিতে চায় না ওকে ওরা—লুইসের সামান্য দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্যে ওরা যা-কিছু করার সব করতে লাগল। না করে উপায়ও ছিল না

কারণ কোনো কিছু পরিশ্রম বা অসুবিধের কাজ করতে গেলেই লুইসের বুকের ব্যারামটা আবার বেড়ে ওঠে— অবস্থা হয় একেবারে মরমর। একজন পুরুষও নেই যে ওকে দেখাশুনা করে। পুরুষহীন অবস্থায় লুইস নিজেকে একেবারে অসহায় মনে করল। তার এই ক্ষীণ দুর্বল শরীর নিয়ে কেমন করে সে আইরিশকে মানুষ করে তুলবে! বন্ধুরা বললে, "তুমি আবার বিয়ে কর না কেন?" এই দুর্বল হৃদয় নিয়ে আবার বিয়ে—এ একেবারেই প্রশ্নের বাইরে। যদিও বেচারা টমের হয়তো ইচ্ছে ছিল এই। আর করতে পারলে আইরিশের পক্ষে তো খুব ভালোই হত। তবে কারই বা বয়ে গেছে তার মতো হতভাগী এক বারোমেসে রুগীকে 'বিয়ে করতে? কিন্তু, দেখা গেল, একাধিক যুবক ওর ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত। টমের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই জর্জ হবহাউস নামে একটি ভদ্রলোক লুইসকে বিয়ে করে ফেলল। লোকটি দেখতে শুনতে চমৎকার—অবশ্যও বেশ ভালো। লুইসের মতো এরকম একটি দুর্বল ভঙ্গুর প্রাণীকে দেখাশুনার সুযোগ লাভ করে কৃতজ্ঞতায় সে যেন ডুবে গেল—আমি দেখিনি এরকম বড় একটা।

লুইস স্বামীকে জানিয়ে রাখলে—"তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে বেশি দিন আমি বাঁচব না।"

হবহাউস একজন সৈনিক, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা রাখে, কিন্তু বিয়ের পরেই সে চাকরিতে ইস্তফা দিলে। লুইসের স্বাস্থ্যের খাতিরে শীতের সময় মন্টিকার্লো আর গ্রীষ্মে ডোভিলে কাটাতে বাধ্য হত। হবহাউস অবিশ্যি চাকরি ছাড়বার আগে একটু ইতঃস্তত করেছিল—লুইসও যে সায় দিয়েছিল এমন নয়; কিন্তু লুইস যেমন শেষ পর্যন্ত সব কিছুই মেনে নেয়—এ ক্ষেত্রেও তাই হল। ভদ্রলোক তার স্ত্রীর জীবনের শেষ সামান্য ক'টা বছর যাতে পরম সুখে কাটে তার ব্যবস্থা করলেন।

লুইস আশ্বাস দিলে, "বেশি দিন নেইগো আর—বেশি কষ্ট তোমায় পেতে হবে না।"

এরপর দু'তিন বছর তার অত্যন্ত দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে, চমৎকার সাজ-সজ্জা করে, জমকালো সব পার্টিতে লুইস দিব্যি যাতায়াত করতে লাগল। জুয়া খেললে প্রচুর, লম্বা-চওড়া কমবয়েসের ছেলেদের সঙ্গে নেচে হাল্‌কা-প্রেম করে সময়ও কাটালে অনেক। জর্জ হবহাউসের কিন্তু লুইসের প্রথম স্বামীর মতো জীবনশক্তির প্রাচুর্য ছিল না—লুইসের স্বামী হিসেবে দৈনিক কর্তব্য সমাপন করতে প্রায়ই তাকে প্রচুর মদ পান করতে হত। পানমাত্রা ক্রমশই বাড়তির দিকে চলছিল আর লুইসও এ-অভ্যেস বড় একটা বরদাস্ত করতে পারছিল না, এমন সময় হঠাৎ (লুইসের কপাল ভালো) যুদ্ধ বেধে গেল। হবহাউস সৈন্য-দলে নাম লেখালে এবং তিনমাসের মধ্যেই লড়াইয়ে মারা পড়ল। লুইস এতে আঘাত পেল বটে, তবে এও সে বুঝতে পারল যে এ-রকম সংকটে ব্যক্তিগত শোক নিয়ে বসে থাকলে চলবে না ; এর জন্য তার বুকের অসুখটা বেড়েছিল কিনা সে-খবর অবিশ্যি কেউ পায়নি। মনকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য মণ্টিকার্লোয় তার বাড়িখানাকে আরোগ্যান্মুখ অফিসারদের হাসপাতালে পরিণত করল। তার বন্ধুবান্ধবেরা বললে—এত খাটুনির পর লুইসের বাঁচবার আর কোনো আশাই থাকবে না।

লুইস বললে, "জানি এতেই আমার মৃত্যু, কিন্তু কী এসে যায় তাতে ? যেটুকু আমি পারি তা তো আমায় করতে হবে।"

কিন্তু এত পরিশ্রমও লুইসকে কিছু করতে পারল না, বরঞ্চ জীবনকে সে যেন নতুন করে লাভ করল। ফরাসি দেশে লুইসের আরোগ্য-ভবনের চেয়ে ভালো আরোগ্য-ভবন আর ছিল না। প্যারিসে হঠাৎ লুইসের সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়ে গেল। রিট্‌জে একজন লম্বা সুদর্শন ফরাসি যুবকের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিল। লুইস আমাকে বুঝিয়ে বললে—

হাসপাতালের কাজেই তাকে এখানে আসতে হয়েছে। লুইসের সঙ্গে অফিসাররা ব্যবহার করে নাকি চমৎকার। তারা সবাই জানে লুইসের স্বাস্থ্য কত খারাপ—লুইসকে তারা একটি কাজও করতে দেয় না। সবাই যেন তার স্বামী—এমনি আদর-যত্ন সবার কাছ থেকে সে পায়।

"আহা বেচারা জর্জ—কে জানত আমার এই হার্ট নিয়ে তার চাইতে বেশিদিন আমি বাঁচবো?"

"আর বেচারা টম?"—আমি জিগগেস করলাম।

ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন লুইস আমার এই প্রশ্নটিকে অপছন্দ করলে। একটা করুণ হাসি হাসল লুইস। চোখ তার ভরে গেল জলে।

"এমন ভাবে তুমি কথা বল, ক'টা দিন আমি যে বেঁচে আছি—তা যেন তোমার আর সইচে না।" বলল লুইস।

"হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার হার্ট এখন আগের চেয়ে ভালো আছে, নয় কি?"

"না, ও আর ভালো হবার নয়। এই তো আজই সকালে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখালাম—তিনি আমায় যে-কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু ঘটার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন।"

"তাই নাকি? তা এই বিশ বছর ধরেই তো তুমি তৈরি হয়ে আছ, কি বল?"

যুদ্ধের পর লুইস লণ্ডনেই কায়েমী হল। এখন তার বয়স চল্লিশের উপর, —তেমনি পাতলা আর পলকা—সেই ডাগর চোখ আর বিবর্ণ গাল; দেখলে মনেও হবে না যে বয়স তার পঁচিশের বেশি। আইরিশ এতদিন স্কুলে পড়ত—সেও এখন বেশ বড় হয়েছে—মা'র কাছে থাকবার জন্যে লণ্ডনে চলে এল।

লুইস বললে, "আইরিশই এখন আমার দেখাশুনো করবে। অবিশ্যি আমার মতো পঙ্গুর সঙ্গে বসবাস করা ওর পক্ষে মোটেই সহজ

ব্যাপার নয়, তবে···আর ক'দিনের জন্যেই বা। আইরিশ কিছু মনে করবে না নিশ্চয়ই।"

আইরিশ লক্ষ্মী মেয়ে। তার মায়ের শারীরিক অবস্থা শোচনীয় এ ধারণা নিয়েই সে বড় হয়েছে। ছোটবেলায় একদিনের জন্যও এতটুকু গোলমাল তাকে করতে দেওয়া হয়নি—সে জানত কোনোমতেই তার মাকে বিচলিত করা উচিৎ নয়। একজন বৃদ্ধার জন্য কেন আইরিশ নিজেকে বিলিয়ে দেবে—লুইস এ-কথা বলা সত্ত্বেও আইরিশ তা শুনল না। এতো নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নয়—এ যে তার বড় আদরের মায়ের সেবার দুর্লভ আনন্দ লাভ করা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লুইস শেষ পর্যন্ত মেয়েকে দিয়ে নিজের জন্য অনেক কিছুই করিয়ে নিলে।

লুইস বলে—"অন্য কারো কাজে লাগতে পারছে মনে করে ও বড় আনন্দ পায়।"

"আচ্ছা লুইস, তোমার কি মনে হয় না আইরিশের একটু বাইরে মেলামেশা করা দরকার?"

"আমি তো সেই কথাই বলে আসছি। আইরিশ নিজে একটু আমোদ আহ্লাদ করুক এ আমি কিছুতেই তাকে দিয়ে করাতে পারছি না। ঈশ্বর জানেন এ আমি কখনই চাইনে যে আমার জন্য নিজেকে কেউ বিলিয়ে দিক।"

আর আইরিশ—তাকে এ-কথা জানাতেই সে বললে, "আহা, বেচারা মা, মা তো চায়ই আমি পার্টিতে যাই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করি। কিন্তু কি করি বলুন, যখনই কোনো জায়গায় আমার যাবার কথা হল তখনই মা'র সেই বুকের অসুখটা আবার বাড়ে। তার চেয়ে আমাব বাড়িতে থাকাই ভালো!"

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আইরিশ প্রেমে পড়ল। আমারই এক যুবকবন্ধু—চমৎকার ছেলেটি— আইরিশকে বিয়ে করতে চাইলে আর

আইরিশও তাতে মত দিলে। এতদিনে ও নিজের ইচ্ছে মতো জীবন চালাবার সুযোগ পেল ভেবে বড় আনন্দ পেলাম। তার জীবনে এমন একটা কিছু যে ঘটতে পারে তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। কিন্তু এমনি সময়ে একদিন ছেলেটি এসে মহা দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানালে যে তাদের বিয়ে অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত রইল। আইরিশ নাকি কিছুতেই তার মাকে ছেড়ে যেতে রাজী হচ্ছে না। এ-ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামান উচিত নয় জেনেও এই সুযোগে লুইসের সঙ্গে একবার দেখা না করে পারলাম না।

লুইস চা খাবার সময় তার বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা করতে ভালোবাসত। এখন বেশ বয়েস হয়েছে তার। তাই তার অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে শিল্পী আর লেখকদের সংখ্যাই ছিল আজকাল বেশি।

একটু পরে জিগগেস করলাম—

"শুনছি আইরিশের বিয়ে নাকি শিগগির হচ্ছে না।"

"আমি ঠিক কিছু বলতে পারছি নে। তবে যত তাড়াতাড়ি ভেবেছিলাম ওর বিয়ে হবে তা আর হচ্ছে না। আমি হাত জোড় করে ওকে বলেছি আমার জন্যে ওর কিছু ভাববার দরকার নেই কিন্তু তবু যদি মেয়ে শোনে।"

"এতে বেচারা বড় কষ্ট পাবে বলে কি তোমার মনে হয় না?"

"নিশ্চয়। অবিশ্যি বেশি দিনের জন্য আর নয়—এটা আমি জানি, তবুও কেউ যে আমার জন্য নিজের সর্বনাশ করে এও আমার মোটে ভালো লাগে না।"

"দেখ লুইস, দুটি-দুটি স্বামীকে তুমি মরতে দেখেছ। ইচ্ছে করলে আরো দুটর মৃত্যু তুমি কেন যে দেখবে না ভেবে তো পাইনে!"

"আহা, কি তামাশাই না হল!" বললে লুইস। তার কণ্ঠে বিষ ঝরে পড়ল।

"একটা ব্যাপার তোমার বোধহয় মনেও হয়নি লুইস—জীবনে যখনই তুমি যা করতে চেয়েছ সেটা করতে তোমার শরীর কখনো পেছপা হয়নি। কিন্তু যখনি এমন কাজ তোমায় করতে হয়েছে যা তোমার মনের মতো নয়, তখনি তোমার বুকের অসুখ এসে বাধা দিয়েছে।"

"আমি জানি আমার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা। আমার যে কোনোও অসুখ থাকতে পারে একথা তুমি কোনোদিন বিশ্বাসই করনি।"

মুখ তুলে আমি লুইসের দিকে সোজা তাকলাম—"নিশ্চয়ই করিনি। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর তুমি সবাইকে প্রচণ্ড এক ধাপ্পা দিয়ে চলেছ। তোমার মতো এরকম ভয়ঙ্কর স্বার্থপর মেয়ে জীবনে আমি দেখিনি। যে দুটি লোককে তুমি বিয়ে করেছিলে তাদের জীবন তুমি তো নষ্ট করেছই, এখন দেখছি তোমার মেয়ের সর্বনাশও তুমি না করে ছাড়বে না।"

আমার এ-কথায় লুইসের বুকের অসুখটা হঠাৎ যদি বেড়ে উঠত নিশ্চয়ই অবাক হতাম না। ভেবেছিলাম সে এতে ক্ষেপে উঠবে কিন্তু লুইস মৃদু একটু হাসল মাত্র।

"হে বন্ধু, আজ তুমি আমায় যে-কথা বললে তার জন্যে খুব শিগগিরই তোমায় দুঃখ পেতে হবে জেনো।"

"আইরিশ এই ছেলেটিকে যে বিয়ে করে তা বুঝি তুমি চাও না?"

"আইরিশকে বারবার আমি বলেছি বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবার জন্য। আমি জানি এতে আমি ঠিক মারা যাব কিন্তু কি এসে যায় তাতে? কেই বা আমার জন্যে ভাবতে যাচ্ছে বল। আমি তো সবার একটা বোঝা মাত্র!"

"তুমি কি আইরিশকে বলেছ তার বিয়ে হলেই তোমার মৃত্যু হবে?"

"আমাকে দিয়ে বলিয়ে তবে সে ছেড়েছে।"

"তুমি এরকম ভাব দেখাচ্ছ—যেন সবাই তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়ে সব করিয়ে নেয়।"

"বেশ তো, কালই আইরিশ ঐ ছেলেটিকে করুক না বিয়ে, এতে যদি আমার মরতেও হয় তো মরব।"

"বেশ—দেখাই যাক না কী হয়!"

"আমার জন্যে কি তোমাদের এতটুকু অনুকম্পা নেই!"

"যে অপরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তার জন্যে কোনো অনুকম্পা আমার নেই।"

লুইসের পাণ্ডুর গালে একটু রঙের ছোঁয়াচ লাগল—মুখে একটু হাসল বটে কিন্তু তার চোখে ফুটে উঠল ক্রোধ আর কঠোরতা।

"বেশ আইরিশের বিয়ে তাহলে এ-মাসেই হোক। এতে যদি আমার ভালোমন্দ কিছু হয় তাহলে তুমি আর আইরিশ নিজেদের কখনো ক্ষমা করতে পারবে না জেনে রেখ।"

লুইস তাঁর কথা রাখল, ঠিক হল বিয়ের তারিখ। জমকালো জামাকাপড় অর্ডার দেওয়া হল—নিমন্ত্রণ চলে গেল নানা দেশে। আইরিশ আর ছেলেটির খুশি আর ধরে না। বিয়ের দিন সকাল দশটায় লুইস হঠাৎ তার সেই বুকের অসুখে আক্রান্ত হল। ধীরে ধীরে মারা গেল লুইস। যদিও আইরিশ এর জন্য দায়ী—তবু তাকে ক্ষমা করে গেল সে।

—ফল্গু কর





শান্তির ভরা

নৌ-বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় 'পথ-নির্দেশ'। অনেক বই-ই তো বাজারে বেরোয় কিন্তু এমন সারবস্তু বই সচরাচর খুব কমই চোখে পড়ে। দেখতে বেশ বইগুলি—নানা রঙের কাপড়ে বাঁধাই; সব চেয়ে যেখানার দাম বেশি সেখানাও সস্তা বলতে হবে। তিন টাকায় পাওয়া যায় 'ইয়াং সিকিয়াং-এর নাবিক': উসুং থেকে আরম্ভ করে ইয়াং সিকিয়াং-এর শেষ অধিগম্য বিন্দু পর্যন্ত জল-পথের নির্দেশ এবং বর্ণনা; তা ছাড়া হান্ কিয়াং, কিয়ালিং কিয়াং এবং মিন্ কিয়াং-এর কথাও আছে। 'পূর্ব-দ্বীপ-পুঞ্জের নাবিক'এর দাম আড়াই টাকা: তাতে রয়েছে উত্তরপূর্ব সেলিবিস, মালাক্কা এবং গিলোলো, বান্দা এবং আরাফুরা সাগর আর নিউগিনির চতুর্দিকের জল-পথের বর্ণনা। নিজের কাজের জায়গা ছেড়ে যাওয়া যার পক্ষে সম্ভব নয়, অথবা অভ্যাসে যে থিতিয়ে গিয়েছে, তার পক্ষে এ-বইগুলো মোটেও নিরাপদ নয়। বাস্তবতার ছদ্মবেশ-পরা এই বইগুলো মনকে টেনে নিয়ে যায় কল্পলোকের যাত্রায়: এদের বলবার ধরন শাদাসিধে; বক্তব্যগুলি যথানিয়মে সাজানো; বাজে কথা একটি নেই; স্বপ্নালুতার ছোঁয়া পর্যন্ত নেই কোথাও। তবু এই মায়াময় দ্বীপগুলোর কাছে এলেই যে গন্ধে-ভারি বাতাস ইন্দ্রিয়কে মথিত করে মনকে মন্থর করে তোলে, সেই সৌরভের কবিতা বইগুলোর পাতায় পাতায় একটুও ম্লান হয়নি।

কোথায় নোঙর করতে হবে, কোথায় নামতে হবে, কি কি জিনিস পাওয়া যাবে, ভালো জল কোথায় আছে, কখন জোয়ার, কখন ভাঁটা, কোথায়

বয়া আছে—সব খবরই এতে আছে। বিভিন্ন জলবায়ুর নির্ভুল নির্দেশও রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে এত তথ্যে-ভরা বইগুলো মনকে এমন করে ভরিয়ে দেয় কি করে? অথচ অপ্রয়োজনীয় কথা নেই একটিও। যে বইয়ে কাজের কথার মধ্যেই এত রহস্য, এত সৌন্দর্য, এত অজানার মোহের সৃষ্টি হয় তাকে কি সাধারণ বই বলা চলে? এই দেখুন না, একটা প্যারা তুলে দিচ্ছি: 'পাওয়া যায়: বুনো মুরগী; যথেষ্ট সামুদ্রিক পাখি; খাঁড়িতে কাছিম এবং মালেট, আড় জাতীয় অন্যান্য অনেক মাছ। জালে মাছ ধরা যায় না বটে তবে একরকমের মাছ ছিপে ওঠে। সমুদ্রে বিপন্ন লোকদের জন্য কিছু টিনের খাবার এবং মদ একটি চালা ঘরে মজুত থাকে। জাহাজ-ঘাটের কাছেই একটি কুয়ো—জল ভালো।' অজানার পথে 'যাত্রা করে' বেরুনোর পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কি দরকার?

যে বইর থেকে ওপরে কথাগুলো তুলে দিলাম তার মধ্যেই যথারীতি অ্যাল্যাস দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা আছে। এটি একটি দ্বীপ-মালা: 'নিচু, বনে-ভরা ভূমি বেশির ভাগটাই: পূর্ব-পশ্চিমে ৭৫ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ৪০ মাইল।' এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে খবর নাকি খুব কমই দেওয়া সম্ভব হয়েছে: দীপগুলি বহু জল-পথ দিয়ে সংযুক্ত; কতকগুলি জাহাজ এদের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে বটে, তবে পথের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি এবং অনেক বিপজ্জনক স্থানও অচিহ্নিত রয়েছে। এ সব পথে না যাওয়াই ভালো। দ্বীপপুঞ্জের জন-সংখ্যা ৮০০০এর কাছাকাছি; তার মধ্যে ২০০ চীনা এবং ৪০০ মুসলমান। বাকি সব অসভ্য আদিম অধিবাসী। প্রধান দ্বীপটির নাম বারু—তার চারদিকে পাহাড়। এখানে থাকেন একজন ওলন্দাজ শাসক। মাসে একবার ম্যাকাসার যাবার পথে এবং ডাচ নিউগিনির মেরকে আসবার পথে ডাচ জাহাজ কোম্পানির জাহাজগুলির প্রথম চোখে পড়ে একটি ছোট পাহাড়ের

ওপর শাসক-মশায়ের শাদা রঙের লাল-ছাদ দেওয়া বাড়িটা।
জগতের ইতিহাসের কোনো একটি মুহূর্তে এই অ্যাল্যাস অধিবাসীদের শাসন-কর্তা ছিল মিনহীর এভার্ট গ্রুইটার। কড়া হাতে শাসন করত সে, আর মনে মনে হাসত। সাতাশ বছর বয়সে এই রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, তার কাছে অত্যন্ত রসিকতার ব্যাপার মনে হয়েছিল এবং তিরিশ বছর বয়সেও এতে সে বেশ আমোদ পেত। এই দ্বীপগুলিতে তারে সংবাদ আদান-প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। চিঠিপত্র এত দেরিতে আসত যে কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। ফলে সে যা ভালো বুঝত তাই করত আর কর্তৃপক্ষের সুনজর কপালে থাকলে রোখে কে? দেখতে সে বেঁটে—পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি নয়; অপরিসীম মোটা; গায়ের রঙ লাল। ঠাণ্ডা থাকবে বলে মাথাটা কামানো। মুখ-খানি রোম-রেখা বিহীন, গোল, রক্তবর্ণ, তাতে দুটি কুৎকুতে চোখ। ভুরু এত শাদা—আছে কিনা বোঝা যায় না। এ হেন দেহ তার পদমর্যাদা বহনে অক্ষম জেনেই সে পোশাক-আশাকে সেটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কলঙ্কহীন শাদা পোশাক সর্বদা তার পরনে—সে আদালতেই থাক, কি অফিসেই থাক, কি বেড়াতেই যাক। বাড়িতে অবশ্য তার পরনে সারঙ থাকত বলে তাকে দেখাত ভারী অদ্ভুত—একটা থলথলে ষোল বছরের ছেলে যেন। ঝকঝকে পেতলের বোতাম-বসানো কোমর-বন্ধটা বড় কষা হত ভদ্রলোকের—পেটটি ভয়াবহ ভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসত। সদাপ্রসন্ন মুখখানা ঘামে ভিজে যেত বলে সব সময়েই হাতে থাকত একটা তাল-পাখা।

ভোরে ওঠে সে, আর ঠিক ছ'টায় প্রাতরাশ করে: এক ফালি পেঁপে, তিনটে ভাজা ডিম—অবশ্য বাসি, পাতলা এক টুকরো পনীর আর কালো কফি এক কাপ। এর অন্যথা হবার যো নেই। খাওয়া শেষ হলে একটা বড় ডাচ চুরুট ধরিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসে। তবে যেদিন তার

আগেই কাগজটি খুঁটিয়ে পড়া হয়ে যায় সেদিন আর খোলে না—সাজগোজ করে অফিস চলে যায়।

একদিন সকালে তার এই সব কাজের মধ্যেই চাকর এসে খবর দিল, 'জোনস্ সাহেব দেখা করতে চান।' গ্রূইটার দাঁড়িয়ে ছিল একটা আয়নার সামনে। প্যাণ্ট পরে সে নিজের মসৃণ বুকখানা মুগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করছিল। একটু চিতিয়ে বুকটাকে এগিয়ে দিয়ে এবং পেটটিকে কুঁইয়ে নেবার চেষ্টা করে পরম পরিতৃপ্তিতে বুকে গোটা তিন-চার চাপড় মারলে সশব্দে। বুকখানা পুরুষের মতো বটে। চাকর যখন সংবাদটি আনে তখন সে আয়নায় প্রতিফলিত চোখের সঙ্গে একটু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করছিল—মুখে ছিল মুচকি হাসি। জিগগেস করলে, 'বলি, সে চায় কি?' গ্রূইটার ইংরাজী, ডাচ এবং মালয়—তিনটে ভাষাই সমান বলতে পারত—কিন্তু ভাবত সে ডাচে—লাগত ভালো—মনে হত ডাচ ভাষাটায় বেশ 'শ'কার-'ব'কার আছে। জোনস্‌কে বসতে বলে সে জামাটা পরে নিয়ে বোতাম এঁটে দিয়ে চটপট নেমে গেল নিচে বসবার ঘরে। পাদরী-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'নমস্কার, মিস্টার জোনস্; দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে আমার সঙ্গে এক পেগ টানতে এলেন বুঝি?'

মিস্টার জোনস্ হাসলেন না।

উত্তর দিলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হল মিস্টার গ্রূইটার।' কন্ট্রোলার তার কথায় দমেও গেল না, বিব্রতও হল না। তার ছোট্ট চোখ দুটি খুশিতে উপচে পড়ল, বললে, 'আরে বসুন, বসুন, এই নিন একটা সিগারেট।' মিস্টার গ্রূইটার ভালো করেই জানত যে পাদরী-সাহেব মদও খান না, তামাকও খান না, তবু দেখা হলেই তাঁকে ঐ দুটি জিনিস দেবার প্রস্তাব করতে ভারি মজা লাগত তার। মিস্টার জোনস্ মাথা নাড়লেন।

মিস্টার জোনস্ অ্যাল্যাস্ দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্তা। তাঁর কাজের কেন্দ্রস্থল সব চেয়ে বড়ো দ্বীপ বারুতে হলেও অন্যান্য অনেক দ্বীপে স্থানীয় লোকের সাহায্যে তিনি মিলন-কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। বছর চল্লিশ বয়স ভদ্রলোকের—রোগা, লম্বা দেখতে; বিষণ্ণ, ফ্যাকাশে, লম্বাটে মুখ। মাথার সামনে চুল নেই। আর কপালের দুই দিকের চুলে পাক ধরায় একটা অন্তঃসারশূন্য বুদ্ধিমত্তার আভা বেরুচ্ছে। গ্রূইটার তাঁকে দেখতে পারত না, আবার সম্মানও করত। দেখতে না পারার কারণ তাঁর গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা। নিজে গ্রূইটার চার্বাক-পন্থী, জীবনের সব আনন্দেরই আস্বাদ যত বেশি সম্ভব পেতে চায়। একটা লোক এগুলি একেবারেই পছন্দ করে না, এ তার মোটেই ভালো লাগে না। যে জীবনধারায় এদেশের অধিবাসীরা এতদিন অভ্যস্ত হয়েছে—বেশ দিন কাটিয়ে দিচ্ছে—পাদরীর প্রাণপণে সেইটা বদলাবার চেষ্টা করার কোনো মানেই গ্রূইটার খুঁজে পায় না। কিন্তু ভদ্রলোক উৎসাহী, সৎ এবং তাঁর মুখে এক মনে আর নেই। মিস্টার জোনস্ জাতিতে অস্ট্রেলিয়ান, রক্তে ওয়েলস্-দেশীয়। এই দ্বীপগুলির মধ্যে তিনিই একমাত্র পাশ-করা ডাক্তার। অসুখ হলে এ কথা মনে করে স্বস্তি পাওয়া যায় যে, যাক্ চীনে ডাক্তার ডাকতে হবে না এবং কন্ট্রোলারের মতো ভালো করে আর কেউই জানত না কত বিচক্ষণ ডাক্তার মিস্টার জোনস্ আর কত সদাশয়। একবার ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিল। পাদরী একা দশজনের কাজ করলেন। কোনো দ্বীপে অসুখের সংবাদ পেলে এক টাইফুন ছাড়া কিছুতেই তাঁর গতিরোধ করতে পারত না।

গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শাদা বাড়িতে তাঁরা ভাইয়ে বোনে থাকতেন। কন্ট্রোলার যখন প্রথম আসে তখন তার বাড়ি-ঘর গোছ গাছ না হওয়া পর্যন্ত পাদরী তাঁর বাড়িতেই কন্ট্রোলারকে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে থেকে কন্ট্রোলার দেখলে

কত শাদাসিধে তাঁদের চালচলন। এত নির্বিলাস জীবন তার অসহ্য। সামান্য কিছু খাবারের সঙ্গে দিনে তিনবার চা তাঁরা খেতেন। আর কণ্ট্রোলার একটা সিগারেট ধরাতেই মিস্টার জোনস্ বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে তিনি এবং তাঁর বোন কেউই তামাকের গন্ধ সইতে পারেন না। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রুইটার তার নিজের বাড়িতে উঠে এল; যেন মহামারীতে আক্রান্ত কোনো শহর থেকে পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে খোশ-মেজাজী লোক—হাসতে ভালোবাসে। তার মনে হত, যারা হাসির কথাও গম্ভীর হয়ে শোনে, কি করে রক্তমাংসের মানুষ তাদের সহ্য করে! পাদরী ওয়েন জোনস্ উপযুক্ত লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গ অসহ্য। তাঁর বোন আবার আর এক কাঠি সরেশ। দুজনের কারও রসিকতা-বোধ না থাকলেও পাদরীসাহেব মানুষের ভালো হবার আশা ছেড়ে দিয়েই তার উপকার করতেন বিষণ্ণ মুখে; আর মিস জোনস্ সব সময়েই হাসি-খুশি, দাঁতে দাঁত চেপে জীবনের ভালো দিকটা টেনে বার করাই ছিল তার কাজ—এতে যেন সে প্রতিহিংসার আনন্দ পেত। গির্জার স্কুলে পড়াত সে আর তার ভাই-এর ডাক্তারীতে ভাগ বসাত। মিস্টার জোনস্ নিজের গরজে যে ছোট্ট হাসপাতালটি গড়ে তুলেছেন সেখানে অস্ত্রোপচারের সময় মিস্ জোনস্ রোগীকে ক্লোরোফর্ম দিত, তাকে শুশ্রূষা করত, হাসপাতালের সমস্ত তত্ত্বাবধানও নিজেই করত। কিন্তু বেঁটে কণ্ট্রোলার কিছুতেই, মিস্টার জোনসের পাপ বাঁচিয়ে চলা দেখে কিম্বা মিস্ জোনসের জোর-করা খুশি দেখে, কৌতুক বোধ না করে পারত না। কেন না, ওর স্বভাবই হচ্ছে কৌতুকপ্রিয়—যেখান থেকে পারে ওর আমোদের খোরাক ও আহরণ করে নেয়। দু'মাসে তিনবার ওলন্দাজ জাহাজগুলো যখন আসত তখন তাদের ক্যাপ্টেন বা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বেশ জমত কণ্ট্রোলারের। আর থারস্‌ডে দ্বীপ

থেকে কিম্বা পোর্ট ডারুইন্‌ থেকে ডুবুরী-জাহাজ এলে দু'তিন দিন ধরে কণ্ট্রোলারের ওখানে চলত বাদশাই মজলিশ। তার কারণ ডুবুরীরা বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর লোক—তাদের খাবার ক্ষমতা আছে আর তাদের জাহাজে আছে প্রচুর মদ। তারা গল্প জমাতে জানে। নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে তাদের এমন ভোজ খাওয়াত কণ্ট্রোলার যে, তাদের আর সজ্ঞানে সে রাত্রে জাহাজে ফিরে যাওয়া হত না। তা না হলে ভোজটা সার্থক বলেই তাদের মনে হত না।

কিন্তু দ্বীপে পাদরী-সাহেব ছাড়া শাদা-চামড়ার লোক আর একজন ছিল —জিঞ্জার টেড। সে সভ্যতার কলঙ্ক। কিছু নেই তার স্বপক্ষে বলবার। শ্বেত জাতির মুখে সে চুন-কালি মাখিয়েছে। তবু এই জিঞ্জার না থাকলে কণ্ট্রোলারের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠত।

লোকের পাপ মোচন করার বদলে, এতো সকালে যে মিস্টার জোনস্‌ কণ্ট্রোলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—সে এই বদমায়েসটার জন্যে।

'বসুন না, মিস্টার জোনস্‌। কি চাই বলুন,' বললে গ্রূইটার।

'জিঞ্জার টেড যাকে বলেন আপনারা, তার জন্যেই আসতে হয়েছে আমাকে। ওকে নিয়ে এইবার কি করতে চান?'

'কেন, কি হয়েছে কি?'

'শোনেননি বুঝি? আমি ভেবেছিলুম আপনাকে জানিয়েছে ওরা।'

একটু গুরুগম্ভীর চালে উত্তর দিলেন কণ্ট্রোলার, 'নেহাৎ জরুরী কাজ না পড়লে, অধস্তন কর্মচারীরা বাড়িতে এসে বিরক্ত করুক এ আমি চাই না। আমি ঠিক আপনার উলটো মিস্টার জোনস্‌। আমি খাটি বিশ্রাম পাব বলে, আর বিশ্রামে ব্যাঘাত আমি চাই না।'

এই সব আজে-বাজে কথাবার্তায় পাদরী-সাহেব কান দিতেন না; সাধারণ কথাবার্তা তাঁর ভালোও লাগত না।

'একটা চীনেম্যানের দোকানে কাল রাতে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে; জিনিসপত্র তো ভেঙে দিয়েছেই, একটা চীনেম্যানকে পর্যন্ত আধমরা করে ফেলেছে।'

'আবার মাতাল হয়েছিল বোধ হয়,' গ্রূইটার নির্বিকার স্বরে বললে।

'তা তো বটেই। মাতাল ভিন্ন অন্য অবস্থায় সে কখন থাকে! পুলিশ ডাকলে পুলিশকে পর্য্যন্ত মারধোর করেছে। ছ'জন লোক লেগেছে তাকে জেলে নিয়ে যেতে।'

'লোকটার গায়ে জোর আছে বেশ, কি বলেন?' উত্তর দিল গ্রূইটার।

'এবার তাকে দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছেন কি না?'

পাদরীর বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রূইটারের কুৎকুতে চোখ কৌতুকে মিটমিট করে উঠল। কণ্ট্রোলার বোকা তো নয়। সে ঠিকই বুঝেছিল জোনস্ কি চান। তাই ভদ্রলোককে তাতিয়ে একটু মজা করবার চেষ্টা গ্রূইটারের।

'বিচারটা যেমন-খুশি করবার ঢালাও অধিকার সৌভাগ্যবশত আমার আছে,' কণ্ট্রোলার বললে।

'যাকে খুশি দ্বীপান্তরে পাঠাবার ক্ষমতা আপনার আছে। ওকে যদি আপনি দ্বীপ-ছাড়া করেন তো গণ্ডগোলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।'

'ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে। কিন্তু, আপনার মতো লোক সে ক্ষমতার অপব্যবহারের উপদেশ নিশ্চয়ই দেবেন না।'

'দেখুন মিস্টার গ্রূইটার, ও লোকটাকে এখানে থাকতে দেওয়াই একটা বিশ্রী ব্যাপার। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কোনো সময় ওকে মাতাল ভিন্ন দেখলাম না। আর এ তো সবাই জানে, যে একটার পর একটা এ-দেশী মেয়েকে নিয়ে ও থাকে।'

'ঐ একটা বড় মজার কথা মিস্টার জোনস্। আমি চিরটা কাল শুনে আসছি যে মদে কামনা বাড়ালেও উপভোগের শক্তি কমায়। জিগ্গার টেড সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন তাতে তো এ-কথাটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

পাদরীর মুখ একটু লালচে হয়ে উঠল। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে জমে গিয়ে উত্তর দিলেন, 'এ-সব দেহ-তত্ত্ব-ঘটিত ব্যাপার এখন আলোচনা করবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। শ্বেত-জাতির আভিজাত্যের অবর্ণনীয় হানি করছে ও, আর এখানকার লোকগুলোকে যে একটু সৎ-পথে চালান যাবে তাও ও সামনে থাকতে হবে না একেবারে উচ্ছন্নে-যাওয়া লোক।'

'দেখুন, মনে কিছু করবেন না, আপনি কি ওকে কোনোদিন ভালো করবার চেষ্টা করেছিলেন?'

'ও যখন প্রথম এখানে আসে তখন চেষ্টার ত্রুটি করিনি—কিন্তু আমাকে কাছেই ঘেঁষতে দিলে না। সেই প্রথম গণ্ডগোল বাধার সময় কয়েকটা সোজা কথা আমি ওকে বলতেই, ও দিব্যি গেলে এগিয়ে এল আমার দিকে।'

'আপনারা অবশ্য এই দ্বীপে যা কাজ করেছেন—তার মূল্য যে কত বেশি, তা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। কিন্তু সব সময় আপনারা যথেষ্ট কৌশলের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন কি?'

কথাটি বলে কণ্ট্রোলারের মনে বেশ আনন্দ হল। কথাটি খুবই বিনীত, তবু যে খোঁচাটুকু আছে সেটুকু দেওয়া ঠিকই হয়েছে। পাদরী গম্ভীর হয়ে তাকালেন তার দিকে—দৃষ্টিতে কৌতুক উপলব্ধির চিহ্নটুকুও নেই।

'যীশু যখন বেত্র মেরে মন্দির থেকে বাটাখোরদের তাড়িয়েছিলেন তখন কি তিনি কৌশল ব্যবহার করেছিলেন? ও সব কথা আমাকে

বলবেন না। যারা কাজ না করে কাজ করার ভান করতে চায় তাদের প্রয়োজন হয় কৌশলের।'

মিস্টার জোনসের কথায় মিস্টার গ্রুইটার হঠাৎ এক বোতল বিয়ারের প্রয়োজন অনুভব করলে। মিশনারী ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলেন, 'মিস্টার গ্রুইটার, এ-লোকটার অপকর্মের কথা আপনিও যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। কিছু বলবার নেই ওর পক্ষে। এইবার ও সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে; এরকম সুযোগ আর আসবে না। আপনার ক্ষমতার ব্যবহার করে ওকে আপনি এই দ্বীপছাড়া করুন।'

কণ্ট্রোলারের চোখ দুটো মিটমিট করে উঠল আরও। বেশ মজা লাগছিল তার। ভাবলে, নিন্দা বা সুখ্যাতি মেপে দেবার দায় না থাকলে, মানুষকে অনেক বেশি মজার লাগে।

'কিন্তু মিস্টার জোনস্, আপনি বলছেন কি? আপনি কি চান তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এবং তার জবাবদিহি না শুনেই তাকে দ্বীপান্তর দেব?'

'তার আবার বলার কি আছে?'

উঠে দাঁড়াতেই তার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি দেহ সত্যিই একটু মর্যাদায় স্ফীত হয়ে উঠল, বললে, 'ডাচ গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে আমাকে ন্যায়বিচার করতে হবে তো। আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিচারকার্যের ব্যাপারে আপনি আমাকে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করছেন দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি।'

একটু বিব্রত বোধ করলেন পাদরী। তাঁর মনেও হয়নি, এই চ্যাংড়া বয়েসে তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট—সে কি না এই সুরে কথা বলবে! তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে কি একটা বলতে যেতেই কণ্ট্রোলার তার ছোট্ট থলথলে হাত দুটো তুলে বললে, 'অফিস যাবার সময় হল মিস্টার জোনস্, নমস্কার।'

পাদরী হকচকিয়ে একটা কথাও বলতে পারলেন না, ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি পিছন ফিরতেই কণ্ট্রোলার যা করলে তা দেখলে তিনি অবাক হয়ে যেতেন নিশ্চয়। দু'পাটি দাঁত বার করে হেসে, পাদরীর উদ্দেশে সে একটি বগা-কোঁস দেখিয়ে দিলে।

কয়েক মিনিট পরে অফিসে যেতেই তার আধা-ডাচ ট্যাঁস কেরানী গত রাত্রের গণ্ডগোলের যে বর্ণনাটি দিলে, তা মিস্টার জোনসের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় সবই মিলে গেল। কোর্ট ছিল সেদিন।

'জিঞ্জার টেডের কেস্‌টা কি আগে নেবেন স্যার,' কেরানী জিগগেস করল।

'গত বারের ছুটো তিনটে কেস্‌ রয়েছে না? জিঞ্জারের কেস্‌ যথারীতিই আসবে। আগে নেবার কোনো কারণ দেখি না।'

'আমি মনে করেছিলাম, সাহেব মানুষ, আপনি হয়তো ওর সঙ্গে আলাদা দেখা করবেন।'

মিস্টার গ্রুইটার জাঁক করে বললে, 'আইনের চোখে কালো আর শাদার পার্থক্য নেই, বন্ধু।'

বড় চার-চৌকো ঘরে কোর্ট বসেছে, বেঞ্চি সাজানো, বহু জাতীয় লোক ভিড় করে বসে আছে। সার্জেন্ট হাঁকল, 'সাহেব এসেছেন।' দাঁড়িয়ে উঠল সবাই। দেবদারু কাঠের বার্ণিশ-করা টেবিলের ধারে কেরানীর সঙ্গে কণ্ট্রোলার উঁচু কাঠের বেদীর উপর বসল। তার পিছনে রাণী উইলহেল্‌মিনার প্রতিমূর্তি। আধ ডজন খানেক কেস্‌ ফয়সালা করবার পর, জিঞ্জারের ডাক পড়ল। হাতে হাতকড়ি, দুদিকে দুজন রক্ষী, কাঠ-গড়ায় এসে দাঁড়াল জিঞ্জার। কণ্ট্রোলার গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকালেও তার চোখে হাসি গোপন রইল না।

টেডের অবস্থাটা তেমন সুবিধার নয়; একটু ঝুঁকে পড়েছে সে,

চোখে শূন্য দৃষ্টি। বয়স বছর তিরিশেক, দেহে এখনও তার যৌবন; বেশ লম্বা, একটু মোটা, মুখটা ফুলো ফুলো, মাথায় একঝাড় কোঁকড়া লাল চুল। দেখলে বোঝা যায় কাল রাতের দাঙ্গায় সে নিজেও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পার পায়নি। চোখ আহত, মুখ কেটে ফুলে উঠেছে। ছেঁড়া ময়লা খাকি প্যাণ্ট পরনে। সার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার বুকভরা লাল রোম আর অদ্ভুত শাদা চামড়া। বাদী, বিবাদী, অভিযোগ, প্রমাণ, সাক্ষী সব কিছু যথারীতি শেষ করে, মাথা-ভাঙা চীনেম্যানটাকে দেখে এবং মার-খাওয়া সার্জেণ্টের জবানবন্দী নিয়ে, কণ্ট্রোলার ইংরাজীতে বললে জিঙ্গারকে, 'তোমার নিজের কি বলবার আছে, জিঙ্গার?'

'আমি তখন অন্ধ। কি করেছি কিছু আমার মনে নেই। ওরা যদি বলে আমি ওকে খুন করেছি তাহলে বোধহয় করেছি। সময় দিলে আমি ক্ষতিপূরণ করে দেব।'

'হ্যাঁ, তা তো দেবে। কিন্তু তোমাকে সময়ই তো দেব আমি!' জিঙ্গারের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে রইল সে। নাঃ, দেখলে ঘেন্না লাগে—একেবারে কিচ্ছু ভাস্তি নেই। ভয়াবহ লোক! তার দিকে তাকালে কাঁপুনি আসে। যদি পাদরী-সাহেব এত উপরপড়া হয়ে এ সম্বন্ধে কিছু না বলতেন, তা হলে কণ্ট্রোলার নিশ্চয়ই দ্বীপান্তরের আদেশ দিত তাকে।

'তোমার আসার পর থেকে দ্বীপে অশান্তি লেগেই রয়েছে। তুমি মানুষ নামের তো অযোগ্য বটেই, আবার কুড়ের অগ্রগণ্য। বার বার তোমাকে মত্ত, অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তা থেকে তুলে আনা হয়েছে। বার বার তুমি গণ্ডগোল বাধিয়েছ। তোমার শোধরাবার আশা ছেড়ে দিয়েই, শেষবার যখন তুমি এখানে এসেছিলে, তখনই আমি বলে দিয়েছিলাম যে, আর একবার যদি তোমায় এখানে আসতে হয় তো তোমাকে আমি শিক্ষা

দিয়ে ছাড়ব। এইবারে তুমি চরমে উঠেছ। তোমাকে আমি ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, বেরিয়ে এসেই তোমাকে আমি শেষ করব!' বলেই সে মুখ খারাপ করে গাল পাড়তে শুরু করলে। গ্রুইটার ঘৃণাভরে শুনলে সব। ডাচ ভাষায় এর চেয়ে অনেক ভালো দিব্যি গালতে পারে গ্রুইটার।

'চুপ কর। বেশি বকো না,' বলে উঠল কণ্ট্রোলার।

মালয় ভাষায় শাস্তিটা পুনরায় শুনিয়ে দিতেই জিঞ্জারকে জোর করে কোর্ট থেকে বার করে নিয়ে গেল।

মনের আনন্দে টিফিন খেতে বসল মিস্টার গ্রুইটার। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই জীবনটা কি মজার যে হয়ে ওঠে, ভাবলে অবাক লাগে। এমন অনেকে আছে আমস্টারডামে, এমন কি বাটাভিয়াতে, সুরাবায়াতে পর্যন্ত, যারা এই দ্বীপে বাসটাকে নির্বাসনের সামিল মনে করে, এই জীবনের মজা তারা বোঝে না। বোঝে না কণ্ট্রোলার এই নীরস জীবন থেকেই কেমন করে রস নিঙড়ে বের করে। জিগগেস করে তারা, সিনেমা, ক্লাব, রেস, সাপ্তাহিক নাচ-পার্টি, ডাচ মহিলাদের সাহচর্য—সে এসবের অভাব বোধ করে কি না—গ্রুইটারের খারাপ লাগে কি না।

একটুও না।

তার চাই আরাম। খাবার ঘরের আসাবাবপত্রে বেশ একটা তৃপ্তিকর সারবত্তা আছে—সূক্ষ্মতায় উবে যায় না। প্রগলভ ধরনের ফরাসী উপন্যাস তার ভালো লাগে—একখানার পর একখানা পড়ে যায়—একবার মনেও হয় না যে সময় নষ্ট করছি। সময় নষ্ট করতে পারা

তো একটা মূল্যবান বিলাস। প্রেম করবার ইচ্ছে হলে আর্দালীকে বললেই সে এনে হাজির করে সারঙ-পরা মেঘ-রঙের সব বেঁটে সুন্দরীকে—চোখ তাদের চকচকে। কারও সঙ্গেই গ্রুইটার স্থায়ী সম্বন্ধের পক্ষপাতী নয়। পরিবর্তনে মনটা থাকে ভালো—অকাল-বার্ধক্য আসে না। গ্রুইটার স্বাধীন, কোনো দায়িত্ব নেই তার। গরমে তার কোনো কষ্ট হয় না। বরঞ্চ ছয়-সাতবার স্নান করার ভিতর একটা সূক্ষ্ম রসানুভূতি লাভ করে। সে পিয়ানো বাজায়, চিঠি লেখে বন্ধুদের কাছে হল্যাণ্ডে। কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না উচ্চাঙ্গের আলোচনার। একটু প্রাণখোলা হাসি? তার খোরাক যেমন যোগাতেও পারে বোকারা; তেমন পারে দার্শনিকও। গ্রুইটারের ধারণা সে বেশ একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

সুদূর প্রাচ্যের সব ডাচ বাসিন্দাদের মতো গ্রুইটারও মধ্যাহ্ন-ভোজন আরম্ভ করে ডাচ জিন দিয়ে। বেশ একটা বাসি-বাসি ঝাঁঝালো গন্ধ—অভ্যাস না থাকলে ভালো লাগে না। গ্রুইটার ককটেইলের চেয়ে এই জিনই পছন্দ করে। খাওয়ার সময় মনে হয়—জাতীয় প্রথা রক্ষা করে চলেছি। তারপর শুরু হত তার ভাত খাওয়া। রোজই ভাত খেত গ্রুইটার। একটা প্লেট ভাতে ভর্তি করে নিত—তার তিন চাকর, কেউ এগিয়ে দিত কারি, কেউ ডিম ভাজা, কেউ চাটনী। তারপর তারা আর এক প্রস্থ আনত কলা কি বেকন, কি মাছের আচার—ক্রমে প্লেটটিতে ছোটখাটো একটি পাহাড় রচনা হত। এই সব এক সঙ্গে মিশিয়ে, চলত গ্রুইটারের ভোজন, ধীরে ধীরে, চেখে চেখে। সর্বশেষে এক বোতল বিয়ার।

খাওয়ার সময় ভাবা গ্রুইটারের অভ্যাস নেই। মনটা খেতে এবং খাবারেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। খাওয়ায় তার অরুচি হয় না কোনোদিন। খাওয়া হয়ে গেলে, কালকে আবার খাব এই ভেবে বেশ তৃপ্তি আসে মনে। বিয়ারের পরে একটি চুরুট ধরাতেই খানসামা আনে কফির কাপ।

তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তার বিলাসে গা ঢেলে দেয় গ্রুইটার: জিঞ্জারকে ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে মনে বেশ সুড়সুড়ি লাগছে তার—মৃদু হাসি ফুটে উঠছে মুখে—রাস্তার ধারে সে কর্মরত জিঞ্জারের চেহারা কল্পনা করে। আর ঐ তো একটি মাত্র লোক দ্বীপে, যার সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলা যায় মাঝে মাঝে। ওকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে কী লাভ হত? শুধু পাদরী-সাহেবের মেজাজ একটু আনন্দ পেয়ে বিগড়ে যেত। জিঞ্জার টেড অবশ্য বদমাইসের ধাড়ী—একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছে; কিন্তু গ্রুইটারের ভালো লাগত তাকে। বহু বোতল পার করেছে দুজনে, আর পোর্ট ডারুইন্ থেকে সেই ডুবুরীরা এলে কত রাত তারা পুরোদস্তুর জমিয়ে তুলেছে। কন্ট্রোলারের বেশ লাগত জিঞ্জারের এই বেপরোয়া জীবনের ঐশ্বর্য উড়িয়ে দেবার ধরনটা।

মেরক থেকে ম্যাকাসারগামী জাহাজে হঠাৎ একদিন দেখা গেল জিঞ্জারকে। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারল না কি করে সে উঠল। চলেছে জংলীদের সঙ্গে সব চেয়ে কম ভাড়ায়। চোখে ধরে গেল, নেমে পড়ল অ্যাল্যাস দ্বীপপুঞ্জে। গ্রুইটারের ধারণা, জিঞ্জারের আকর্ষণটা হল ডাচ পতাকা—মানে ব্রিটিশের এখানে নাক গলাবার উপায় নেই। কিন্তু ওর কাগজপত্রে কোনো গণ্ডগোল নেই—ফলে ওর থাকাতেও কোনো বাধা নেই। জিগগেস করায় বলল, এক অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানির জন্যে মুক্তো কিনতে এসেছে। পরে বোঝা গেল, ব্যবসাটা কিছু নয়। মদ খেতে এত সময় তার যেত যে অন্য কাজের অবসরই থাকত না। মাসে মাসে ছ'পাউণ্ড করে পেত সে ইংলণ্ড থেকে। কন্ট্রোলার ভেবে ঠিক করেছিল, এই টাকাটা জিঞ্জার পায় দূরে থাকবার মূল্য হিসেবে—না দিলে পাছে তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে এই ভয়ে তারা পাঠায়। কিন্তু টাকাটা বড় কম—বিশেষ কিছু করা যায় না। জিঞ্জার বেশি কথা বলে না। কন্ট্রোলার ওর পাসপোর্ট থেকে আবিষ্কার করেছে যে জিঞ্জার

ইংরেজ—নাম এডওয়ার্ড উইলসন—ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। তবে কেনই বা সে ইংলণ্ড ছাড়ল আর অস্ট্রেলিয়াতেই বা সে কি করত তা জানা যায়নি। সে যে কোন শ্রেণীর লোক তাও ঠিক বলা শক্ত। ছেঁড়া সার্ট, ছেঁড়া প্যাণ্ট আর একটি জরাজীর্ণ টুপি মাথায় দিয়ে সে যখন ডুবুরীদের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় কথা বলতো, মনে হত ও একটা মুখ্যু খালাসী কিম্বা মজুর, কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ; হাতের লেখা দেখলে কিন্তু বিস্ময় লাগে—মনে হয় বেশ লেখাপড়া জানা আছে। আর যদি কখনও তাকে একা পাওয়া যায়, মদে যখন সে মোটে জমে উঠেছে কিন্তু মাতাল হয়নি, তখন তার কথায় এমন জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় যা কোনও খালাসীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। স্পর্শকাতর কণ্ট্রোলার বেশ বুঝতে পারত যে জিঞ্জার তার পদমর্যাদা মোটেই স্বীকার করে না, কথা বলে যেন সমানে সমানে। তার সব টাকা—পাবার আগেই বন্ধক পড়ত আর কাবুলীওয়ালাদের মতো অপেক্ষমান চীনেম্যানদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যা থাকতো তা নিয়ে সোজা সে চলে যেত মদের দোকানে—চুর মাতাল হত। তখনই হত বিপদ, কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় যা-তা কাণ্ড করত—ফলে পড়ত পুলিশের হাতে।

এ পর্যন্ত গ্রূইটার তাকে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলে আটকে রেখে তারপরে ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দিত। পয়সা না থাকলে চেয়ে-চিন্তে যা পেত তাই দিয়েই নেশা করত। বার কয়েক গ্রূইটার এ-দ্বীপে সে-দ্বীপে চীনেম্যানদের রবারের আবাদে জিঞ্জারকে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে—সে কিন্তু দিন দু'চার পরেই ফিরে আসতো বারুতে। কেমন করে সে যে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকত—সেইটেই আশ্চর্য। তার ঐ এক ধরন ছিল জীবনের।

বাসিন্দাদের নানান ভাষা সে শিখে নিতো আর তাদের হাসাতে জানত জিঞ্জার। তারা ঘৃণা করত ওকে, কিন্তু ভয় পেত তার দৈহিক

শক্তিকে—আবার তার সাহচর্যও চাইত। তাই খাবার দুটো ভাত, আর শোবার একখানা মাদুরের জন্যে, তাকে ভাবতে হত না। আর সব চেয়ে আজব কথা হল এই যে. মেয়েদের নিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। এইটেই হলো পাদরী-সাহেবের রাগের সব চেয়ে বড় কারণ। আর মেয়েরাও যে ওর মধ্যে খুঁজে কি পেত তা কণ্ট্রোলার ভেবেই কুল পেত না। মেয়েদের ওপর গায়ে-পড়া ভাব তার মোটেও ছিল না—বরং তাদের সঙ্গে সে বেশ দুর্ব্যবহারই করত। সে শুধু নিত মেয়েদের কাছ থেকে, দিত না কিছু—কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত না। ভালো লাগলে ডাকত কাছে, তার পরেই ফেলে দিত অবহেলায়। দুই একবার এই নিয়ে সে গণ্ডগোলেও যে না পড়েছে এমন নয়। একবার তো এক মেয়ের বাপ দিলে জিঞ্জারের পিঠে ছুরি বসিয়ে—গ্রূইটার তখন সেই বাপকে আইনের প্যাঁচে ফেলে তবে সামলায়। আর একবার এক চীনেমেয়ে ওর জন্যে বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। মিস্টার জোনস্ একবার এক অভিযোগ নিয়ে এসে হাজির—তাঁর একজন শিষ্যাকে জিঞ্জার নাকি ফুসলে নষ্ট করেছে। কণ্ট্রোলার অবশ্য খুব দুঃখ প্রকাশ করল এবং পাদরী-সাহেবকে পরামর্শ দিল, 'দেখুন, এই সব অল্পবয়স্ক মেয়েদের ওপর একটু কড়া নজর রাখবেন।' কণ্ট্রোলারের অবশ্য তত ভালো লাগত না যখন সে দেখত যে, যে-মেয়েটার ওপর তার নিজের নজর পড়েছে এবং দেখা-সাক্ষাতও চলছে—সেই মেয়েটাও সমানে মিশছে জিঞ্জারের সঙ্গে। এই কথাটা মনে আসতেই কণ্ট্রোলারের মুখে মৃদু মৃদু হাসি দেখা দিল, জিঞ্জারের ছ'মাস জেল-বন্দীর কথা ভেবে। নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরে একজন শত্রুকে শাস্তি দেওয়া জীবনে বড় একটা ঘটে ওঠে না।

একদিন একটা কাজের তদারক করবার জন্যেও বটে, আবার ব্যায়ামের জন্যেও বটে, বেড়াতে বেড়াতে গ্রূইটারের চোখে পড়ল একদল কয়েদী—একজন রক্ষীর পাহারায় রাস্তায় খাটছে। তার মধ্যে জিঞ্জার টেডও

রয়েছে ; পরনে জেলের কুর্তি, গায়ে তেলচিটে মালয় ভাষায় যাকে বলে 'বাজু' আর মাথায় সেই জরাজীর্ণ টুপি। তারা রাস্তা মেরামত করছিল। জিপ্পারের হাতে একটা ভারি গাঁতি। রাস্তা এত সরু যে, কণ্ট্রোলারকে তার হাত খানেকের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। মনে পড়ল জিপ্পারের সেই দিব্যি-গালা। মেজাজ তার একেবারে বেখাপ্পা। কোর্টে যে ভাষা সে প্রয়োগ করেছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তাকে ছ'মাস জেল দিয়ে, কণ্ট্রোলার যে রঙ্গ করেছে তা সে ধরতেই পারেনি। হঠাৎ যদি সে এখন গাঁতি নিয়ে আক্রমণ করে তো নিশ্চিত মৃত্যু! অবশ্য রক্ষী তখনই ওকে গুলি করে মারবে, তবে তাতে কণ্ট্রোলারের ভাঙা মাথা তো আর জোড়া লাগবে না। ভয়ে কালিয়ে গিয়েও কণ্ট্রোলার পদমর্যাদা-সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে, না জোরে না আস্তে, চলে গেল কয়েদীদের মধ্যে দিয়ে, জিপ্পার গাঁতি রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসি চেপে নিল। সেই ঘন, চাপা, বক্র হাসিতে ভারি তৃপ্তি বোধ হলো গ্রূইটারের। ডাচ সিভিল সার্ভিসের অধস্তন কর্মচারী না হয়ে গ্রূইটার যদি হত বাগদাদের খলিফা, তাহলে সে এখনই জিপ্পারকে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিত স্নানের ঘরে—সেখানে ক্রীতদাসেরা তাকে স্নান করিয়ে, জরিদার পোশাক পরিয়ে, গন্ধ মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলে—গ্রূইটার তাকে নিয়ে বসে যেত বাদসাহী খানায়।

কয়েদী হিসেবে জিপ্পার আদর্শ। মাস দুয়েকের মধ্যেই, প্রান্তবর্তী একটা দ্বীপে, কাজের জন্যে কয়েকজন কয়েদী পাঠাবার সময় জিপ্পারকেও সেখানে পাঠিয়ে দিল কণ্ট্রোলার। সেখানে কোনো জেল ছিল না। দশজন কয়েদী বাসিন্দাদের বাড়িতেই আশ্রয় পেল, দিনের কাজের শেষে তারা মুক্ত জীবনই যাপন করত। কাজটায় জিপ্পারের বাকি মেয়াদটুকু কেটে গেল। সেখানে যাবার আগে কণ্ট্রোলার বলেছিল, 'এই জিপ্পার, এই নাও দশটা গিল্ডার—সিগারেট খেও সেখানে।'

'আরো কিছু বেশি দিতে পার না? মাসে মাসে তিরিশ গিল্ডার তো আসছেই আমার নামে।'

'না, আর নয়। টাকা যা আসে সব আমি রেখে দেব। ফিরে এসে যেখানে খুশি যাবার মতো বেশ খানিকটা টাকা তোমার হাতে পড়বে।'

'কেন, এখানে তো বেশ আছি।'

'যেদিন ফিরে আসবে, সেইদিনই স্নানটান সেরে আমার এখানে চলে এস—এক সঙ্গে বসে এক বোতল বিয়ার খাওয়া যাবে এখন।'

'সে মন্দ হবে না, শরীরটাও ততদিনে খাসা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

এইবার খেলা শুরু হল ভাগ্যের। যে দ্বীপে জিঞ্জার গেল তার নাম মাপুতিতি—অন্যান্য দ্বীপগুলির মতো এটিও পাহাড়ে ভরা, ঘন বনে সমাকীর্ণ। দ্বীপের মাঝে, নোনা হ্রদের ধারে, নারকেল-গাছে-ভরা একটা গ্রাম—তার কয়েকজন বাসিন্দা খ্রীস্টান হয়েছে। বারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত একটা স্টিমার। নানান দ্বীপ ঘুরে ঘুরে সেটা আসত যেত অনিয়মিত। যাত্রী নিত, মালও নিত। তবে গ্রামবাসীরা সকলেই সমুদ্র-যাত্রায় অভ্যস্ত—বিশেষ প্রয়োজন হলে একটা 'প্রাহু'তে করে চলে আসত বারু, এই পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে। জিঞ্জার টেডের মেয়াদের আর যখন দিন পনেরো বাকি, তখন গ্রামের খৃষ্টান মোড়লের হল অসুখ। দেশীয় শেকড়-বাকড়ে কিছুই হল না, যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। পাদরী-সাহেবের কাছে খবর গেল বারুতে, কিন্তু তিনি তখন ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত—নড়বার ক্ষমতা নেই। বোনের সঙ্গে কথা হলো:

পাদরী: 'মনে হচ্ছে এপেণ্ডিসাইটিসের চরম অবস্থা।'

মিস জোনস্: 'কিন্তু, তুমি তো যেতে পারবে না, ওয়েন।'

'কিন্তু লোকটাকে তো মরতে দিতে পারি না।'

মিস্টার জোনসের তখন জ্বর ১০৪°—যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে; সারা

রাত্রি ভুল বকেছেন, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—মিস জোনস্ বুঝতে পারলে নিতান্ত জোর করে তিনি মাথার ঠিক রাখছেন।

মিস জোনস্ : 'এ অবস্থায় তুমি অপারেশন করবে কি করে?'

'না, তা পারব না। তাহলে হাসান যাক।' হাসান হল কম্পাউণ্ডার।

'হাসানকে তোমার বিশ্বাস হয়? নিজের দায়িত্বে সে কখনও অপারেশন করতে রাজী হবে না। আর, তারাও ওকে করতে দেবে না। হাসান বরঞ্চ এখানে থেকে তোমার দেখা-শোনা করুক।'

'তুমি কি করে এপেণ্ডিকস্ কাটবে,' পাদরী জিগগেস্ করলেন।

'কেন, তোমাকে তো কতবার করতে দেখেছি,' উত্তর দিলে মিস জোনস্, 'আর ছোটখাটো অস্ত্র তো আমি অনেক করেছি।'

বোন যে কি বলছে মিস্টার জোনসের অস্বাভাবিক মস্তিষ্কে তা ঢুকল না। জিগগেস করলেন, 'লঞ্চটা কি ঘাটে রয়েছে।'

'না, কি একটা দ্বীপে গিয়েছে যেন। কিন্তু যে প্রাহুটাতে ঐ লোকগুলো এসেছে, সেটায় তো আমি যেতে পারি।'

'তুমি! তোমার কথা আমি ভাবছি না। তোমার যাওয়া হবে না।'

'আমি যাচ্ছি, ওয়েন।'

'কোথায়?'

মিস জোনস্ দেখল মন তাঁর ইতিমধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। নিজের স্নিগ্ধ হাত রাখল তাঁর কপালে—এক দাগ ওষুধ দিল। বিড়বিড় করে বকছেন তিনি—কোথায় আছেন তাও বুঝতে পারছেন না। ভাবনা যদিও হচ্ছিল তাঁর জন্যে, তবু অসুখটা তাঁর শক্ত নয়—কম্পাউণ্ডার আর ঐ ছেলেটার হাতে অনায়াসে রেখে যাওয়া যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস জোনস্—একটা রাত্রির পোশাক, এক প্রস্থ জামা-কাপড় আর প্রসাধন সামগ্রী পুরে নিল ব্যাগে।

অস্ত্র করবার যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজ এবং এ্যান্টিসেপটিক, একটা ব্যাগে সব

সময় মজুত থাকত। মাপুতিতি থেকে যে ছেলেদুটো এসেছে তাদের হাতে সেটা দিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বলল, 'দাদা সুস্থ হলে তাঁকে জানিয়ো আমি কোথায় গেছি। তিনি যোটে যেন উদ্বিগ্ন না হন।' টুপিটা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মিস জোনস্। একটু জোরেই হেঁটে চলল কারণ মিশন ছিল গ্রাম থেকে প্রায় আধমাইল দূরে। 'প্রাহু'টা দাঁড়িয়েছিল জেটির প্রান্তে—ছ'টা লোক দাঁড় বাইবার। মিস জোনস্ গিয়ে সামনে বসতেই ছেড়ে দিল 'প্রাহু' জোরে। তীরে পাহাড়ের মধ্যে সমুদ্র ছিল শান্ত, বেরিয়ে আসতেই হয়ে উঠল রুক্ষ। তবে, মিস জোনসের এইরকম যাওয়া এই প্রথম নয়; তাই এই ছোট্ট নৌকোয় তার একটুও ভয় লাগল না। দুপুর-বেলা, তামাটে আকাশ থেকে নেমে আসছে খর উত্তাপ। মিস জোনসের কেবলই ভয় হচ্ছে, যদি এরা দিন থাকতেই না পৌঁছতে পারে আর রাত্রেই যদি অস্ত্র করার দরকার হয়, তাহলে সম্বল শুধু হ্যারিকেন লণ্ঠন। বয়স মিস জোনসের চল্লিশের কাছাকাছি। যে দৃঢ়তার পরিচয় এখনি সে দিল, তা তার দেহ দেখে বুঝবার উপায় নেই। লম্বা, অত্যন্ত রোগা, বুকটা চ্যাপটা; ফ্যাকাশে মুখ, ঘামাচিতে ভর্তি; সোঁটা-সোঁটা বাদামী চুল কপাল থেকে টান করে আঁচড়ানো—ছাই রঙের চোখ দুটি এত কাছাকাছি বসানো যে, দেখলে মনে হয় কুচুটে। টানা, সরু লালচে নাক। বদহজমে বড় ভোগে মিস জোনস্, কিন্তু ভুগলে কি হবে, তাতে তার দাঁতে দাঁত চেপে লোকের ভালোটুকু খুঁজে বের করার চেষ্টার কামাই নেই। যাদুকর যেমন টুপি থেকে মন্ত্রের জোরে খরগোস বের করে, মিস জোনস্ তেমনি প্রাণপণ চেষ্টায় পাপে-ভরা পৃথিবীর কদর্য মানুষের মধ্যে থেকে টেনে বের করে সৌন্দর্য। কোনো কাজে তার ক্লান্তি নেই; জানেও সব, আর করেও ঠিক। পৌঁছে দেখল লোকটাকে বাঁচাতে হলে এখনি অস্ত্র করা দরকার। একটা দেশীয় লোককে ক্লোরোফর্ম দিতে বলে মিস জোনস্ অস্ত্রোপচার করল

অত্নে আর তার পরের তিনদিন ধরে করল তার অক্লান্ত সেবা। এর চেয়ে ভালো অস্ত্র মিস্টার জোনস্‌ও করতে পারতেন না। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে, সেলাই-টেলাই কেটে দিয়ে, মিস জোনস্ প্রস্তুত হল ফিরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এতদিন যে থাকল,এর মধ্যে সময় একটুও নষ্ট করেনি সে। অনেকের অসুখের সেবা করল সে, ফলে অনেকের খৃষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস করল দৃঢ়। যারা ধর্মকে তেমন কেয়ার করে না, তারাও সমীহ করতে শুরু করলে। ভগবানের বাণীর বীজ মিস জোনস্ ঠিক জায়গাতেই ছড়িয়ে গেল। কালে গাছ হলেও হতে পারে।

অন্য দ্বীপ থেকে ঘাটে এসে লাগতে স্টিমলঞ্চটার প্রায় সন্ধ্যেই হয়ে গেল। তবে পূর্ণিমার রাত্রি, আশা করা যায় মাঝরাতের আগেই বারু পৌছান যাবে। মিস জোনসের জিনিসপত্র সেখানকার লোকেরাই বয়ে এনে তুলে দিল—প্রায় একটা ভীড়ই জমে উঠল ঘাটে—সকলেই তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত। শুকনো নারকেলের বস্তায় স্টিমারটা বোঝাই। মিস জোনসের অবশ্য এ-গন্ধ সওয়া অভ্যাস আছে। ওর মধ্যেই বেশ একটু জায়গা করে নিয়ে, সে সমবেত কৃতজ্ঞ জনতার সঙ্গে গল্প করতে করতে দেখল: দূরে, ঘন গাছের আড়াল থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে একজন শাদা-চামড়া। জেলের পোশাক, সেই টুপি আর লাল চুল, দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে সে জিঞ্জার টেড। সঙ্গে একজন পুলিশ। পরস্পরের সঙ্গে তারা করমর্দন করে, বোঝা বোঝা ফল আর একটা জার স্টিমারে তুলে দিল। জারে নিশ্চয় দেশী মদ। মিস জোনস্ অবাক হয়ে গেল—জিঞ্জারও সেই স্টিমারে আসছে দেখে। তার মেয়াদ শেষ হওয়ায়, বারু থেকে হুকুম এসেছে এই লঞ্চেই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। টেড তার দিকে তাকাতেই মিস জোনস্ মুখ ফিরিয়ে নিলে। জিঞ্জার উঠে এল স্টিমারে, সারেঙ চালিয়ে দিল লঞ্চ—ঝক্ ঝক্

ঝক্ ঝক্—চলল লঞ্চ ধোঁয়া ছাড়ি দিয়ে। জিঞ্জার কতগুলি বস্তার ওপর গিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

মিস জোনস্ অবশ্য তাকে কোনো আমলই দিল না। টেডকে ভালো জানা ছিল বলেই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল—আবার সেই খুন-খারাপী, বদমায়েসী, মেয়েদের আবার সেই বিপদ। ভদ্রলোকদেরও ভদ্রস্থ রাখবে না সে। ওকে দ্বীপান্তরে না পাঠাবার জন্যে মিস জোনস্ তারি চটে গিয়েছে কণ্ট্রোলারের ওপর। সমুদ্রে এসে লঞ্চটা পড়তেই জিঞ্জার জারের ছিপি খুলে চক চক করে কি খানিকটা টেনে নিল, সেটা এগিয়ে দিল লঞ্চের দুজন মিস্ত্রীর হাতে। তাদের একজন যুবক, একজন বুড়ো। কঠিন স্বরে মিস জোনস বলে উঠল বুড়োকে, 'তোমাদের এই পথের মধ্যে মদ খাওয়া আমি মোটেও পছন্দ করি না।'

সে একটু হেসে, এক ঢোক খেয়ে, পাত্রটি সঙ্গীকে দিয়ে বলল, 'একটু-খানি ঘরের তৈরি জিনিসে কি আর দোষ বলুন।'

'তোমরা যদি আবার খাও আমাকে বাধ্য হয়ে কণ্ট্রোলারকে জানাতে হবে।'

বুড়ো যেন কি একটা বলে জিঞ্জারকে ফিরিয়ে দিল জারটা। মিস জোনস্ সে কথার মানে না বুঝলেও, সেটা যে অভদ্র একটা কিছু তা বুঝতে তার বাকি রইল না। ঘণ্টাখানেক চলল স্টিমার; কাঁচের মতো স্বচ্ছ সমুদ্রে জলজ্বলে সূর্য অস্ত গেল একটা দ্বীপের ওপারে—দ্বীপটা হয়ে উঠল মোহময়, আকাশবাসী। তাই দেখে মিস জোনসের হৃদয় অপূর্ব কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল—এত সুন্দর এই পৃথিবী! মনে মনে কবির কথা স্মরণ করল: 'আর শুধু মানুষই কদর্য।'

আলো জ্বলল স্টিমারে—দূরে একটা দ্বীপ—পাহাড় এবং বন সমাকুল, অনধ্যুষিত। পুব দিকে চলেছে তারা। অতর্কিতে এল রাত্রি, তারায় ঘন হয়ে উঠল আকাশ। চাঁদ উঠতে এখনও দেরি আছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকানির পরেই দুলতে লাগল স্টিমার।

মিস্ত্রী, সারেঙের আসা-যাওয়া, জিঞ্জারের এঞ্জিনরুমে যাওয়া আবার ফিরে আসা—বোঝা গেল কিছু হয়েছে লঞ্চে। মিস জোনসের ইচ্ছা হল একবার জিগগেস করে জিঞ্জারকে, কিন্তু পেরে উঠল না। যে গতিতে চলেছে স্টিমার, বারু পৌঁছতে রাত ভোর হয়ে যাবে। সারেঙ নিচে থেকে চেঁচিয়ে কি বলল, উপর থেকে লোকগুলো উত্তর দিল বুগী ভাষায়—মিস জোনস্ বুঝতে পারলে না; কিন্তু দেখল স্টিমারের গতি পরিবর্তিত হয়েছে—সেটা চলেছে ঐ জনহীন দ্বীপটার অভিমুখে। আতঙ্কে, হালের লোকটাকে জিগগেস করল মিস জোনস্, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

সে ঐ দ্বীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। মিস জোনস্ উঠে গিয়ে সারেঙকে নিচে থেকে উপরে ডেকে জিগগেস করল, 'ঐ দ্বীপে যাওয়া হচ্ছে কেন? কি, হয়েছে কি?'

সে উত্তর দিল, 'বারুতে পৌঁছতে পারব না বলে।'

মিস জোনস্: 'কিন্তু যেতে তোমাকে হবেই। আমার হুকুম তোমাকে যেতে হবে।'

লোকটা মাথা নেড়ে আবার নিচের ঘরে চলে গেল, মিস জোনসের দিকে পিছন ফিরে। তখন জিঞ্জার বলল, 'প্রোপেলারের পাখা ভেঙে গিয়েছে একখানা। ও বলছে কোনো রকমে ঐ দ্বীপটা পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে। ভোর বেলা, জোয়ার নেমে গেলে, পাখা আবার লাগিয়ে নিয়ে চালাবে।'

'রাতে আমি একা ঐ জনহীন দ্বীপে তোমাদের সঙ্গে থাকব কি করে?' চীৎকার করে উঠল মিস জোনস্।

'ভাবনা কি, ঝাঁকে ঝাঁকে যেয়ে এসে উঠবে স্টিমারে।'

'আমি বারু যাবই। যাই ঘটুক না কেন আজ রাতে বারু আমাকে পৌঁছাতেই হবে।'

'আরে বুড়ী, ঘাবড়াও মৎ। প্রোপেলার লাগাতে তো হবে, দ্বীপে বেশ থাকা যাবে রাতে।'

'আচ্ছা অসভ্য লোক তো তুমি! কোন সাহসে তুমি আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলছ?'

'আরে! খাবার-দাবার তো সঙ্গেই রয়েছে—নেমে বসে গেলেই হল। তার ওপর একটু মাল চড়ালেই দেখবে—একেবারে চন চন করে উঠবে শরীর। তোফা থাকা যাবে।'

'বেয়াদবির সীমা আছে একটা! বারুতে গিয়ে তোমাদের সব জেলে না পাঠাই তো···'

'বারু-টারু যাওয়া আর হবে না। ঐ দ্বীপেই যাচ্ছি আমরা। তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, নেমে গিয়ে সাঁতার কেটে সটকে পড়তে পার।'

'আচ্ছা, এর ফল পাবে তোমরা!'

'থাম্, ধাড়ী গরু!'

রাগে দম বন্ধ হয়ে গেলেও মিস জোনস্ সামলে নিল। এই সমাজহীন সমুদ্রের মাঝখানেও ঐ পশুটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগল। লঞ্চটা ধক্ ধক্ করতে করতে গড়িয়ে চলেছে। ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার; দূরে দ্বীপটা দেখা যায় না। ভ্রূকুটি করে, ঠোঁট চেপে, রাগে ফুলতে লাগল বসে মিস জোনস্; নিজের ইচ্ছায় বাধা পাওয়া তার অভ্যাস নয়। চাঁদ উঠতেই দেখল— বস্তাগুলোর উপর জিঙ্গার শুয়ে রয়েছে—সিগারেটের আগুনটা বীভৎস উজ্জ্বল। দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। স্টিমার গিয়ে লাগল সেখানে। হঠাৎ মিস জোনস্ আঁতকে উঠল। সত্যি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এইবার তার রাগ পর্যবসিত হল ভয়ে। থরথর করে বুক পর্যন্ত কেঁপে উঠল তার, যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে! এইবারে বোঝা গেল সব। প্রোপেলার ভেঙে যাওয়াটা সত্যি না মিথ্যে? যাই হোক, জিঙ্গার টেড এ-সুযোগ ছেড়ে দেবে না। মেয়েমানুষ

বলতে সে পাগল—আজ রাত্তিরে তার ওপর সে অত্যাচার করবেই। তাই তো করেছিল মিশনের সেই মেয়েটাকে—আহা, কি ভালো ছিল মেয়েটা—কেমন সুন্দর সেলাই করত! মেয়েটা বারবার ওর কাছে গিয়েই তো মাটি করল, কোর্টে গিয়ে শুধু দুর্ব্যবহারের কথাই বললে। তা না হলে তো এতদিন ও পশুটা জেলে পচত। কন্ট্রোলারের কাছে গিয়ে নালিশ করাতে সে এ ব্যাপারে কিছু করতে রাজী হয়নি। বলেছিল, 'রকম-সকম দেখে তো মনে হয় না যে এ-ঘটনা মেয়েটির খারাপ লেগেছে।'

টেডটা একটা শয়তান। আর সে নিজে 'শাদা মেয়ে।' পুরুষমানুষকে তার জানা আছে। কোনো মতেই টেড আজ ছাড়বে না। তবু সহজে তাকে পাবে না টেড। না, না, ভয় পেলে চলবে না। তার ধর্ম নষ্ট করলে টেডকেও তার মূল্য দিতে হবে। আর যদি টেড তাকে মেরে ফেলে! ফেলুক, তবু প্রাণ থাকতে সে টেডকে······ আর যদি মরেই তো মিলবে যীশুর কোলে চিরবিশ্রাম, তাঁর স্বর্গের মনোহর হর্মে। চোখের সামনে মিস জোনসের আলো খেলে গেল। স্বর্গের প্রাসাদটা একটা চিত্রশালা আর একটা আলোকিত রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি মতন হবে হয়তো।

মিস্ত্রীদের সঙ্গে জিঞ্জার লাফিয়ে পড়ল কোমর জলে। এই অবসরে মিস জোনস্ তার বাক্স থেকে ব্যাগ থেকে ডাক্তারী-ছুরি চারখানা বের করে পোশাকের ভেতর লুকিয়ে রাখল। যদি জিঞ্জার আসে তো আমূল বসিয়ে দেবে তার বুকে।

'তাহলে এইবার নেমে পড়ুন আপনি; তীরে এখানকার চেয়ে থাকবেন ভালো,' জিঞ্জার এসে বলল।

মিস জোনস ভেবে দেখল সেইটেই ঠিক—তীরে অন্তত ছুটে এদিক ওদিক পালানো যাবে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে বস্তাগুলোর উপর দিয়ে

কোনোরকমে নেমে আসতে লাগল। জিঞ্জার এগিয়ে দিল নিজের হাতখানা।

'তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই,' বলল মেয়েটা একান্ত ঔদাসীন্যে।

'তবে গোল্লায় যাও,' উত্তর দিল টেড।

নামতে গেলেই হাঁটু পর্যন্ত গাউন উঠে যাবেই। বিশেষ সাবধানে পা না অনাবৃত করে নেমে এল মিস জোনস্।

'ভাগ্যিস কিছু খাবার আছে সঙ্গে। আগুন করে, বসে কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর এক চুমুক আরক খেলেই বেশ লাগবে এখন,' বললে জিঞ্জার।

'আমার কিছু চাই না। আমার কাছে তোমাদের আসারও দরকার নেই।'

'তুমি না খেলে আমার ভারি বয়েই যাবে।'

উত্তর না দিয়ে মাথা সোজা করে হেঁটে চলে গেল মিস জোনস্—হাতে সব চেয়ে বড় ছুরিটা। চাঁদের আলোয় পথ দেখা যায়। এখন চাই একটা লুকোবার জায়গা। বন অবশ্য তীর পর্যন্ত ঝুঁকে এসেছে—সেখানে যে লুকোনো যায় না, তা নয়। কিন্তু কি জানি বাঘ, ভাল্লুক, সাপ—কি আছে বনে! হাজার হলেও সে মেয়েমানুষ তো! ঐ অন্ধকার অজানা বনে ঢোকার চেয়ে ঐ তিনটে জানা-বদমাইস লোককে চোখছাড়া না করাই ভালো। সামনেই একটা গুহা। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ওরা নিজেদের কাজেই ব্যস্ত—তাকে দেখতে পাবে না। ঢুকে পড়ল গুহাটায় সে। মিস জোনস্ আর ওদের মধ্যে পাহাড়ের ব্যবধান। ওরা তাকে দেখতে না পেলেও সে দেখতে পাবে জিঞ্জারদের। মিস জোনস্ দেখল ওরা স্টিমার থেকে কি সব আনল; আগুন জ্বালাল, বসল তার চারদিকে—তার পরে চলল খাওয়া। তারপর মদ। তাহলে ওরা কি মাতাল হবে নাকি? কি হবে তাহলে? জিঞ্জারের গায়ে জোর অসাধারণ। তবু, একা তাকে হলে পারা যায়। কিন্তু ঐ তিন-তিনটে মাতালকে

কি করে সে রুখবে? মনে হল ছুটে গিয়ে জিঙ্গারের পায়ে পড়ে বলে, 'দোহাই তোমার, আমায় ছেড়ে দাও।' জিঙ্গারেরও তো মা-বোন আছে —একটু শ্লীলতাবোধও কি ওর নেই! কিন্তু নেশায়, কামনায় যে পাগল তার কি ও-সব বোধ থাকে? বড় দুর্বল মনে হচ্ছে মিস জোনসের— কান্না পাচ্ছে। কাঁদলে চলবে না—শক্ত হতে হবে। ঠোঁট কামড়ে ধরে বলির পাঁঠার মতো ঐ তিনজন ঘাতককে সে দেখতে লাগল। তারা আরও কাঠ দিল আগুনে, জিঙ্গার সারঙ পরে বিরাট ছায়ার মতো বসে আছে। হয়তো নিজের কামনা মিটলে, তাকে ওদের হাতে দিয়ে দেবে সে। কেমন করে মিস জোনস্ আর ভায়ের কাছে ফিরে যাবে? মিস্টার জোনস্ অবশ্য সহানুভূতি দেখাবেন, কিন্তু আর কি তিনি সেই ভাই থাকবেন? তাঁর বুক ভেঙে যাবে একেবারে। হয়তো তিনি ভাববেন সে যথেষ্ট বাধা দেয়নি। তাঁকে কিছু না বলাই ভালো হবে। ওরা নিজেরা নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। কারণ, বললেই কুড়ি বছর করে জেল। কিন্তু, যদি তার ছেলে হয়!—এত জোরে চেপে ধরল ছুরিটা ভয়ে মিস জোনস্ যে হাতটা আরেকটু হলেই কেটে যেত আর কি। আর, যদি সে বাধা দেয়, তাহলে ওরা যাবে আরও চটে।

চীৎকার করে উঠল সে, 'কি করি আমি? কি করেছি আমি, যে আমার এই শাস্তি?'

উপুড় হয়ে পড়ে সে আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল—বহুক্ষণ। সে কুমারী, সে স্মরণ করিয়ে দিল ভগবানকে, স্মরণ করিয়ে দিল সেন্ট পল্ কুমারীত্বের কত মূল্যই না দিয়েছেন। তারপরে, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আবার দেখল তাকিয়ে, ওরা তামাক খাচ্ছে—আগুনটা এসেছে নিভে। এইবার হয়তো এই নিঃসহায় স্ত্রীলোকটির দিকে লোলুপ মন ফিরবে জিঙ্গারের। হঠাৎ জিঙ্গার উঠে সেইদিকে আসতেই একটা আর্ত চীৎকার চেপে নিল মিস জোনস্। তার দেহের সব পেশী হয়ে উঠল

শক্ত। বুক দুরদুর করে উঠলেও শক্ত করে ধরল ছুরি। কিন্তু জিঞ্জার উঠেছিল অন্য প্রয়োজনে। মিস জোনস্ লজ্জায় সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। জিঞ্জার হেলতে দুলতে গিয়ে আবার মদের পাত্র তুলল মুখে। মিস জোনস্ উপুড় হয়ে, চোখ টাটিয়ে, দেখতে লাগল। তাদের কথাবার্তা ঝিমিয়ে এল এবং একটু পরেই মনে হল অন্য দুজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। এই ক্ষণের জন্যেই অপেক্ষা করছিল জিঞ্জার। ওরা যখন ঘুমে অচেতন সেই সময় নিঃশব্দে আসবে ও। তাহলে জিঞ্জার কি সঙ্গীদের ভাগ দিতে চায় না ; কিম্বা এই কুকীর্তির কথাটা ওদের পর্যন্ত জানাতে চায় না। হাজার হলেও সেও সাহেব এবং মিস জোনস্ও মেম। সে কিছুতেই এই অসভ্যদের হাতে তাকে সমর্পণ করবে না। এইবার একটা বুদ্ধি এল মিস জোনসের মাথায়। জিঞ্জার যখন এগিয়ে আসবে, তখন সে চীৎকার করে জাগিয়ে দেবে ঐ লোক দুটোকে। এখন মনে হল, ঐ বুড়ো লোকটা, কানা হলেও, ওর মুখটা বেশ করুণা মাখানো। কিন্তু জিঞ্জার যে নড়ে না। মিস জোনস্ও অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে। মনে হচ্ছে, তার বুঝি প্রতিরোধ করার শক্তিটুকুও নেই। এতো সয়েছে সে! চোখ বুজে এলো তার।

চোখ খুলে দেখলে পরিষ্কার দিনের আলো। ঘুমিয়ে তো সে পড়েছিলই এবং এতই আবেগবিধ্বস্ত হয়েছিল যে সকাল হলেও ঘুম ভাঙেনি। শরীরটা বেশ ভালো বোধ হওয়ায় উঠতে যেতেই পায়ে কি একটা বেধে গেল মিস জোনসের। তাকিয়ে দেখল দুটো খালি চটের বস্তা কে রাতে এসে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে তার গায়ে। জিঞ্জার টেড নাকি? এ্যাঁ! তাহলে ঘুমের ঘোরে কি তার ধর্ম নষ্ট করেছে জিঞ্জার! কিন্তু তা কি করে হবে? তবু ইচ্ছে করলেই তো পারত! অসহায় পড়েছিল সে। দয়া করেছে জিঞ্জার তাকে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মুখ। উঠে দাঁড়াতেই বুঝল গায়ে হাতে ব্যথা। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে, কুড়িয়ে

নিল হাত-থেকে-পড়ে-যাওয়া ছুরি—ধীরে ধীরে বস্তা ছুটো হাতে করে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। লঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল সেটা খাঁড়ির অগভীর জলে ভাসছে।

'এস মিস জোনস্, আমাদের লঞ্চ তৈরী। তোমাকে আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম,' বলল জিঞ্জার। মিস জোনস্ তাকাতেই পারল না মুখ তুলে, শুধু লজ্জায় টিয়ার ঠোঁটের মত লাল হয়ে উঠল।

'কলা খাবে একটা,' জিগগেস করল জিঞ্জার।

খিদে পেয়েছিল মিস জোনসের। বিনা দ্বিধায় সেটি নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল।

'এই পাথরটার উপর দিয়ে লঞ্চে যদি ওঠো তোমার পা ভিজবে না,' জিঞ্জার জানিয়ে দিলে।

মিস জোনসের মনে হল লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। তবু শুনল জিঞ্জারের কথা। জিঞ্জার এসে তার বাহু ধরে সাহায্য করল। মা গো! এ যে শক্ত লোহা! এরই সঙ্গে কি না কাল রাতে সে লড়বে মনে করেছিল। জাহাজে তাকে তুলে দিল জিঞ্জার। সারেঙ চালিয়ে দিলো এঞ্জিন; তিন ঘণ্টায় পৌঁছে গেল বারু।

ছাড়া পেয়ে সেদিন সন্ধ্যেবেলাই জিঞ্জার গেল কণ্ট্রোলারের ওখানে। তার পরনে তখন আর জেলের সারঙ নেই—তবে সেই ছেঁড়া খাকি প্যান্ট আর সার্ট ঠিক আছে। চুল ছাঁটার ফলে মনে হচ্ছে তার মাথায় যেন একটা লাল টুপি পরেছে সে। একটু রোগা হয়েছে বটে তবে মুখের সেই ফুলোফুলো ভাবটা চলে যাওয়ায় বেশ তাজা দেখাচ্ছে তাকে—যেন বয়েস অনেক কমে গিয়েছে। গ্রূইটার তার গোল মুখে একগাল হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা করল জিঞ্জারকে। খানসামা নিয়ে এল দু' বোতল বিয়ার।

'আমার নেমন্তন্ন ভোলনি দেখছি,' বললে কণ্ট্রোলার।

'ভুলিনি মানে? এই দিনটার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি আজ ছ'মাস ধরে।'

'ভাগ্য তোমার খুলুক, জিঞ্জার।'

'তোমারও তাই হয় যেন।'

দু'জনে দু'গেলাশ শেষ করে কণ্ট্রোলার হাততালি দিয়ে উঠল। আরও দু' বোতল নিয়ে এল খানসামা।

'আমার ওপর তোমার রাগ নেই তো জিঞ্জার?'

'কিছু না। অবশ্য রক্তটা ধক করে চড়ে গিয়েছিল বটে, তবে সামলে নিয়েছি। যে রকম ভেবেছিলাম তার অর্ধেকও খারাপ নয় জেল-জীবন। আর ঐ দ্বীপটায় সব খাসা খাসা মেয়ে, কণ্ট্রোলার। তোমার একবার দেখা উচিত।'

'তোমার কিছু আর ভাস্তি নেই জিঞ্জার।'

'একেবারে না।'

'বলি, বিয়ারটা কেমন?'

'চমৎকার!'

'তাহলে আর একটু আনানো যাক।'

ইতিমধ্যে যে টাকা জমেছে, তা থেকে সেই চীনেম্যানকে ক্ষতিপূরণ দিয়েও একশ পঞ্চাশ গিলডারের উপর থাকবে জিঞ্জারের।

'এতগুলো টাকা দিয়ে তোমার কিছু একটা করা উচিত জিঞ্জার।'

'কিছু নিশ্চয় করব—অর্থাৎ খরচ করব,' বললে জিঞ্জার।

কণ্ট্রোলারের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। 'তা, খরচ করা ছাড়া টাকা আর কিসের জন্যে,' বলল সে।

দ্বীপের সব খবরাখবর জিঞ্জার শুনল; বিশেষ কিছুই ঘটেনি। সময়েরও অ্যালাস দ্বীপপুঞ্জে যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি বাইরের পৃথিবীরও অস্তিত্ব নেই এদের অধিবাসীদের কাছে। তারা বেশ আছে।

জিঞ্জার : 'কোথাও যুদ্ধ-টুদ্ধ বেধেছে নাকি ?'
'কই, নজরে তো পড়েনি। হ্যারি যারভিস্ একটা মস্ত বড় মুক্তো পেয়েছে—দাম হাঁকছে ১৫০০০ গিলডার।'
'পাবে—আশা করি।'
'চার্লি ম্যাককর্মাকের বিয়ে হয়ে গেল।'
'ওটা একটু নরম মাটিই ছিল চিরকাল।'
এমন সময় হঠাৎ চাকর এসে বলল, মিস্টার জোনস্ দেখা করতে চান, আর কন্ট্রোলার হাঁ, কিম্বা না বলবার আগেই তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন।
'আমি বেশি সময় আপনাদের নষ্ট করব না। সারা দিন ধরে আমি এই সাধু ব্যক্তিটিকে খুঁজছি। আপনারা এখানে আছেন শুনে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না,' বললেন মিস্টার জোন্স্।
কন্ট্রোলার বিনীতভাবে জিগগেস করল, 'মিস জোনস্ ভালো আছেন তো ? খোলা মাঠে রাত কেমন কাটালেন ?'
'একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বৈকি, জ্বরও হয়েছে একটু। বলে তো এসেছি শুয়ে থাকতে। তবে বিশেষ কিছু নয়।'
মিশনারী ঢুকতেই এরা দাঁড়িয়ে উঠেছিল; এইবার তিনি জিঞ্জারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন: 'ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে, আপনার মহত্বের জন্যে। আমার বোন ঠিকই বলে—লোকের ভালোটা আগে দেখা উচিত। অতীতে আপনাকে ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।'
টেড অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আর জোনস্ গম্ভীর হয়ে কথা বলতে বলতে তার হাত চেপে ধরলেন। কি আর করে টেড! বলল, 'কি মাথা-মুণ্ডু বকছেন আপনি ?'
'আমার বোনকে হাতের মধ্যে পেয়েও আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। ভেবেছিলাম আপনি একেবারে মন্দ—এখন আমি লজ্জিত হচ্ছি। সত্যিই তো,

মার্থা একেবারে অসহায় হয়েই পড়েছিল আপনার হাতে, তবু আপনি তার অপমান করেননি। আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, মিস্টার টেড। আমরা কখনও ভুলব না এ উপকার। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' গলার স্বর কেঁপে যেতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন মিস্টার জোনস্। টেডের হাত ছেড়ে দিয়ে, তার শূন্য দৃষ্টির সামনে দিয়েই তিনি বেগে বেরিয়ে গেলেন।

'কি ছাই-ভস্ম বকে গেল ?' জিগগেস করল টেড।

কণ্ট্রোলার হাসতে আরম্ভ করল। কিছুতেই সে আর হাসি থামাতে পারে না। যত চেষ্টা করে তত হাসি ছাপিয়ে ওঠে, আর তার ভুঁড়ির থাক ফুটে ওঠে সারঙের ওপর। চেয়ারে হেলান দিয়ে কণ্ট্রোলার এ-পাশ আর ও-পাশ করছে; তার শুধু মুখই যে হাসছে তা নয়, সারা দেহ—এমন কি তার পায়ের চর্বি পর্যন্ত যেন তাতে যোগ দিচ্ছে। পাঁজর চেপে ধরছে কণ্ট্রোলার। জিঞ্জার হাসির কারণটা না বুঝতে পেরে, ক্রমশ রেগে উঠতে উঠতে শেষে একটা বিয়ারের বোতল তুলে নিয়ে বলল, 'হাসি না থামালে মাথাখানা স্রেফ ফুঁ-ফাঁক করে দেব।'

কণ্ট্রোলার মুখ মুছে এক চুমুক বিয়ার খেল। তার পাঁজরের পাশগুলো হাসির দমকে ব্যথা করছিল। অবশেষে, তার মুখ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল, 'তার বোনের গায়ে হাত না-দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল।'

'আমাকে !' চেঁচিয়ে উঠল জিঞ্জার। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। কিন্তু যেই না ঢোকা, রেগে আগুন হয়ে উঠল টেড। এমন খিস্তি শুরু করল, যে শুনলে একটা খালাসিও কানে আঙুল দেবে।

'ঐ ধাড়ী গরু ! লোকটা আমায় কি মনে করে কি।' কণ্ট্রোলার হিহি

করে হাসতে হাসতে বলল, 'মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার একটু সুনাম আছে কি না।'

'আরে বলে কি, এ্যাঁ! একটা দাঁড়ের ডগা দিয়েও যে ওকে আমি ছোঁব না! থুঃ! ও লোকটার মণ্ডুপাত করব আমি। এই কণ্ট্রোলার, আমার টাকাগুলো দাও, আমি মদ খাব।'

'আমি অবশ্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না,' বললে কণ্ট্রোলার।

'একটা ধাড়ী গরু, ছিঃ! ধাড়ী গরু একটা!'

সত্যিই জিঞ্জার ভারি অপমানিত বোধ করছিল। একটু শীলতা-জ্ঞানও কি পাদরীটার নেই?

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে টাকাটা তখনই দিয়ে দিল গ্রুইটার, বলল, 'মদ খাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু গণ্ডগোল করলে এবার এক বছর।'

জিঞ্জার গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'কিছু করব না এবার।' বড় আঘাত লেগেছিল তার। কণ্ট্রোলারকে শুনিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'একেবারে ডাহা অপমান করে গেল এ্যাঁ! ডাহা অপমান!' বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল, 'শালা শূয়োর কোথাকার।' সারা সপ্তাহ মাতাল হয়ে রইল জিঞ্জার। মিস্টার জোনস্ আবার দেখা করতে এলেন কণ্ট্রোলারের সঙ্গে।

এসে বললেন, 'বেচারী আবার সেই পুরোনো ধারা ধরেছে। বড় হতাশ হয়েছি আমরা ভাই বোনে। অত টাকা একসঙ্গে ওকে না দিলেই হত।' ওর টাকা আমি কি করে আটকে রাখি বলুন?'

'আইনতঃ পারেন না বটে। তবে নীতির দিক থেকে তো পারেন।'

তারপর মিস্টার জোনস্ দ্বীপে সেই রাত্রির ঘটনা সব শোনালেন গ্রুইটারকে: মিস জোনসের আতঙ্ক, জিঞ্জারের কামোন্মাদনা, ছুরি নিয়ে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা মিস জোনসের—সব শেষে প্রার্থনা এবং ঘুম। বড়

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। সকালে ঘুম ভেঙে দেখল তার গায়ের ওপর বস্তা চাপানো। তার অসহায় অবস্থা, তার নিষ্কলঙ্কতাই নিশ্চয় জিঞ্জারকে নিবৃত্ত করেছিল—তাই দয়ায় সে ওর দেহ ঢেকে দিয়েছিল আচ্ছাদনে।

'তাহলেই দেখছেন, মানুষের হৃদয়ের গভীরে খাঁটি জিনিসটি কখনও মরে না। এখন আমাদের কর্তব্য ওকে এই পাপ থেকে বাঁচানো।'

'দেখুন,' কনট্রোলার বলল, 'আমি হলে ওর টাকা ক'টা ফুরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। আগে দেখুন ও জেলে যায় কিনা ; তারপর যা খুশি করবেন।'

জিঞ্জারের কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার কোনো ইচ্ছাই দেখা যাচ্ছে না। ছাড়া পাওয়ার দিন পনেরো পরে একটা চীনেম্যানের দোকানের সামনে টুলে বসে আছে, দেখল যে মিস জোনস্ আসছে। মিনিট খানেক অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি কতকগুলো অভদ্র কথা বিড় বিড় করে উঠল। মিস জোনস্ তার দিকে তাকাতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল—তবু মিস জোনস্ যে তার দিকেই আসছে এ তার বুঝতে বাকি রইল না। জোরে হেঁটেই আসছিল মিস জোনস্, কিন্তু তাকে দেখেই গতিবেগ তার শ্লথ হল। পাছে এসে কথা কয় এই ভয়ে জিঞ্জার ঢুকে গেল দোকানের মধ্যে—পাঁচটি মিনিট আর বেরুবার নাম করলে না। আধঘণ্টা পরে স্বয়ং মিস্টার জোনস্ এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কেমন আছেন মিস্টার এডওয়ার্ড। আমার বোন বলল আপনি এখানেই আছেন।'

গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল টেড—করমর্দনও করল না, উত্তরও দিল না।

'আসছে রবিবার যদি আমাদের ওখানে খান তো বড় খুশি হব। আমার বোন ভারি সুন্দর রাঁধে। একেবারে অস্ট্রেলিয়ান খানা বানিয়ে দেবে আপনাকে।'

'গোল্লায় যাও'—বলল টেড।

একটু হেসে, মোটেই রাগ করেননি এমনভাব দেখিয়ে মিস্টার জোনস্ বললেন, 'ওটা কি ভালো কথা হল? কন্ট্রোলারের ওখানে আপনি যান আর আমাদের ওখানেই বা যাবেন না কেন? স্বজাতীয়দের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ-সালাপ করতে ইচ্ছে করে তো। দেখুন, যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। এইবার আপনি কি রকম অভ্যর্থনাটা পান দেখুন।'

মুখ ভার করেই উত্তর দিল জিঙ্গার, 'বাইরে যাবার মতো পোশাক-আশাক নেই আমার।'

'তাতে কি হয়েছে? ঐ পোশাকেই আসুন না।'

'যাব না আমি।'

'কেন? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

জিঙ্গারের ঢাকা-চাপা নেই। অবাঞ্ছিত নিমন্ত্রণ পেলে আমরা সবাই যা বলতে চাই কিন্তু বলতে পারি না, সে বিনা দ্বিধায় তাই বলে দিল, 'যেতে ইচ্ছে করে না; আবার কি।'

'বড় দুঃখিত হলাম। আমার বোন ভারি মন খারাপ করবে।' মিস্টার জোনস্ দমবার পাত্র নন—সহজভাবে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। দু'দিন পরে রহস্যজনকভাবে এক প্রস্থ পোশাক, জুতো, মোজা জিঙ্গারের বাড়িতে এসে উপস্থিত; আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু। উপহার-টুপহার জিঙ্গারের পাওয়ার অভ্যাস নেই। দেখা হতেই কন্ট্রোলারকে জিগগেস করল, 'হাঁ হে, তুমি পাঠিয়েছ নাকি ওগুলো?'

'মাইরি না। তুমি কি পরবে না পরবে, সে ভাবনা মরতে আমি ভাবতে যাব কেন?'

'তাহলে পাঠাল কোন শালা?'

'সে আমি কী করে জানব?'

কাজের খাতিরেই মাঝে মাঝে মিস্ জোনস্‌কে কন্ট্রোলারের এখানে আসতে হত। এই ঘটনার পরেই, একদিন সকালে সে এসে উপস্থিত। মেয়েটি কাজের আছে। যদিও কন্ট্রোলারকে দিয়ে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা-ওটা করাতে চাইত মিস জোনস্, সে তার সময় কখনই নষ্ট করত না। এবারকার সাক্ষাতের প্রয়োজনটা এত অকিঞ্চিতকর যে গ্রুইটার একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। এ ব্যাপারে যেচে হাত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় জানিয়ে দিতেই, অভ্যাস মতো মিস জোনস্ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা তো করলই না, বরঞ্চ প্রত্যাখ্যানটাই সটান মেনে নিল। চলে যেতে উদ্যত হয়েই কি যেন মনে পড়ল এইভাবে বলল, 'দেখুন মিস্টার গ্রুইটার, দাদার ভারি ইচ্ছে যে আপনাদের এই জিঞ্জার টেড নামক ভদ্রলোকটি আমাদের ওখানে একদিন খান। আমি তাঁকে তাই পরশুদিন নেমন্তন্ন করেছি। কিন্তু ভদ্রলোক ভারি লাজুক—আপনি যদি তাঁর সঙ্গে আসেন···'

'ভারি খুশি হলাম। নিশ্চয়ই যাব।'

'দাদা বলেন যে বেচারীর জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত।'

'হ্যাঁ, মেয়েদের প্রভাব এবিষয়ে খুবই···'কন্ট্রোলার বললে মেকি গাম্ভীর্যে।

'তাহলে আপনি বলবেন তো তাঁকে? আপনি বললে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আর, একবার যাওয়া আসা শুরু হলে··· আচ্ছা, আপনিই বলুন না, ঐ অল্প বয়েস ভদ্রলোকের—এই বয়সেই একেবারে নষ্ট হয়ে যাবেন—সেটা কি ভালো?'

মুখ তুলে তাকাল কনট্রোলার। মিস জোনস্ তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বাই হবে। কোনো আকর্ষণই অনুভব করে না তার প্রতি গ্রুইটার—বরং মেয়েটিকে দেখলেই তার মনে হয়, কে যেন দড়ির উপর টান করে ঝুলিয়ে দিয়েছে একখানা ভিজে কাপড়। চোখ দুটো পিট্ পিট্

করলেও মুখের ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই সে বলল, 'আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

'আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়স কত?'

'পাসপোর্টে তো দেখেছি একত্রিশ।'

'আর ওঁর আসল নামটি কি?'

'উইলসন।'

'এডওয়ার্ড উইলসন,' মৃদুকণ্ঠে বলল মিস্ জোনস্।

আপনমনেই কণ্ট্রোলার বলল, 'যে ধরনের জীবন ও যাপন করে, তাতে গায়ে ওর এত জোর কি করে হয় তাই ভাবি। একেবারে একটি ষাঁড় বিশেষ।'

'আমি দেখেছি ঐ লালচুলওয়ালা লোকেদের গায়ে প্রায়ই বেশ জোর থাকে'—আবেগে কথা বেধে বেধে গেল মিস জোনসের গলায়।

'ঠিক বলেছেন আপনি।'

কি অজানা কারণে মিস জোনস লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। তাড়াতাড়ি অভিবাদন সেরে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'কালে কালে কতই দেখব!' বলে উঠল কণ্ট্রোলার। এখন বোঝা গেল কে জিঞ্জারকে জামা-কাপড় পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা হতেই গ্রুইটার জিগগেস করল, 'কি হে, কিছু খবর পেয়েছ নাকি মিস জোনসের কাছ থেকে।'

পকেট থেকে, তাল পাকানো চিঠি একটা বের করে দিল জিঞ্জার। তাতে ছিল:

প্রিয় মিস্টার উইলসন,

আপনি নিমন্ত্রণে এলে ভারি খুশি হব আমরা, কণ্ট্রোলারও আসছেন। অষ্ট্রেলিয়া থেকে কতকগুলি নূতন রেকর্ড এসেছে—আপনার নিশ্চয়ই

ভালো লাগবে। সেদিনের ব্যবহারের জন্যে মনে কিছু করেননি তো? ক্ষমা চাইছি আমার সেই রূঢ়তার জন্যে। আর আপনাকে তখন আমি ভালো করে জানতামও না।

আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি—

বিনীতা—

মার্থা জোনস্

চিঠিতে যখন 'উইলসন' রয়েছে আবার তার নিজের আসার কথাও রয়েছে, তখন কণ্ট্রোলারের বুঝতে বাকি রইল না যে, নেমন্তন্ন করেছি বলে গেলেও, তার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পরেই মিস জোনস্ নেমন্তন্ন করেছে।

'কি করবে, যাবে নাকি?'

'কি করব মানে? আমি যাব না। সোজা কথা।'

'কিন্তু চিঠিটার উত্তর তো দিতে হবে।'

'দেব না।'

'এই শোন জিঞ্জার: নতুন জামাকাপড় পরে অন্তত আমার খাতিরেও চল। আমাকে বিপদে ফেলে তুমি পালাবে—সেটি হবে না। আর এত ভয়টা কিসের তোমার?'

কণ্ট্রোলারের মুখের দিকে তাকাল জিঞ্জার সন্দিগ্ধচিত্তে—তার গম্ভীর মুখ থেকে কিন্তু বোঝাই গেল না যে ভিতরে ভিতরে কণ্ট্রোলার হাসিতে বুক্ বুক্ করে উঠছে।

'শালার আমায় ওদের দরকারটা কি শুনি?'

'কি জানি। হয়তো তোমার সঙ্গসুখ চায়।'

'বলি, মালটাল চলবে তো?'

'যাবার আগে আমার এখান থেকে টেনে গেলেই চলবে।'

'বেশ তাই হবে,' বললে জিঞ্জার নিরুৎসাহে।

একটা তামশার আশায় আগে থেকেই আনন্দে হাত ঘষতে লাগল কণ্ট্রোলার। কিন্তু নিমন্ত্রণের দিন এল, জিঞ্জার এল না। সাতটা বাজল, জিঞ্জারের দেখা নেই। সে তখন রঙে আছে ভরপুর। কণ্ট্রোলার একাই গেল এবং খাঁটি খবরটাই দিয়ে দিল। মাথা নেড়ে বললেন জোনস্, 'ওর কিছু হবে না মার্থা। ওর আশা ছেড়ে দাও।'

নির্বাক মার্থার চোখ দিয়ে দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল—ঠোঁট কামড়ে ধরে সে বলল, 'কারও আশা যায় না। রোজ রাতে ভগবানকে জানাব আমি আমার প্রার্থনা। তাঁর সৃষ্টি মন্দ একথা বিশ্বাস করলে আমার অপরাধ হবে যে।'

হয়তো মিস জোনস্ ঠিকই বলেছে—তবে ভগবানের কর্মপদ্ধতি বোঝা ভার। জিঞ্জার এমন মদ খাওয়া শুরু করল, যে কণ্ট্রোলার তাকে পরের জাহাজেই দ্বীপান্তরে পাঠান মনস্থ করল। হঠাৎ, রহস্যজনক ভাবে, মারা গেল একটা লোক একটা দ্বীপ থেকে ফিরে এসে। সরকারী চীনে ডাক্তার তদারক করে এসে বলল, 'কলেরা—আরও অনেকে মারা গিয়েছে এই দ্বীপে।' তাহলে এল কলেরার মহামারী।

ইংরাজী, ডাচ, মালয়—সব ভাষাতেই আশ মিটিয়ে গালমন্দ করে, এক বোতল বিয়ার শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে, ভাবতে বসল কণ্ট্রোলার—কি করা যায়। চীনে ডাক্তারটাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। শেষ পর্যন্ত যাকে কণ্ট্রোলার দেখতে পারে না, তাকেই ডাকতে হবে—ঐ মিস্টার জোনসকে। কিন্তু ভাগ্যিস মিস্টার জোনস্ ছিলেন হাতের কাছে! খবর দিতেই এসে উপস্থিত—বোনকে সঙ্গে করে।

ভূমিকা না করেই কণ্ট্রোলার বলে বসল, 'কি জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার কাছ থেকে এই আহ্বানই আশা করছিলাম। আমার

বোন কাজে পুরুষের সমতুল্য। আমরা দুজনেই আমাদের সব কিছু দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছি।'

'জানি আমি তা। ওঁর এই স্বেচ্ছা-সেবায় খুশি না হয়ে পারা যায় না।'

কিন্তু বারু ছেড়ে কণ্ট্রোলারের যাওয়া অসম্ভব। আর পাদরী-সাহেবই বা কি করে যান—কারণ বারুতেই লোক সংখ্যা সব চেয়ে বেশি এবং বসতিও ঘন। কিন্তু দূরদ্বীপে একা মিস জোনস্‌কে পাঠান সমীচীন হবে না—বিশেষ করে অনেক দ্বীপের আদিম অসভ্য অধিবাসীদের কোনো মতে বিশ্বাসই করা যায় না। চীনে ডাক্তার বা দেশীয় লোককে দিয়েও কোনো কাজ হবে না। তাদের কথা কেউ শুনবেই না।

'আমি ভয় পাই না,' বললে মিস জোনস্।

'তা ঠিক। কিন্তু আপনার গলায় কেউ ছুরি বসিয়ে দিলে আমিই বিপদে পড়ব। আর আপনার সাহায্য এখানেও যে একান্ত প্রয়োজন।'

'তাহলে মিস্টার উইলসনকে দিন আমার সঙ্গে। তিনি ওদের তো জানেনই আবার ওদের সব ভাষাও জানেন।'

'বলেন কি,' বলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কণ্ট্রোলার। তারপর বলল, 'সে তো এই মোটে মদের বিকারের ঘোর কাটিয়ে উঠছে।'

'আমি জানি,' উত্তর দিল মিস জোনস্।

'অনেক কিছুই আপনি জানেন দেখছি।'

এই গম্ভীর মুহূর্তেও একটু হেসে মিস্টার গ্রূইটার মিস জোনসের দিকে একটা শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে পারল না! মিস জোনস্ কিন্তু প্রত্যুত্তরে দিল শান্তদৃষ্টি। বলল, 'দেখুন, দায়িত্ব ঘাড়ে দিলে অনেক সদগুণ মানুষের ফুটে ওঠে। ওঁরও হয়তো তাই হবে।'

'ঐ রকম একটা চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে তোমার এতদিন থাকা কি খুব সমীচীন হবে,' মিশনারী জিগগেস করলেন।

চীৎকার করে উঠল, 'আরে চলে এস না ভেতরে।' যাক এতদিন পরে আজকে রাতটা একটু আনন্দে কাটবে। জিঙ্গার এসে গিয়েছে।

জিঙ্গার এসে দাঁড়াল—শাদা ধবধবে পোশাক-পরা, দাড়ি কামানো, সম্পূর্ণ অন্য লোক।

'ফিটফাট পোশাক—দেখলে মনে হয় কলেরা রোগীদের সেবা করার বদলে নিজেই হাওয়া বদলে এসেছ—ব্যাপারখানা কি?'

একটু বিব্রত হয়ে হাসল জিঙ্গার; খানসামা দু'বোতল বিয়ার এনে ঢালল দুটো গেলাশে।

একটা গেলাশ তুলতে তুলতে কনট্রোলার বলল, 'কই, তুমি নাও একটা।'

'আমার তো ও চলবে না, ধন্যবাদ,' বললে জিঙ্গার। কণ্ট্রোলার আকাশ থেকে পড়ল:

'কেন, হল কি? তেষ্টা পায়নি তোমার?'

'এক কাপ চা চলতে পারে।'

'এক কাপ—কী?'

'ওসব ছেড়ে দিয়েছি। মার্থার আর আমার বিয়ে হচ্ছে জান তো?'

'জিঙ্গার!' কামানো মাথা চুলকে উঠল কণ্ট্রোলারের, আর চোখ দুটো বেরিয়ে এল ঠিকরে। 'অসম্ভব! মিস জোনসের সঙ্গে বিয়ে, তোমার! আরে, ওর সঙ্গে কারও বিয়ে হতে পারে নাকি?'

'আমার সঙ্গে অবশ্য হচ্ছে। গির্জায় আমাদের বিয়ে দিচ্ছে ওয়েন, কিন্তু ডাচ আইন অনুসারেও আর একবার অনুষ্ঠানটা করতে চাই। খবরটা তোমাকে দিতে এলাম।'

'ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে আসল ব্যাপারটা খুলে বল দেখি জিঙ্গার।'

'প্রোপেলার ভেঙে যাওয়ায়, যেদিন রাতে নির্জন দ্বীপে রাত কাটিয়েছিলাম সেইদিনই ও ভালোবেসেছে আমায়। সত্যিই, ওর সঙ্গে পরিচয়

হলে দেখবে ও মেয়ে মোটেই খারাপ নয়। আর বোঝ তো, এইটাই ওর শেষ সুযোগ—আমি কিছু করতে চাই ওর জন্যে। ওরও তো একজন দেখাশোনা করবার লোক চাই।'

'জিগ্গার, তুমি বলছ কি? ও যে এক নিমিষে তোমাকে পাদরী বানিয়ে ফেলবে।'

'নিজেদের ছোট্ট একটা মিশন থাকলে এমন আর ক্ষতি কি হবে? মার্থা কি বলে জান? বলে, আমার অদ্ভুত লোক বশ করবার ক্ষমতা আছে। জোনস্ যা এক বছরে পারবে না, আমি নাকি তা পাঁচ মিনিটেই পারি। নেটিভদের নিয়ে আমি দেখব একবার কিছু করতে পারি কিনা। এ রকম একটা ক্ষমতা তো শুধু শুধু নষ্ট করা উচিৎ নয়।'

বার কয়েক মাথা নেড়ে, কোনো কথা না বলে, মনে মনে ভাবল কণ্ট্রোলার—'হুঁ, একেবারে নখ বসিয়ে ধরেছে।'

'ইতিমধ্যেই সতের জনকে আমি দীক্ষা দিয়েছি।'

'তুমি! তুমি তো ধর্মে বিশ্বাস করতে না।'

'করতাম কি না ঠিক বলতে পারি না। তবে কথা বলতেই যখন দেখলাম, তারা ভীত ভেড়ার পালের মতো এসে যীশুর আশ্রয় নিল, তখন লাগল বেশ। ভাবলাম, আরে, তাহলে নিশ্চয় কিছু আছে এতে।'

'তুমি ও মেয়েটাকে নষ্ট করলে না কেন? আমি তিন বছরের বেশি মেয়াদ তোমায় দিতাম না। তিন বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যেত। কিন্তু, এ তুমি করলে কি?'

'দেখ, কথাটা যে আমার একেবারেই মনে হয়নি, তা নয়। প্রকাশ কর না যেন। জান তো মেয়েরা ভারি ছিচকাঁদুনে—শুনলে একেবারে ক্ষেপে যাবে।'

কণ্ট্রোলার উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে করতে বলল, 'তোমার ওপর নজর যে ওর পড়েছে তা আমি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু এতদূর

যে গড়াবে তা ভাবিনি···শোন জিঞ্জার, আমরা অনেক দিনের বন্ধু—আমার একটা কথা শোন! গভর্ণমেণ্টের লঞ্চটা তোমাকে দিচ্ছি—চড়ে বস—গিয়ে লুকিয়ে থাক কোনো দ্বীপে। কোনো জাহাজ এলেই আমি বলে দেব, তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। তোমার পক্ষে এই একটি উপায়ই আছে—ছুট দাও দড়ি ছিঁড়ে।'

জিঞ্জার মাথা নাড়ল: 'তুমি মন্দ কথা কিছু বলছ না কণ্ট্রোলার। তবে আমি ঝড়-ঝাপটা খাওয়া এই মেয়েটিকেই বিয়ে করব, যীশুর পায়ে ফিরিয়ে আনব ঐ পাপীগুলোকে। আর মাইরি বলছি, এমন চমৎকার পুডিং তৈরী করে মার্থা—জীবনে খাইনি ওরকম পুডিং।'

এই দ্বীপে তার একমাত্র সঙ্গীকে হারাতে বসেছে কণ্ট্রোলার। এখন দেখছে, জিঞ্জারকে সে যেন একটু ভালোও বাসত। দেখা করল পরের দিন পাদরীর সঙ্গে কণ্ট্রোলার।

'এ সব কি অদ্ভুত কথা শুনছি মিস্টার জোনস্—আপনার বোনের নাকি বিয়ে হচ্ছে জিঞ্জারের সঙ্গে?'

'অদ্ভুত হলেও সত্যি।'

'আপনি এই পাগলামিতে মত দিচ্ছেন?'

'যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মার্থার। আমার কি বলবার থাকতে পারে বলুন?'

'কিন্তু আপনি এতে মত দিচ্ছেন কি করে? জিঞ্জারকে তো জানতে বাকি নেই। অবশ্য দীক্ষা-টিক্ষা দেওয়া ভালো কথা। কিন্তু বেড়াল কি কখনও তপস্বী হয়, মিস্টার জোনস্?'

'জীবনে এই প্রথম কণ্ট্রোলার পাদরীর চোখে মৃদুমৃদু হাসি দেখল: 'আমার বোন যা ধরে তা করে। দ্বীপে সে রাত্রের পর জিঞ্জারের আর কোনো আশা ছিল না।' হাজার হোক মিস্টার জোনস্ মানুষ তো!

কর্ণেলার হাঁপাতে লাগল বিস্ময়ে।

'ধন্যি বটে,' বিড় বিড় করে উঠল কর্ণেলার।

আর কিছু বলার আগে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল মিস জোনস্। দেখলে মনে হয় বয়েস তার কমে গিয়েছে বছর দশেক—সারা দেহে উজ্জ্বল আভা। নাকটা আর লালচে নেই বললেই চলে। বলে উঠল সে, লীলাচঞ্চল মেয়ের মতো: 'আমাকে বুঝি অভিনন্দন জানাতে এসেছেন? কেমন, ঠিক বলেছিলাম কিনা? প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো আছে। কিন্তু এডওয়ার্ড যে এত ভালো, এত বড় তা, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি।'

'আপনি সুখী হবেন, আশা করি।'

'হবই তো। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন আমাদের দুজনকে। সুখী না হয়ে পারি?'

'মিলিয়ে দিয়েছেন নাকি?'

'নিশ্চয়! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? এই কলেরা-মহামারীটা না এলে এডওয়ার্ডও নিজেকে জানতে পারত না, আমরাও পরিচিত হতে পারতাম না পরস্পরের সঙ্গে। ভগবানের হাত তো এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।'

এই দুটি মানুষের মিলন ঘটাবার জন্য ছ'শো নিরপরাধী মানুষের মৃত্যু ঘটানোর—পন্থাটা বিশেষ সুষ্ঠ নয়—একথা না ভেবে পারল না কর্ণেলার, তবে বিধাতার কার্যকলাপ সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিতান্ত অল্প—কাজেই আর কোনো মন্তব্য করল না।

একটু দুষ্টুমি করে বললে মার্থা, 'মধু-চন্দ্রিকায় কোথায় আমরা যাচ্ছি বলুন তো?'

'জাভা?'

'যে দ্বীপে আমরা মহামারীর সময় গিয়েছিলাম। সেইখানেই আমাদের

মিলন হবে। এডওয়ার্ড প্রথম নিজেকে খুঁজে পায় যেখানে—সেখানেই পাবে সে পুরস্কার।'

নিঃশ্বাস রোধ করে কণ্ট্রোলার কথাগুলো শুনল—তারপরই পালাল সেখান থেকে। তার মনে হল, এক্ষুনি এক বোতল বিয়ার না পেলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। একটা তাজ্জব ব্যাপার জীবনে দেখল বটে!

—শীতাংশু মৈত্র



ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর

লরেন্সের গল্প

সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনুবাদ করেছেন : বুদ্ধদেব বসু, ক্ষিতীশ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইংরাজী সাহিত্য-ক্ষেত্রে লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। মনের মেঘলোক যাঁরা ছাড়িয়ে উঠেছেন, এমন বহু বিরাট দিকপাল ইংরাজী সাহিত্যে আছেন, কিন্তু ডি. এইচ. লরেন্স ঠিক যেন তাঁদের জাতের নয়। আগ্নেয়গিরির দুরন্ত তীব্র উত্তাপ তাঁর ভাষায়, তাঁর মনে রৌদ্রোজ্জ্বল বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য। ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত শান্ত গম্ভীর বনেদী চালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন বজ্রঘোষিত বিদ্যুত-কশায়িত মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন।

ডি. এইচ. লরেন্সের ছোটো বড়ো সমস্ত গল্প থেকে, বাছাই করা যে ক-টি রচনা এই বইয়ে অনুবাদ করা হয়েছে, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় সেগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।

লরেন্সের কাহিনীর ধারা-নিয়ন্ত্রণের নিয়তি একেবারে আলাদা। মামুলি গল্পের হাসিকান্নার দোলায় দোলানো চিরাচরিত বিন্যাস সে জানে না। সাধারণ বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার আলো-ছায়ার নক্সাকাটা কাহিনী-বিন্যাসে মুখে একটু হাসি ফোটাবার, কি, চোখ একটু অশ্রুসজল করবার দায় নিয়ে লরেন্স গল্প লিখতে বসেননি। কোষ-মুক্ত তরবারের মতো উজ্জ্বল, নিরাবরণ তাঁর সমস্ত চরিত্র দুর্জ্ঞেয় এক শিল্প-নিয়তির নির্দেশে আমাদের অগোচর মনের অনাবিষ্কৃত সমস্ত কোণে অদ্ভুত অনুভূতির বিদ্যুত-স্পর্শ রেখে যায়। সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই। দাম ৩৷৹

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনুবাদ করেছেন

এই বই বাঙলা দেশে ও বাইরে অভাবিত চাঞ্চল্য এনেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরিয়েছিল এর প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত করা হয়েছে—আধুনিকতম লেখকদের পাঁচটি যুদ্ধকালীন গল্প। এতে বইয়ের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দু-রকম মর্যাদাই অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে।

রাশিয়া যে যুদ্ধ জিতল এ অস্ত্রের জয় নয়, ভাবের জয়; জনবলের জয় নয়, জনমতের জয়। এ জয়ের রহস্য রয়েছে তার সাহিত্যে, আর, "আধুনিক সোভিয়েট গল্প" সে বিস্তৃত সাহিত্যেরই সার সংগ্রহ।

রাশিয়ানরা যখন রাস্তা বা সেতু তৈরি করে তখন তারা রাস্তা বা সেতুই তৈরি করে না, তৈরি করে তাদের দেশ; যখন তারা সর্বস্ব পণ ক'রে যুদ্ধ করে তখন তারা দেশের মুক্তিই খোঁজে না, খোঁজে সর্ব পৃথিবীর মুক্তি। এই ভাবের মহত্ত্বই জগতের চোখে রাশিয়াকে এত বড় করেছে।

সেই আজকের রাশিয়াকে ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে বোঝবার সহায়ক হচ্ছে এই "আধুনিক সোভিয়েট গল্প"।

তার উপরে, অনবদ্য অনুবাদ। অনুবাদও যে স্বতন্ত্র শিল্প তা প্রমাণ করেছে অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক নিপুণতা। শক্ত সুন্দর গঠনপরিপাট্য। দাম ৩৷৷০

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আধুনিক ইতালীয় শ্রেষ্ঠ লেখক

পিরানদেল্লোর গল্প

সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ করেছেন : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতীশ রায়, কমলা রায় ও বুদ্ধদেব বসু

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ইতালির লুইজি পিরানদেল্লো। সেই থেকে ইউরোপে সুতরাং আমাদের দেশে পিরানদেল্লোর খ্যাতি প্রধানত নাট্যকার রূপেই পৌঁছেছে; কিন্তু স্বদেশে কথা-সাহিত্যেও তাঁর বিপুল প্রতিষ্ঠা, ছোট-গল্পে তিনি ইতালির প্রধান পুরুষ বলে স্বীকৃত। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে পিরানদেল্লোর গল্প তাঁর নাটকের চেয়ে অমরত্ব লাভের দাবী রাখে বেশি।

গভীর বেদনারসে পিরানদেল্লোর গল্পগুলি পরিপ্লুত। এ বেদনা কখনো মধুরের আভাস এনে দেয়, কখনো বা অতল হতাশায় মগ্ন করে। কখনো তিক্ততা, কখনো বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনো বা অশ্রুজল। কিন্তু বেদনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং নিজের ও অন্যের রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে রুচি এর উৎকর্ষের পরিমাপ। ভাষায় যাতে বিদেশী গন্ধ না থাকে অথচ পিরানদেল্লো যাতে বাঙালি ব'নে না যান, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই। দাম ৩৲